দাসীরক্ষণ মহম্মদের অনুমোদিত নহে ত কি? কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানেরা বলেন যে, মহম্মদ ক্রমে ক্রমে আরব-সমাজ সংস্কার করিয়াছেন—প্রথমে তিনি এই ব্যবস্থাই দিয়াছিলেন, কারণ, আরব-সমাজের দারুণ ব্যভিচারস্রোত রোধ করিবার তখন আর কোনও উপায় ছিল না; ক্রমে সময় বুঝিয়া দাসীরক্ষণ নিবারণের জন্য দাসীদিগকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা দিলেন—কিন্তু সেই সঙ্গে ধৈর্য্যাবলম্বনের মহত্ত্বটুকু উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না; এবং পরে বহুনারীর প্রতি সমান ন্যায়াচরণ অসম্ভব বলিয়া বহুদারপরিগ্রহও প্রকারান্তরে নিষেধ করিলেন। দাসীরক্ষণ মহম্মদের আদৌ অনুমোদিত নহে। সুরা নূরে ক্রীতদাসদাসীদিগের বিবাহ দিবার জন্য তিনি স্পষ্টই আদেশ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে অবিবাহিতদিগকে চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার জন্যও উপদেশের ত্রুটি করেন নাই।

কিন্তু হইলে হইবে কি? সহস্র কূটতর্ক বাহির করিয়া মুসলমানেরা পালনচ্ছলে বারবার মহম্মদের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন, এবং লঙ্ঘিত বিধি প্রচলিত আচারের প্রভাবে ক্রমে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজ লেখকেরা মুসলমানদিগের প্রতি যে সকল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করেন, মুসলমান-প্রচলিত ব্যবস্থাই তাহার কারণ। লোকাচার এবং ইদানীন্তন আইনে মিলিয়া মহম্মদকে একেবারে আড়াল করিয়াছে। বহুবিবাহ নিবারণ, দাসীরক্ষণ প্রথার উচ্ছেদ, ক্রীতদাসদিগের দুরবস্থা মোচন, যথেচ্ছ দারপরিত্যাগ নিষেধকরণ প্রভৃতি যে সকল শুভানুষ্ঠানের তিনি সূচনা করিয়া গিয়াছেন, মুসলমান-জগতে তাহার একটিও সম্যক্ রক্ষিত হয় নাই। অজ্ঞানের আধিপত্যে তাহার সম্ভাবনাও বিরল।

কিন্তু একটা কথা সহজেই মনে হয়। সমস্ত মুসলমান-জগৎ জুড়িয়া চিরদিন যদি অজ্ঞানই নিষ্পরোয়া আধিপত্য করিয়া আসিতেছে, তবে সে অন্ধকার মরুরাজ্যে মানবের হৃদয়মথিত এক অপূর্ব্ব সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিল কোথা হইতে? তাহাতে যে মধুর প্রেমগীতি ধ্বনিত হইয়াছে, সে দেবগাথা পৃথিবীতে দৈবাৎ শুনা যায়, যে করুণ উদারতা এবং নির্ভীক সহৃদয়তা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া উঠে নাই—তাহা

মানবেরই করুণ হৃদয়ের সহজ উচ্ছ্বাস। এবং এখনও সেই সুফী কবিগণের রচিত গীত গাহিয়া মুসলমান ভক্তহৃদয় নির্জ্জনে ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার নিগূঢ় যোগসাধন করে। ইহা কি কথনও অজ্ঞানের ফল হইতে পারে ?

বোগ্‌দাদের খলিফেরাও যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, আরব্যোপন্যাসের কল্যাণে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এবং মুসলমান-জগতে খলিফদিগের জ্ঞানচর্চ্চার সুফলও কিছু কিছু ফলিয়াছিল। খলিফ আলমামুন পাঁচ শত মন স্বর্ণ দিয়া গ্রীক সম্রাটের নিকট তাঁহার সভাপণ্ডিত লিওকে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি আসিয়া মুসলমান ছাত্রদিগকে কিছুদিন যদি দর্শন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন, খলিফ আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিবেন। দামাস্কাসে মুসলমান-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন পণ্ডিত খৃষ্টান। ইহাতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি যে অকপট সদ্ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা জ্ঞানালোচনারই ফল। জ্ঞানের মত গোঁড়ামির আর অমোঘ ঔষধ নাই।

কিন্তু এ জ্ঞানালোচনা অবিচ্ছেদে বরাবর চলে নাই। প্রথমতঃ, খলিফেরা সকলে সমান ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধবিগ্রহাদিজনিত রাজনৈতিক বিপ্লবে দীর্ঘকাল সমভাবে জ্ঞানচর্চ্চার বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আরও এক কথা, এখন যেমন সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে, তখন কেবল পণ্ডিতগণের মধ্যেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। এবং পণ্ডিতেরা অনেক সময় কেতাবের মর্ম্ম সাধারণের নিকট সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন।

যাহাই হউক্, এ সকল ত্রুটি থাকিলেও, মুসলমানদিগের দ্বারা পৃথিবীর যে অনেক হিতসাধন হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এবং বিদেশী লেখকেরা মুসলমান-জগতে নিত্য অত্যাচার অবিচারের ধারাবাহিক উল্লেখ করিলেও, সুশাসন, শৃঙ্খলা এবং সহৃদয়তা মুসলমান-ধর্ম্মের বহির্ভূত নহে এ কথাও মানিতে হয়। মুসলমান-শাসনও যে ভাল হইতে পারে স্পেনের ইতিহাস তাহার প্রমাণ। মুরদিগের রাজত্বকালে স্পেনের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বহু দূরদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা কর্ডোভার

বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিত; বড় বড় অধ্যাপকেরা জ্যোতিষ, রসায়ণ, প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, এবং লোকের মুখে মুখে ভাল ভাল কবিতা শুনা যাইত। ইহা ভিন্ন, স্থাপত্য বিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল বলা বাহুল্য। মুরদিগের শাসনসময়ে স্পেন য়ুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইরূপ গুটিকতক প্রাচীন নজীর কোরাণের অনুশাসনের সহিত যুক্ত হইয়া নব্য মুসলমানদিগকে ভরসা দিতেছে যে, মুসলমানেরা পৃথিবীর অভিশপ্ত সন্তান নহে, তাহারাও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত সৎকার্য্যের অধিকারী এবং সাধু অনুষ্ঠানে সক্ষম; একবার সংযতভাবে আপন কর্ত্তব্য বাছিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ফল সুনিশ্চিত। যে যাহা বলে বলুক্, ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেই হইবে, প্রাচীন কুসংস্কার এবং অজ্ঞানান্ধকারে যাহা চাপা পড়িয়াছে, তাহাকে উদ্ধার না করিলে নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষালোকে এখন পথও সুগম। সুতরাং এই এক মহা অবসর।—আরবের মরুপ্রান্তে মহম্মদ যে আল্লা আকবর ধ্বনি তুলিয়াছিলেন এইবারে তাহা সফল হউক্।

প্রসঙ্গ-কথা।

আজকাল আমাদের ছাত্রবৃন্দ নীতিশিক্ষা লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কমিটি, বক্তৃতা, আর চটি বইয়ের এত ছড়াছড়ি আরম্ভ হইয়াছে যে, এই কয়টি উপাদানের মাহাত্ম্যে নীতির উৎকর্ষসাধন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অনতিবিলম্বে আজকালকার বালকগণ এক একটি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রূপে অভিব্যক্ত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে; আর যদি এই সুফল ফলিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয় ত সে কেবল ছাত্রচরিত্রে নীতির অভাবের আধিক্যবশতঃ, চটি বইগুলার ব্যর্থতাবশতঃ নয়।

ছাত্রদের নীতি লইয়া যে প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সহজে মনে হইতে পারে যে, হঠাৎ বুঝি এদেশের যুবাদের মধ্যে দুর্নীতির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, আমরা সকলে মিলিয়া "জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্ট" না সাজিলে আর চলেনা। লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর সার্কুলার জারি করিতেছেন, নন্-পোলিটিকাল স্বদেশহিতৈষীরা কমিটি করিতেছেন, কোন কোন কলেজের প্রিন্সিপাল "মোরালিটি"তে পরীক্ষা প্রচলিত করাইবার চেষ্টায় আছেন, আর অনেকেই নিজের নিজের সাধ্যমত "ময়্যাল টেক্স্‌ট্‌বুক্" প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন।

ব্যাপারটা দেখিয়া একটু হুজুকের মতন মনে হয়। শুদ্ধমাত্র "ময়্যাল্ টেক্স্‌ট্‌বুক্" পড়াইয়া নৈতিক উন্নতিসাধন করা যায় এ কথা যদি কেহ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে এপ্রকার অসীম বিশ্বাসকে সকৌতুকে প্রশংসা করা ছাড়া আমি আর কিছু বলিতে চাহিনা। এরকম বিশ্বাসে পর্ব্বত নড়ান যায়, দুর্নীতি ত সামান্য কথা। "চুরি করা মহাপাপ," "কদাচ মিথ্যা কথা বলিও না" এই প্রকার বাঁধি বোল দ্বারা যদি মানুষের মনকে অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে ত ভাবনাই ছিল না। এ সব কথা মান্ধাতার এবং তৎপূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত; ইহার জন্য নূতন করিয়া টেক্স্‌ট্ বুক্ ছাপাইবার প্রয়োজন নাই।

দুই একটি টেক্সট্‌বুক দেখিয়া মনে হয় যেন বালকদের নীতিশিক্ষার জন্য নীতি শব্দটা একটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করাই আবশ্যক। আমাদের ছাত্রদের চরিত্র কি এই বিষয়ে এতই খারাপ যে, এই একটিমাত্র বিষয় লইয়াই এত বেশী আলোচনা করা দরকার? রাজসাহী কালেজের কোন একজন প্রোফেসর "ইন্দ্রিয়-সংযম"-নামক এমন একখানি গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন যে, আমি ত ওরকম পুস্তক বালকদের হস্তে দিতে সঙ্কোচ বোধ করি। বালকবালিকা ও মহিলাদের পাঠ্য মাসিকপত্রে এরকম পুস্তকের সম্যক সমালোচনা করা অসম্ভব।

একটিমাত্র বিষয় অনেক দিক হইতে অনেক রকমে নাড়া-চাড়া করিয়া প্রোফেসর মহাশয় দেখাইবার মধ্যে দেখাইয়াছেন যে, কতকগুলি প্রবৃত্তিকে সকলেই দূষণীয় জ্ঞান করে। তিনি কি মনে করেন যে, যাহারা সমাজের ও আত্মীয়স্বজনের মত উপেক্ষা করিয়া গোপনে দূষণীয় কার্য্যে রত থাকে তাহারা চটি বইটি পড়িবামাত্র চরিত্রসংশোধনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিবে? আর যাহাদের এ সকল প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের নিকট এ সকল বিষয় আলোচনা করা কি সঙ্গত কিম্বা প্রয়োজনীয়? এই বইখানি আবার রাজসাহী কালেজের নিয়ম অনুসারে সকল ছাত্রই পড়িতে ও শুধু পড়িতে নয় কিনিতে বাধ্য।

আমার কোন এক তীক্ষ্ণজিহ্ব বন্ধু তাঁহার এক বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন, আজকাল নীতিশিক্ষার অর্থ দুইটি মাত্র; (১) রাজকর্ম্মচারীদিগকে সেলাম করা এবং (২) সংস্কৃত কাব্যের কোন কোন বর্ণনা ছাঁটিয়া দেওয়া। প্রথমটি কালেজে কিম্বা স্কুলে শিখাইবার কোন প্রয়োজন নাই, স্কুল ছাড়িয়া একবার উমেদারী ধরিলেই শিক্ষাটি আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। সংস্কৃত কাব্যের কোন কোন বর্ণনা ছাঁটিয়া দেওয়া কোন কোন সময়ে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু নিদান পক্ষে সে বর্ণনাগুলা তবু ত কবিতা বটে। এসব প্রসঙ্গ কাব্য হইতে ছাঁটিয়া দিয়া ময়্যাল টেক্সট্‌বুক-এ নীরস শুষ্কভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখি না। বালকদের পাঠ্যপুস্তকে এরকম পাঁক লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার কাছে ত অত্যন্ত কুৎসিত মনে হয়।

নিঃসন্দেহ নীতিশিক্ষা দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সর্ব্বতোভাবেই প্রশংসনীয়। শুধু আমার বক্তব্য এই যে, কতকগুলি বাঁধিবোল দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহাকে ইংরাজিতে "কাপি-বুক মোরালিটি" বলে, তাহার দ্বারা এ পর্য্যন্ত কাহারও চরিত্র সংশোধন হইতে দেখা যায় নাই। নীতিগ্রন্থে শুধু বলিয়া দেয় যে, এটা পাপ, ওটা পুণ্য; ইহা পাপপুণ্যের একটা ক্যাটালগ্‌স্বরূপ। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় ইহা চলনসইরকম জানিবার নিমিত্ত ক্যাটালগের আবশ্যক করে না।

অজ্ঞাতপাপ পৃথিবীতে অল্পই আছে। গুরুতর অন্যায় কার্য্যগুলা সকলেই অন্যায় বলিয়া জানে, এমন কি, ব্যবসায়ী চোরেরাও চুরি করাটাকে নৈতিক কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে না।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কতকগুলি কার্য্য, জ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, করিলেই পাপ। যেখানে শাস্ত্রে লেখা আছে যে, দক্ষিণমুখী হইয়া বসিতে হইবে, সেস্থলে উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিলে হিন্দুমতে পাপ হইতে পারে এবং একথাটা সকলেও না-ও জানিতে পারে। কিন্তু এ প্রকার পাপ-পুণ্য আপাততঃ আলোচ্য নহে। বালকদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত গ্রন্থে যে সব অন্যায় কার্য্য উল্লেখ করা যায়, কিম্বা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে কোনটাকে বোধ হয় কাহারও ভ্রমবশতঃ ন্যায় কার্য্য বলিয়া ভাবিবার সম্ভাবনা নাই।

নীতিশিক্ষার প্রণালী স্থির করিবার পূর্ব্বে নীতি কিপ্রকার ভিত্তির উপর স্থাপিত ইহা নির্ণয় করা আবশ্যক। দেয়াল গাঁথিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, বুনিয়াদটা কিরকম, মালমসলা কিরকম এবং কিপ্রকারে গাঁথিলে দেয়ালটা সোজা হইয়া থাকিবে ও পড়িয়া যাইবে না, এই সব কথা ভাবিয়া লওয়াই ভাল। চরিত্রের দোষ দূর করিবার চেষ্টার পূর্ব্বে দোষের কারণটা অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত। রোগের হেতু না জানিয়া চিকিৎসা করিতে বসিলে বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা।

মানবহৃদয়ে সুখস্পৃহাই একমাত্র চালক-শক্তি। ইচ্ছা করিয়া কেহ কখনও দুঃখ সহ্য করে না। কথাটা শুনিবামাত্রই অনেকে তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে উঠিবেন, কিন্তু একটু বুঝাইয়া বলি। কর্ত্তব্যপালনের জন্য অনেক সময় কষ্ট সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যপালনেই আমার যে আন্তরিক সুখ হয়, সেই সুখ ঐ কষ্ট অপেক্ষা বলবান বলিয়া, কিম্বা পরকালে অধিক পরিমাণে সুখ পাইবার অথবা ততোধিক দুঃখ এড়াইবার আশায় আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে কষ্ট সহ্য করিয়া

থাকি। এস্থলে আমি ফিলজফির নিগূঢ় তর্ক তুলিতে চাহি না; কিন্তু সকলেই বোধ হয় নিদান পক্ষে এ কথাটা স্বীকার করিবেন যে, লোকে সুখের প্রলোভনেই অন্যায় পথ অবলম্বন করে, এবং কর্ত্তব্যের প্রতি আন্তরিক টানই এই প্রলোভন অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়।

মানুষকে অন্তরে বাহিরে কর্ত্তব্যের পথে রাখিবার একটি সহজ উপায় ধর্ম্ম। কিন্তু এ স্থলে ধর্ম্মের তর্ক তুলিতে চাহিনা ও তুলিবার প্রয়োজনও নাই। আমাদের ত এ পথ বন্ধ। শিক্ষকদের উপর নীতিশিক্ষা দিবারই হুকুম জারি হইয়াছে, ধর্ম্মশিক্ষা নিষেধ। তাহার উপর বাড়িতেও যে বড় একটা ধর্ম্মশিক্ষা হয় তা' নয়। নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্য "আগ্‌নাষ্টিক," আর বাকির মধ্যে বেশী ভাগ নামে হিন্দু, কাজে কি তা' বলা কঠিন। অতএব, ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নীতিশিক্ষা দিবার কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

নীতিশিক্ষার আর এক সহজ উপায় আইন-অনুযায়ী দণ্ডের কিম্বা সামাজিক নিন্দার ভয় দেখান। বুদ্ধিমানের নিকট এই প্রকার নীতি-শিক্ষার একমাত্র অর্থ ধরা পড়িও না। আমাদের সমাজের আবার এমন অবস্থা যে, নীচজাতিকে স্পর্শ করিলে তোমাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, কিন্তু শঠতা কর, প্রবঞ্চনা কর, মিথ্যা কথা বল, মাতাল হও, কুৎসিত আমোদ-আহ্লাদে জীবন যাপন কর,' সমাজ এ সমস্ত অম্লানবদনে হজম করিয়া লইয়া তোমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিবে, এবং যদি উত্তম কুলীন হও ও সেইসঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি থাকে ত তোমাকে কন্যাদান করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবে। এমনও শোনা গিয়াছে যে, কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সমাজে লওয়া সম্বন্ধে এই একটিমাত্র আপত্তি কোন কোন স্থানে হইয়াছিল যে, জেলের মধ্যে পান আহারের বন্দোবস্তে জাতিভেদটা নিখুঁৎ বজায় থাকে কি না সন্দেহ! এইপ্রকার সমাজের নিন্দার মূল্য লইয়া বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই।

মনুষ্যস্বভাব, বিশেষতঃ বাল-স্বভাব অনুকরণশীল ও প্রশংসাপ্রিয়। অল্পবয়সে অন্যের, বিশেষতঃ গুরুজনের ও প্রিয়জনের

দৃষ্টান্ত ও তাঁহাদের প্রশংসা ও নিন্দা দ্বারা যে সকল সংস্কার মনে বদ্ধমূল হয়, বস্তুতঃ সেই সব সংস্কার দ্বারাই আমাদের জীবন চালিত হয়। কিন্তু ছেলেরা বাড়িতে যে সব দৃষ্টান্ত দেখে, তাহা হইতে নৈতিক উন্নতিসাধনের কোনই আশা নাই। ছেলে স্কুলে শুষ্ক নীরস নীতিগ্রন্থে পড়িয়া আসিল যে, মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ; এবং বাড়ি আসিয়া দেখিল যে, তাহার বাপ, ভাই, জ্যাঠা, খুড়ো, সকলেই মুসলমান বাবুরচির রান্না দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীবের মাংস গোপনে বিশেষ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া বাহিরে এপ্রকার আচরণ করিতেছেন যেন কথনও নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করেন না, এবং প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ে স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছেন না। সেই স্থানে আবার যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়া থাকে ত সেই বালক দেখিবে যে, তাহার অখাদ্য-ভোজী বাপ,ভাই,জ্যাঠা খুড়ো সকলেই এই ধর্ম্মসভার সভ্য; এবং ধর্ম্মসভার নিয়মাবলীর মধ্যে এমন নিয়মও দেখিবে যে, যাঁহারা "প্রকাশ্য" খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ অবৈধ আচরণ করেন, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইবেন। (কোন সরলমতি পাঠক কি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে এই বঙ্গদেশে এইরূপ ধর্ম্মসভার ও এইরূপ নিয়মের অস্তিত্ব আমার কল্পনাজাত নহে?) বালকটি নিতান্ত নির্ব্বোধ হইলেও একথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, উপরোক্ত নিয়মটির একমাত্র অর্থ সম্ভব—যাহা করিতে হয় লুকাইয়া কর; প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা বলিও, আমরা জানিয়া-শুনিয়াও চোক কান বুজিয়া থাকিব, কিছুই বলিব না; কিন্তু সাবধান, সত্যকথা বলিও না,তাহা হইলেই তোমার সর্ব্বনাশ। এই প্রকাণ্ড জীবন্ত মিথ্যার মধ্যে বাস করিয়া কি এই বালকের কথনও সত্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা জন্মিতে পারে?

দৃষ্টান্ত চুলায় যাক্, উপদেশ দ্বারাও যে, বাড়িতে কোনরূপ নীতিশিক্ষা হয় তা'ও নয়। বাড়িতে যতগুলি পিতৃতুল্য গুরুজন আছেন (এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত) তাঁহাদের

সহিত ছেলেদের গৃহস্থের সহিত চোরের সম্পর্ক। ছেলেদের হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে তাঁহারা চেষ্টাও করেন না পৌঁছানও না। ছেলেরা বোঝে যে, এই সব পিতৃতুল্য গুরুজন কেবল কারণে অকারণে ধমকাইবার নিমিত্ত ও "যা, যা, পড়্‌গে যা" বলিয়া তাড়া দিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন। তাহাদের ভালবাসা, স্ফূর্ত্তি, উচ্ছ্বাস, আনন্দ সেস্থানে ফুটিবার নহে। গুরুজনের প্রশংসাটা নিতান্ত বিরল বলিয়া ছেলেদের হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে বটে, কিন্তু অমিশ্র প্রশংসা গুরুজনের নিকট পাওয়াই দুষ্কর। তাঁহারা আবার ছেলেদের নিকট হইতে এত তফাৎ যে, তাঁহাদের ভর্ৎসনা বা নিন্দা ছেলেদের মনে লেশমাত্র অঙ্কিত হইতে পারে না, তা' ছাড়া তাঁহারা ত চিরকালই ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন, এই ত তাঁহাদের কাজ। বকুনিটা খাবার সময় ছেলেদের মনে একটু অসোয়াস্তির ভাব আসে বটে, কিন্তু সেটা অন্যায় করিয়াছে বলিয়া নয়, বকুনি খাইতেছে বলিয়া, আর প্রহারের আশঙ্কায়।

বাড়ির ভিতরে মা পুত্রকে পিতৃশাসন হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজে মিথ্যা বলিতেছেন ও মিথ্যা শিখাইতেছেন। ছেলেরা বাড়ির ভিতর যায় খাইবার জন্য ও আদর পাইবার জন্য। বাড়ির ভিতরটা নীতি কিম্বা অন্য কোনপ্রকার শিক্ষার স্থান নহে। অশিক্ষিতা মাতারা, বালিকা বয়সেই মাতৃত্বভার স্কন্ধে লইয়া কিই বা শিক্ষা দিবেন! তাঁহারা কেবল ভালবাসিতে পারেন, এবং তাঁহাদের কাছে অন্ধ ভালবাসা ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করাও যায় না।

নীতিশিক্ষার উচিত উপায় হচ্ছে, কর্ত্তব্য ও পবিত্রতার সৌন্দর্য্য বাল্যাবস্থায় মনের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। পবিত্রতা, সত্য, দয়া, অহিংসা, ইত্যাদিকে যদি হৃদয়মধ্যে সংস্কাররূপে বদ্ধমূল করিতে চাহ ত এই সব গুণের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে এবং তাহা হইলেই মন আপনা হইতেই এদিকে আকৃষ্ট হইবে। অপবিত্রতা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা যে কতদূর কুৎসিত তাহাই দেখাইতে হইবে। এবং এমন করিয়া

চরিত্র গঠন করিতে হইবে যে, আমরা যেমন অপরিষ্কার কিম্বা বীভৎস কোন পদার্থ স্পর্শ করার কল্পনা করিতেও সঙ্কোচ ও ঘৃণা অনুভব করি, তেমনি অপবিত্রতার সংস্পর্শ কল্পনা করিতেও ঘৃণা অনুভব করিব ও অন্যায় কার্য্য করিতে সঙ্কোচ বোধ করিব। আমরা যেমন ছেলেদের কাদায় লুটাই-বার সুখ পরিহার করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার সুখ ভোগ করিতে শিক্ষা দিই, সেই প্রকারে তাহাদিগকে অপবিত্র ও অন্যায় কার্য্য পরিহার করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু এপ্রকার শিক্ষা দু' চারিটি শুষ্ক নীরস নীতিবচনের কর্ম্ম নহে; ইহা ঘরে ঘরে পদে পদে সহস্র ছোটখাট খুঁটিনাটির উপর দৃষ্টি রাখার কর্ম্ম, ইহা বাল-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখ, কষ্ট আহ্লাদ সহানুভূতির সহিত বুঝিয়া চলার কর্ম্ম। নীতি-বচনের বাঁধিবোলের মধ্যে পবিত্রতা ও ন্যায়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি পবিত্রতা কতদূর সুন্দর ও অপবিত্রতা কত-দূর কুৎসিত ইহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাইতে চাহ ত বরং ভাল নভেল ও কবিতা পড়িতে দাও। মরাল টেক্স্‌ট্‌বুক্‌এর সহিত হৃদয়ের কোনই সংশ্রব নাই।

আমাদের নীতিজ্ঞেরা আমোদ-আহ্লাদের উপর বড়ই নারাজ। কিন্তু আমি বলি যে, যদি অবৈধ অপবিত্র আমোদ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে চাও ত তাহার পরিবর্ত্তে বৈধ আমোদ-আহ্লাদটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সমাজে যদি বৈধ আমোদ-আহ্লাদের স্থান না রাখ ত লোকে স্বভাবতঃ সমাজের বাহিরে অবৈধ আমোদ-আহ্লাদ অন্বেষণ করিবে, সহস্র নীতি-জ্ঞানে আমোদ-আহ্লাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে না। আমাদের সমাজের অবস্থা এ রকম যে, বাড়ি অত্যন্ত নিরানন্দ, এবং সব সময়ে শান্তির আলয়ও নয়; কাজেই ক্রীড়া কৌতুক ও বিশ্রামের জন্য লোকের বাধ্য হইয়া অন্যত্র যাইতে হয়। পেট্রিয়টরা শুনিয়া রাগ করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইংলণ্ডের ন্যায় আমাদের "হোম লাইফ্‌" থাকিলে ভালই হইত।

স্বরলিপি।

আনন্দ-ধ্বনি।

রাগিণী মিশ্র হাম্বির—তাল ফেরতা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে!
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল, "উঠ উঠ" সঘনে, গভীর নিদ্রা মগনে।
বল, তিমির রজনী যায় ওই, আসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী,
নব আনন্দে, নব জীবনে, ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে; বিহগকলকূজনে।
হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয় অচল পথে,
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে।
চল যাই কাজে মানব সমাজে, চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না অলস শয়নে, থেকে না মগন স্বপনে!
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস কুহক মোহ যায়,
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপন-প্রায়!
ফেল জীর্ণ-চীর পর নব সাজ, আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে অমল অটল জীবনে।

২|৩
॥ গা মা ধপা -া। গা মা ^ন^ধা -া। ধনঃধঃ-ননা র্সাঃনঃ ।
॥ আ ন ন্দধ্ব — । নি জা গা ও। গ —গ নে ।

৩-৪|১
। ধা না -া। র্সা -া ধা -না। পা -ধা -া। মা -া -প্রা -মা।
। কে আ —। ছ — জা —। গি — —। য়া — — —।

। গা -মাঃ -গঃ। রা -া গা -া। ধা -পা -া। রা -া গা -া।
। পূ — —। র — বে —। চা — —। হি — য়া —।

। পা পা -া। ধা -া না -ধা। পা -ধা -া। র্সা -া -া -না।
। ব ল —। উ — ঠ —। উ — —। ঠ — — —।

। ধা -না -া। র্রা -া র্সা -া। গা গা -া। গা -া গা -মগা।
। স — —। ঘ — নে —। গ ভী —। র — নি — ।

। রগরা -সা -া। ন্া -া ন্সা -রা। সা -া -া। ধা -া না -া॥
। দ্রা — —। ম — গ —। নে — —। জা — গা ও ॥

II । । পা পা। পা পা -া। ধা -া ধা -া। না না -া।
II হে র্ । তি মি —। র — র —। জ নী —।

। র্সা -া -নর্সা -র্রা। র্সা -া -া। -া -া -া -না। ধা না -া।
। যা — — য়। ঐ — —। — — — —। হা সে —।

। র্সা -া নর্সা -া। ধা পা -া। মা -া গমা -পা। মা -া -া।
। উ — ষা —। ন ব —। জ্যো — তি —। র্ময়ী — —।

। -া -া -া -া। র্গা র্গা র্গা। র্গা -া র্গা -র্মা। র্রা র্সা -া।
। — — — —। ন ব আ। ন — ন্দে —। ন ব —।

। না -া নর্সা -র্রা। র্সা -া -া। -া -া । ।। গা -া গা।
। জী — ব —। নে — —। — — — —। ফু — ল্ল।

। গা গা গা -মগা। রা গা রা। সা রা সা -া। সা রা গা।
। কু সু মে —। ম ধু র। প ব নে —। বি হ গ।

। মা পা ধা -া। -না -া না। র্সা -া -া II । । সা সা।
। ক ল কূ —। — — জ। নে — — II হে র।

। সা সা -মা। মা -া মা -া। গমা -পা -মা। গা -া -া -া।
। আ শা —। র — আ —। লো — —। কে — — —।

। গা গা -া। মা -া গমা -পা। গা -মা -রা। সা -া -া -া।
। জা গে —। শু — ক —। তা — —। রা — — —।

। পা পা -র্সা। না -া ধপা -া। গা মা -া। না -া ধা -া।
। উ দ —। য় — অ —। চ ল —। প — থে —।

। ধা না ধা। না না র্সাঃনঃ। ধা না ধা। না -া র্সা -া।
। কি র ণ। কি রী টে। ত রু ণ। ত — প ন।

। পা ধা পা। মা গা মা -গা। রা -গা -মা। গা -া -া -া।
। উ ঠি ছে। অ রু ণ —। র — —। থে — — —।

। পা পা -া। ধা -া ধা -া। না -া -া। র্সা -া -া -না।
। চ ল —। যা — ই —। কা — —। জে — — —।

। ধা না -া। র্সা -া নর্সা -র্রা। না -র্সা -ধা। পা -া -া -া।
। মা ন —। ব — স —। মা — —। জে — — —।

। র্গা র্গা -া। র্গা -া র্গা -র্মা। র্রা -া -া। র্সা -া -া -া।
। চ ল —। বা — হি —। রি — —। য়া — — —।

। ^ন^মা মা -া । মা -া মা -া। গমা -পা -মা। পা -া -া -া।
। জ গ —। তে — র —। মা — —। ঝে — — —।

। সা সা সা। রা রা রা -া। গা -া মা। গা -া -া -া।
। থে ক না। অ ল স —। শ — য় । নে — — —।

৪।৩ ৩-৪।২
। গা মা ধপা -া । গা মা ^ন^ধা -া । পা পা পা।
। (আ ন ন্দধ্ — । নি জা গা ও)। থে ক না।

৩।২
। ধা ধা ধা -া। না -া না। র্সা -া -া -া॥ সা -া -া।
। ম গ ন —। স্ব — প। নে — — —॥ যা য় —।

। {রা -া রা। গাঃ -রঃ গা। মা পা পা। ধা ধা পা।
। {লা — জ। ত্রা — স। আ ল স। বি লা স।

। মা গা মগা। রগা -মপা মা। গা -া -া। -া পা -া।
। কু হ ক। মো — হ। যা — —। য় ও ই।

। র্সা র্সা না। র্সা নর্সর্রা র্সা। ধা -ঞা ধা। পা -া -া।
। দু র হ। য় শো ক। সং — শ। য় — —।

। ধা -া পা। মা পা মা। (গা -া -া। -ঃরঃ সা -া।)}
। দুঃ — খ। স্ব প ন। (প্রা — —। য় যা য়।)}

। পা পা -া। র্সা -া র্সা। নর্সর্রা -র্সা -া। র্সা -া -া।
। ফে ল —। জী — র্ণ। চী — —। র — —।

। নর্সা ধা -না। র্সা -নর্সা র্রা। না -র্সা -ধা। পা -া -া।
। প র —। ন — ব। সা — —। জ — —।

। র্সা -া -া। র্গা -া র্রা। র্সা -া -ধা। র্সা -া -া।
। আ — —। র — ম্ভ। ক — —। র — —।

। র্সা -নর্সা র্র্া। র্সা -না র্সা। ধা -া -া। পা া -া।
। জী — ব। নে — র। কা — —। স্থ — —।

। সা সা সা। রা রা রা। গা গা -া। মা মা মা।
। স র ল। স ব ল। আ ন —। ন্দ ম নে।

। পা পা পা। ধা ধা ধা। না -া না। র্সা -া -া॥
। অ ম ল। অ ট ল। জী — ব। নে — —॥

ব্যাখ্যা।

১। এই গানে মধ্যে মধ্যে তাল-পরিবর্ত্তন হয়। আনন্দ-ধ্বনি" হইতে আরম্ভ করিয়া "গগনে" পর্য্যন্ত ঢিমা-তেতালার তাল। তাই শিরোদেশে ৪।৩ এই তালাঙ্ক রহিয়াছে—অর্থাৎ প্রত্যেক তালি-বিভাগে চারিটি করিয়া মাত্রা আছে—এবং প্রতি মাত্রা ৩ সংখ্যা দ্রুত উচ্চারণ করিলে যত সময় লাগে তত ক্ষণ স্থায়ী। "কে আছ" র আরম্ভ হইতে "শয়নে" পর্য্যন্ত পোস্তা তাল। তাই শিরোদেশে ৩—৪।২ এই তালাঙ্ক আছে। "থেক না মগন" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একতালা। তাই শিরোদেশে ৩।২ এই তালাঙ্ক রহিয়াছে।

ভুলে।

একেলা তটিনী-কূলে　　শ্যাম-নব-দুর্ব্বাদলে
শুয়েছি জগত ভুলে আজিকে হেথায়।
কাহারে আপনা দিয়া　　বাঁধিতে পারিনি হিয়া,
বেঁচে আছি তবু যেন কাহার আশায়।
ঝরে ঝরে পড়ে পাতা　　মনে পড়ে কার কথা
মনে আসে কার মুখ আজি এ নিশায়।
দূরে ডেকে ওঠে পিক্　　কি যেন হ'লনা ঠিক্
কি যেন ক'রেছি ভুল জীবন-খেলায়।

তুলে ফুল সারা বেলা গাঁথিতে ফুলের মালা
স্থরেতে বাঁধিতে বীণা আপনায় ভুলে,
কাহারে শুনাতে গান, কার হাতে দিতে প্রাণ
কার গলে দিতে মালা, দেছি কারে তুলে।

মেঘ-কোলে আলো ফোটে রাঙা-রবি বসে পাটে
মনে পড়ে এলোচুল, অাঁখি ছুটি কার।
সাঁজেতে বকুল ছায় রজত জোছনা ভায়
মনে পড়ে গানে কার বাজেগো সেতার।
তেমনি সে ফুটে ফুল বায়ু বহে ঢুলুঢুল্
নদী বহে কুলুকুল্ সমীর দোলায়,
উছলে তেমনি জল শতদল ঢলঢল্
পিক্ কুহু কলকল্ প্রভাত নিশায়।

চাঁদ সে তেমনি ওঠে ধেনু আসে যায় গোঠে
সমুদ্র পাষাণে লোটে, হাসে শুকতারা,
তবু যেন কিছু নাই পুড়ে যেন সব ছাই,
নিশিদিন যেন তাই কেঁদে আমি সারা।
হাসিতে আসেনা হাসি বাজেনা প্রাণের বাঁশি
প্রবাসের পথে আসি, যেন আমি-হারা।
বিরহে বিকল প্রাণ মনে আসেনাক গান
কোথা তুমি, কোথা তুমি মোর ধ্রুবতারা।

আশায় পরাণ বেঁধে শুধু জেগে শুধু কেঁদে
জীবন কি শুধু যাবে প্রতীক্ষায় তোর।
হিজিবিজি কাল-হৃদি ফুটে কি হবে না ছবি
রবেকি, রবেকি, চির ভেজান এ দোর।
জীবন প'ড়েছে ঢোলে কাঁদিয়া মরণ-কোলে
হবেনা কি, হবেনাকি, এ রজনী ভোর।
হারাইয়া লাভে মূলে শুয়েছি ছুনিয়া ভুলে
অকূলে, ফিরাও কূলে ধ্রুবতারা মোর।

সাধনা।

মহামায়া।

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙ্গা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোন কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর দৃষ্টি ঈষৎ ভৎর্সনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম্ম এই, তুমি কি সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ? আমি এ পর্য্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষৎ ভয় করিয়া চলে তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল— দুটা কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা কোন কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল—"আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।"—রাজীবের যে কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। কথাটা নিতান্ত নীরস নিরলঙ্কার, এমন কি, অদ্ভুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে থতমত খাইয়া গেল—

আরও দুটো পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ একটু নরম করিয়া আনিবে তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙা মন্দিরে নদীর ধারে এই মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্ব্বোধ লোকটা শুদ্ধ কেবল বলিল, চল আমরা বিবাহ করিগে!

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য। যেন শরৎ-কালের রৌদ্রের মত কাঁচা সোনার প্রতিমা—সেই রৌদ্রের মতই দীপ্ত এবং নীরব এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।

তাহার বাপ নাই; বড় ভাই আছেন—তাঁহার নাম ভবানী-চরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাইবোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক—মুখে কথাটি নাই কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরের মত নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটা বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড় সাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রের ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটীর কুঠিতে লইয়া আসেন। আমি যে প্রাচীনকালের কথা বলিতেছি তখনকার সাহেবদের মধ্যে এরূপ সহৃদয়তা প্রায় দেখা যাইত। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ইহারা ভবানীচরণের প্রতি-বেশীরূপে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ক্রমে ক্রমে ষোল, সতের, আঠারো, এমন কি, উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধসত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙ্গালীর ছেলের এরূপ অসামান্য সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভারি খুসি হইলেন; মনে করিলেন, ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জীবনের আদর্শস্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এদিকে সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনুরূপ কুলসম্পন্ন পাত্র জোটে না। তাহারও কুমারী-বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, যে, পরিণয়বন্ধন যে দেবতার কার্য্য তিনি যদিও এই নরনারীযুগলের প্রতি এ যাবৎ বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নষ্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দুটো চারটে মনের কথা বলিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না—তাহার নিস্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টি রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়।

আজ শতবার মাথার দিব্য দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙ্গা মন্দিরে আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যত কিছু বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পরে, হয়, আমরণ সুখ, নয়, আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন

একটা সঙ্কটের দিনে রাজীব কেবল কহিল—"চল, তবে বিবাহ করা যাউক্!" এবং তার পরে বিস্মৃত-পাঠ ছাত্রের মত থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাজীব যে এরূপ প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেকক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দ্দিষ্ট করুণধ্বনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তব্ধতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্দ্ধসংলগ্ন ভাঙ্গা কবাট এক একবার অত্যন্ত মৃদুমন্দ আর্ত্তস্বর সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল; মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্-বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমুলগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোক্‌রা একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে, শুষ্ক পত্ররাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সর্‌সর্ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণবাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্‌ঝর্ করিয়া উঠে, এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙ্গা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ-ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এইসমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইতে একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর একবার ভিক্ষুকভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল—"না, সে হইতে পারে না।"

মহামায়ার মাথা যেমনি নড়িল, রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত মহামায়ার

মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে, আর কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কতকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে—সে কি কখনো রাজীবের মত মৌলিক ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে! ভালবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। যাহা হউক্, মহামায়া বুঝিতে পারিল তাহার নিজের বিবেচনাহীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদুর স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে; তৎক্ষণাৎ সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"আমি কালই এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, ভাবটা দেখাইবে—সে খবরে আমার কি আবশ্যক! কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না—শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

রাজীব কহিল, আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপুরের কুঠিতে বদ্‌লি হইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।

মহামায়া আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল দুই জনের জীবনের গতি দুই দিকে—একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দী করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষৎ খুলিয়া কহিল—"আচ্ছা!" সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত শুনাইল।

কেবল এই কথাটুকু বলিয়া মহামায়া পুনশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে—এমন সময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"চাটুয্যে মহাশয়!" মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে, বুঝিল তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফা-

একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তিপ্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশপাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।

এমন সময়ে বাহির হইতে সবলে কে দ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্রে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোম্‌টা। রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া। উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?" মহামায়া কহিল "হাঁ! আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বল, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর কখনো আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না—তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট, তখন আর সমস্তই তুচ্ছজ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল "তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিও—আমাকে ছাড়িয়া গেলে আর আমি বাঁচিব না।"

মহামায়া কহিল "তবে এখনি চল—তোমার সাহেব যেখানে বদ্‌লি হইয়াছে সেইখানে যাই।"

ঘরে যাহা কিছু ছিল সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এম্‌নি ঝড় যে দাঁড়ান কঠিন—ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগুলির মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া যথাসময়ে অগ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। অগ্নিও ধূধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভস্ম হইয়া তাহার হাত দুটি মুক্ত হইয়াছে। অসহ্য দাহ-যন্ত্রণায় একটিমাত্র কথা না কহিয়া মহামায়া উঠিয়া বসিয়া পায়ের বন্ধন খুলিল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড গাত্রে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে কেহই ছিল না, সকলেই শ্মশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া

একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কি ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া অদূরবর্ত্তী রাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কি ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানি মাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোম্‌টাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোমটার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোমটার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ দুঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্ব্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোমটাচ্ছন্ন মূর্ত্তি চিরদিন পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে—বিশেষতঃ মহামায়া পুরাণ-বর্ণিত কর্ণের মত সহজ কবচধারী—সে আপনার স্বভাবের চারিদিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পর মাঝে আবার যেন আর একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরো একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে, অহরহ পার্শ্বে থাকিয়াও সে এত দূরে চলিয়া

গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না—কেবল একটা মায়াগণ্ডীর বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে—নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশি-যাপন করে।

এমনি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্না-রাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জ্জিত রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মানুষ এ রকম সময় স্পষ্ট একটা কোন কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মত একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মত একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কি ভাবিল জানিনা, কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যেন সমস্ত পূর্ব্ব নিয়ম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে, এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মত নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মত উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি,
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি ?

সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি ! এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে ! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে ! তারি নারী-হৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হ'তে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন !

আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ ! এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায় !
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই

তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছি আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্য্যের দস্যু তারা
লুটে-পুটে নিতে চায় সব! এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বাসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখে দিয়া
বহে' যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হ'তে
কলস ভরিয়া তারা ল'য়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটীরে
আপনার তরে! তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ!
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে'।

সারসংগ্রহ।

একাত্মবাদ—প্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ ?

ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই নিঃসংশয়ে স্থির করা যায় না। ভারতবর্ষ এত প্রাচীন যে, ইহার বাল্য ও যৌবনের ঘটনার পদাঙ্ক বিলুপ্তপ্রায়। রাজাজ্ঞা-লাঞ্ছিত প্রস্তরস্তম্ভ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, খোদিত ধাতুফলক ইহার অন্ধকার ভেদ করিতে পারে না। এজন্য অনেকে বলেন যে, ইতিহাসের প্রাতঃ-সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে উদ্ভাসিত ভারতীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে মতা-মত নির্ম্মাণ নিষ্ফল ও নিরর্থক। কিন্তু কথাটা নিতান্ত একদিক-ঘেঁষা। মতামত নির্ম্মাণের একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। জ্ঞানের উন্নতি ও বিস্তার ইচ্ছা করিলে মতামত বিনা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। An ounce of fact is worth a pound of theory—এবাক্য নিতান্ত স্থূলদৃষ্টি-প্রসূত। বিচ্ছিন্ন সহস্র সত্য থাকিলেও মতামতের চুন সুরকি ব্যতীত তাহা কোন কার্য্যেই আসে না। সত্য যাহা তাহা ত সত্য আছেই কিন্তু মনুষ্যের বোধা-য়ত্তে না আসিলে তাহা সমুদ্রের কুক্ষিগত রত্নের ন্যায় নিষ্প্রয়ো-জনীয়। যতটুকু সত্য পাওয়া যায় তাহাকে লইয়াই মতামত গড়িতে হয়, নতুবা জ্ঞানের বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কোন কল্পে ৺চন্দ্রশিখর দেব "Remi-niscences of Ram Mohun Roy"শীর্ষক যে দুইটি ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহার একটিতে বলিয়াছেন যে,"রামমোহন রায়ের মতে সুতীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে প্রাচীন ব্রাহ্মণশাস্ত্র হইতে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার

হইতে পারে। রামমোহন রায়ের গ্রন্থবিশেষে দেখা যায়, এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি স্থির করেন যে, পরশুরামের সময় হইতে ভারতবর্ষে বর্ণবিভেদ দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। তিনিই একপ্রকার বর্ণভেদের আদিকর্ত্তা। পরবর্ত্তী স্বদেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানে এই সত্যটি আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যতদূর দেখা যায় তাহাতে দাঁড়ায় এই যে, প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রের আলোচনায় যে আলোক পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাচীন ভারতীয় ঘটনাবলীর সময় নির্ণীত না হউক, তাহাদের পর্য্যায় ও ক্রম অনেকটা স্থির করা যাইতে পারে। মতামতের অভ্যুদয় ও পতন, সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও বিপর্য্যয় এবং ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত অপরাপর বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে উপরোক্ত প্রণালী বিশেষরূপে কার্য্যকরী।

গত অক্টোবর মাসের "মোনিষ্ট" নামক মার্কিন-দেশীয় ত্রৈমাসিক পত্রে "একাত্মবাদ—প্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ?" নামক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। লেখক অধ্যাপক রিচার্ড গর্ব্বে। তিনি বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ যখন কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বর এত বাড়াইয়া তুলিলেন যে, তাহা লোকের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল—তখন লোকের ভাবনা উপস্থিত হইল যে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি। তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, "আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমাকে কোথায় যাইতে হইবে, জন্মের পূর্ব্বে আমি কোথায় ছিলাম, আর যাঁহার উদ্দেশে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যাগযজ্ঞ হইতেছে—তিনি কে, তাঁহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ?" এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইতেই উপনিষদ্-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। উপনিষদের সার কথা এই যে, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্বিধ বিকাররহিত, বৃহৎ

হইতে বৃহৎ অণু হইতে অণু, এক আত্মা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপন করিয়া রহিয়াছেন, ইহাঁকে বিবিক্ত করিয়া লইলে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকে না। এক কথায়, উপনিষদের মূলমন্ত্র "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"। বেবর, মোক্ষমূলর, রেঞ্জো, ডয়সন্, ভাণ্ডারকার প্রভৃতির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া লেখক বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা এই একাত্মবাদের প্রবর্ত্তক নহেন, একাত্মবাদের উদ্ভাবক ক্ষত্রিয়। প্রমাণস্বরূপ তিনি কয়েকটি ঔপনিষদিক আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রথম, বৃহদারণ্যক ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদোক্ত বালাকী গার্গ্য ও কাশীরাজ অজাতশত্রুর সম্বাদ। বালাকী গার্গ্য কাশীরাজকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে গিয়া পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা তাহাতে ব্রাহ্মণের ভ্রম দর্শাইয়া তাঁহাকে যথাবৎ ব্রহ্মোপদেশ করেন।

দ্বিতীয় আখ্যায়িকা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্গত। রাজা প্রবাহণ জৈবালি ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু ও তাঁহার পিতা গৌতমকে ব্রহ্মোপদেশ করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, তদুপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগণের অবিদিত ছিল।

শেষ আখ্যায়িকাটী ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়। এখানে উদ্দালক আরুণি প্রমুখ ব্রাহ্মণবর্গকে রাজা অশ্বপতি ব্রহ্মোপদেশ করিতেছেন।

লেখক বলেন, এই সকল আখ্যায়িকা সত্য হউক মিথ্যা হউক তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যখন প্রামাণ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এরূপ আখ্যায়িকা স্থান পাইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় একাত্মবাদ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নহে। ব্রাহ্মণেরা এমতের প্রবর্ত্তক হইলে নিঃসঙ্কোচে নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখি-

বার যত্ন করিতেন——উক্ত আখ্যায়িকাগুলিকে শাস্ত্রে স্থান দিতেন না।

এখানে দুইটি আলোচ্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে, এই একাত্মবাদ বিশেষ অর্থে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কি না। যদি ঋগ্বেদের মন্ত্রখণ্ড উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তাহা হইলে একাত্মবাদ যে উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। বামদেব ঋষি বেদমন্ত্রে বলিয়াছেন যে, "আমি মনু, আমি সূর্য্য, আমি চন্দ্রমা" ইত্যাদি। এখানে একাত্মবাদ নামের উল্লেখ নাই বা তাহার দার্শনিক বিবৃত্তি নাই। তবে একাত্মবাদ ইহার মর্ম্মে নিহিত রহিয়াছে। এক অর্থে সমুদায় ঋক্-মন্ত্রের অন্তরালে একাত্মবাদ রহিয়াছে। চরাচরাত্মক জগৎ এক আত্মা—এই ভাবে মন অধ্যাসিত হইলে যখন যে বস্তুতে মন আকৃষ্ট হয় তাহাতেই আত্মদৃষ্টি করিয়া মন পরিতৃপ্ত হয়। মন্ত্রগুলিকে এইভাবে দেখিলেই তাহাদের পূর্ব্বাপর মিলন ও অর্থ পরিস্ফুট হয়। * আরও একটী দেখা যায় যে, দশ মহা উপনিষদেরও অনেক স্থানে ব্রহ্মোপদেশ কালে "ইতি শুশ্রুমঃ পূর্ব্বেষাং যেন স্তদ্ব্যাচচক্ষিরে" এরূপ ভূয়ঃ প্রয়োগ আছে। যেখানে ক্ষত্রিয়ের নামগন্ধ নাই সেখানেও "কস্মৈ দেবায় হবিষা জুহুমঃ" এরূপ প্রস্তাবনা করিয়া ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ আছে। অতএব একাত্মবাদ প্রবর্ত্তনায় ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য উপনিষদ্-প্রমাণে দাঁড়ায় না। যদিই বা মানিয়া লওয়া যায় যে, উপনিষদ্-শাস্ত্র রচনায় ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য, তাহা হইলেও বামদেবের উক্তিতে বেদমন্ত্রে একাত্ম-

---

* প্রমাণ সংগ্রহ করা বর্ত্তমান উদ্দেশ্যের বহির্ভূত, তবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, বেদে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রগুলীতে একই দেবতা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—একথা অনেক বিদেশীয় পণ্ডিতেরও অভিমত।

হওয়ায়, গভীর বিস্ফোটকসকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে নিশ্চয়ই সেই পশুর উৎকট যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকিবে।

হর্সলি। ক্রেটন-তৈলের ফলে ফোস্কা হইতে পারে কিন্তু সে অধিকক্ষণ থাকে না।—তা'ও আবার মর্ফিয়া-প্রয়োগে প্রশমিত হয়। ইহাও যেন মনে থাকে, মাংসপেশীতে চেতনশক্তি অতি অল্পই আছে। তা' ছাড়া, এইরূপে যে বিস্ফোটক উৎপন্ন হয় তাহাতে কিছুমাত্র যন্ত্রণা হয় না। এরূপ বিস্ফোটককে ডাক্তারি ভাষায় ঠাণ্ডা বিস্ফোটক বলে, ইহাতে আদবে দব্‌দবানি নাই—সুতরাং ইহাতে কোন কষ্ট হয় না।

আগন্তুক।—আচ্ছা মহাশয়, "কুরারে" প্রয়োগের কথা কি বলেন? ইহা কি সত্য নহে যে, আপনারা ঐ দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া পশুদিগকে একেবারে অক্ষম করিয়া ফেলেন, অথচ তাহাদের চেতনা পূরামাত্রায় থাকে?

হর্সলি।—এ কথা নিতান্ত অর্থহীন। "কুরারে" একপ্রকার বিষ—দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা তীরের ফলায় ব্যবহার করে। কিছুকাল হইল, এই দ্রব্যটি শারীরতত্ত্ব-ঘটিত পরীক্ষায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—ভ্রম-নিরাকরণের জন্য ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এই দ্রব্যটির প্রয়োগে চর্ম্মস্থিত ঐন্দ্রিয়িক স্নায়ু ও পৈশিক স্নায়ুর শেষাংশ অসাড় হইয়া পড়ে—সুতরাং ইহা দ্বারা পশুদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেবল যে অসাড় করিয়া ফেলা হয় এরূপ নহে—তাহাদের চেতনাও বিলুপ্ত হয়।

আগন্তুক।—কিন্তু যখন তাহাদের চেতনা আবার ফিরিয়া আসে, তখন অবশ্য তাহাদের অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

হর্সলি।—তাহাদের চেতনা আর ফিরিয়া আসে না। এই

সকল পরীক্ষায়, অচেতন অবস্থায় থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে বধ করা হয়।

আগন্তুক।—কিন্তু যে স্থলে, তাহাদিগকে আবার সচেতন করিয়া তোলা হয়, সেস্থলে কিরূপ হয়? যেমন মনে করুন, যখন তাহাদের মস্তিষ্কের অৰ্দ্ধ-মণ্ডল অপসারিত করা হয়, তখন কিয়ৎ সপ্তাহ ধরিয়া তাহাদের ভীষণ যন্ত্রণা পরে উপস্থিত হয় কি না? ম্যান্‌চেষ্টারের বিশপ এই কথা বলেন।

হর্স্‌লি।—না, তা' হয় না। আমি তাহা এখনই দেখাইয়া দিব। এরূপ পরীক্ষা-স্থলে মনুষ্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, পশুদেরও প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, প্রথমে তাহাদিগকে ক্লোরোফর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা অচেতন করিয়া, তাহার পর তাহাদিগকে একটা টেবিলের উপর শোয়ান হয়—গরম জলের বোতল তাহাদের চারিপার্শ্বে রাখা হয়, তাহাতে শস্ত্র-ক্রিয়া-জনিত অবসাদ অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া থাকে। পচন-নিবারণের বিবিধ উপায় পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করিয়া অতি সাবধানে এই সকল শস্ত্র-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আগন্তুক। কিন্তু যখন ঐ পশুসকল পুনর্ব্বার চেতনালাভ করে, তখন তাহাদের মস্তিষ্ক-খণ্ড অপসারিত হওয়ায়, নিশ্চয়ই তাহাদের উৎকট যন্ত্রণা উপস্থিত হয়?

হর্স্‌লি। তোমাদের সহজে এইরূপ মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক সমস্ত শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কই সর্ব্বাপেক্ষা চেতনা-হীন পদার্থ। মনুষ্যের উপর ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে—মস্তিষ্কের কিয়দংশ বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে, অথচ রোগী বুঝিতে পারিবে না যে, তাহাকে কোনপ্রকারে স্পর্শ করা হইয়াছে। মনুষ্য-রোগীর সম্বন্ধে

আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, পশুদিগের যদি কিছুমাত্র কষ্টের লক্ষণ দেখি, অমনি আমরা তাহাদিগের চর্ম্মমধ্যে মর্ফিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দিই। মনুষ্যের ন্যায় তাহাদিগের ক্ষতস্থান পচন-নিবারণী ক্রিয়ার দ্বারা এক সপ্তাহের মধ্যেই সারিয়া উঠে। ক্ষত স্থানে পুঁজ সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা জুড়িয়া যায়—চব্বিশ ঘণ্টাকাল অল্পস্বল্প বেদনা থাকে মাত্র।

আগন্তুক। পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিবার জন্য জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষা করা কি নিতান্তই আবশ্যক?

হক্সলি। তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি আমরা দেখি, কোন প্রকার প্রতিকূল উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে—অমনি আমরা পরীক্ষায় ক্ষান্ত হইয়া, পরীক্ষাধীন পশুকে ক্লোরোফর্ম্ম-প্রয়োগে বধ করি। ইহার প্রমাণস্বরূপ একণে তোমাকে কতকগুলি পশু প্রদর্শন করিব, তাহাদের মস্তিষ্কার্দ্ধ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

আগন্তুক। কিন্তু সে যাই হউক, এই সকল পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি?—উহার ঔচিত্য কি প্রকারে সমর্থন করেন?

হক্সলি। এ সঙ্গত প্রশ্ন বটে; এই বিষয় আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে বিশপ পাদ্রিরা এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল করিতেন। এই সকল পরীক্ষার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ ভিন্ন আর কোনপ্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—শুধু পরীক্ষা করিয়া দেখা, মস্তিষ্কের কোন্ অংশে অপস্মার-রোগের আক্রমণ প্রথম আরম্ভ হয়।

পশুদিগের উপর এইরূপ পরীক্ষা করিয়া বিলক্ষণ ফললাভ করা গিয়াছে—ইহাতে কি মনুষ্য, কি পশু উভয়েরই অশেষ উপকার। বানরদিগের উপর পরীক্ষা করিয়া আমরা এক্ষণে

জানিতে পারিয়াছি, অপস্মার-রোগের বীজ কোথায়—মস্তিষ্কের ঠিক্ কোন্ স্থলে তাহার মূল, আমরা অঙ্গুলী নির্দ্দেশনপূর্ব্বক এক্ষণে দেখাইয়া দিতে পারি।

ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম।*

আদিম কাল হইতে সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম্ম যেমন নিরবচ্ছিন্ন মানবসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে এমন আর কিছুই নহে। সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা মানবহৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল—কিন্তু অসহায় মানবশিশু সংসারে আসিয়াই প্রবলা প্রকৃতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার চতুর্দ্দিকেই রোগ শোক, বিপদ আপদ, যুদ্ধবিগ্রহ, মৃত্যুভয়; শিকারে সে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসে; দাবানলে তাহার যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া যায়; সে এক করিতে যায়, আর এক হইয়া পড়ে—সুতরাং সহজেই সে আপনাকে কোনও দুর্দ্দান্ত অপদেবতার ক্রীড়াসামগ্রী ঠাহরাইয়া বসে এবং সেই অদৃশ্য নিষ্ঠুরের হিংসাবৃত্তি প্রশমিত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। প্রকৃতিতে বিপ্লবও নানা—নদী কূল প্লাবিত করিয়া উথলিয়া উঠে, আকাশ দারুণ মেঘগর্জ্জনে ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভূমিকম্পে একটা প্রলয়-ব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হয়, কাল-ছায়া আসিয়া চন্দ্রের শুভ্রকান্তি ঢাকিয়া ফেলে; ভয়বিহ্বলচিত্তে দুর্ব্বল মানবসন্তান চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে, কোনও কারণ খুঁজিয়া পায়

* Religion: Its Future—By the Rev Dr. Momerie.

না—কেবল এই বুঝে যে, এখানে সহস্র দানবশক্তি তাহার সঙ্গে নিতান্ত লাগিয়াছে, সকলগুলিকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে নিস্তার নাই। নিজের প্রকৃতি দিয়া সে দেবচরিত্র নির্ণয় করিতে বসে, এবং উৎকোচদানই তাহার নিকটে দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হয়। এখন এই দানব-দেবতাকে কি দেওয়া যায়? শস্য, ফলমূল মদ্যমাংস যাহা দাও, তিনি সর্ব্বভুক্। রক্তদৃশ্যে দেবতার বিশেষ আনন্দ। অতএব, দেবতাকে প্রসন্ন করিতে চাহ ত যত পার বলিদান কর। যাহারা বিশেষরূপে দেবচরিত্রের রহস্য উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইল, তাহারাই ক্রমে গুরুপুরোহিত হইয়া উঠিল। এবং প্রথমে যেমন ইহলোকের সুখকামনাই দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার একমাত্র কারণ ছিল, কালক্রমে তাহার সহিত পারলৌকিক সুখকামনা যুক্ত হইল। পারলৌকিক সুখের আশায় লোকে ইহলোকে অনেক কষ্টভোগও স্বীকার করিল। পরলোকে স্বর্গলাভের আশায় লোকে আপনাকে হোমানলে আহুতি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রকে ভাসাইয়া দিয়াছে, না করিয়াছে হেন কাজ নাই। দুঃখ হইতে অব্যাহতি এবং সুখলাভের জন্য মানুষ এমনি অধীর।

এইসকল আচার অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে এক একজন মহৎলোকের আবির্ভাব হইয়াছে—যেমন, কন্‌ফ্যুশস্, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ; তাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যাজকদিগের শিক্ষার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন, যাগযজ্ঞ, জীববলি মন্ত্রতন্ত্র সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং চরিত্রের উৎকর্ষসাধনই যে মানবজীবনের উন্নতির মুখ্য উপায় এই সত্যটি বারবার প্রচার করিয়াছেন। সংস্কারকদিগকে লোকে

প্রথমে গালি দিতে থাকে, পরে তাঁহাদিগকে নূতন ধর্ম্মের সংস্থাপক বলিয়া প্রচার করে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ স্থলে তাঁহারা যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান তাহার অনেক বিরোধী মত ও অনুষ্ঠানই তাঁহাদের নামসংযুক্ত ধর্ম্মের অঙ্গরূপে বিরাজ করিতে থাকে।

ডাক্তার আল্‌ফ্রেড মোমারি তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে ইহারই উল্লেখ করিয়া ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত কথার আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বড় বড় সংস্কারকেরা সকলেই একবাক্যে লোকসকলকে সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইসায়া বলিয়াছেন,—দেবতা ছাগরক্তে পরিতুষ্ট হয়েন না, উপহারের আড়ম্বরে এবং ধূপধুনার গন্ধে তাঁহার চিত্তবিনোদন হয় না, এ সকলি মিথ্যা পণ্ডশ্রম; অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হও, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, দরিদ্রের অভাব মোচন কর, পিতৃহীনকে আশ্রয় দাও, বিধবাকে সাহায্য কর। জোরোস্তার ইন্দ্রজালের নিষ্ফলতা দেখাইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানকেই মানবের একমাত্র আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ,—পৃথিবীতে ভাল মন্দ দুই আছে, তোমরা মন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভালকে গ্রহণ কর; সদালাপ, সাধুচিন্তা এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানই স্বর্লোকে নেতা। কায়মনোবাক্যে পরের অনিষ্টাচরণে বিরত থাকাই কন্‌ফ্যুশসের প্রধান শিক্ষা। বুদ্ধ বলিয়াছেন,—মস্তকমুণ্ডন, বস্ত্রত্যাগ, ধূলিশয্যা বা বেদাধ্যয়ন মানবকে শুদ্ধ করিতে পারে না, কারণ, ক্রোধ, হিংসা, মত্ততা, পরশ্রীকাতরতা এইসকলই মানবের অশুচি। যীশুখৃষ্টও এই কথাই বলিয়াছেন,—প্রভু প্রভু করিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়

না, সেই তাঁহাকে পায়, যে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করে; যাহারা মুখে দীর্ঘ বক্তৃতা করে এবং কাজের বেলায় অনাথা বিধবার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কুণ্ঠিত হয় না তাহাদের কল্যাণ নাই। আরবপ্রান্তে মহম্মদেরও সেই একই কথা,—ঈশ্বর রক্ত-মাংসের বলি গ্রহণ করেন না, তোমাদের অকপট ভক্তিই তাঁহার নিকট পঁহুছায়। যাহারা ভক্তির ভাণ করে এবং দরিদ্রকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না, তাহাদের সে ভক্তি ব্যর্থ। পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িলেই পুণ্য হয় না, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা সংসাধনের চেষ্টাই যথার্থ পুণ্যকার্য্য।

ধর্ম্মসংস্থাপকেরা যুগে যুগে এই একই কথা বলিয়াছেন যে, সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে আপনাকে বড় করিয়া তোলো, তোমাদের জন্য প্রশস্ত কল্যাণ রহিয়াছে। কিন্তু অনুচরবর্গ সহস্র অনাবশ্যক আড়ম্বর এবং অনর্থক অনুষ্ঠান দ্বারা মূল কথাকে ক্রমে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—দাঁড়াইয়াছে এই যে, বুদ্ধ যাহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, খৃষ্ট যাহা বলেন নাই তাহাই খৃষ্টধর্ম্মের মূল বিশ্বাস, মহম্মদ এবং মুসলমানধর্ম্ম পরস্পরবিরোধী। যদি কোনও গতিকে একবার এইসকল মহাপুরুষেরা মর্ত্ত্যে আসিয়া তাঁহাদের নামসংযুক্ত ধর্ম্মের অবস্থা দেখেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন।

উত্তর বৌদ্ধধর্ম্মে এখন পৌত্তলিকতার সমস্ত আড়ম্বরই নিঃশব্দে স্থানলাভ করিয়াছে—স্বর্গীয় দূত, পবিত্র বারি, জপমালা এবং বিচিত্র দুর্ব্বোধ্য অনুষ্ঠান বুদ্ধকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার মৃৎপ্রতিমার পদতলে প্রতিদিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। দক্ষিণ বৌদ্ধধর্ম্ম বাহ্যতঃ তাদৃশ বিকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না—কিন্তু বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত তাহার যথার্থ ঐক্য অল্পই।

যাজকমণ্ডলী প্রাচীন পালিভাষায় শ্লোক আওড়াইয়া যায়—নত-জানু শ্রোতৃমণ্ডলী কেবলি হাঁ করিয়া শুনে এবং না বুঝিয়া শ্রুতি-যোগে যথাসাধ্য পুণ্য অর্জ্জন করে।

খৃষ্টধর্ম্মেরও এই দশা। ডাক্তার মোমারি দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বকালের পৌত্তলিকতা এবং খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তী সময়ের যত অদ্ভুত অধ্যাত্মবিদ্যা মিলিয়া বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে। যীশু-খৃষ্টকে, নামটুকু বাদে, খৃষ্টানেরা যথাসাধ্য সারিয়া ফেলিয়াছেন। তর্ক উঠে যে, পবিত্রাত্মা (ইংরাজী Holy Ghost-এর এই অনু-বাদই বোধ করি প্রচলিত) ঈশ্বর এবং তাঁহার পুত্র উভয় হইতে বাহির হইয়াছেন, অথবা কেবলমাত্র পিতা-ঈশ্বর হইতে। লুথর বলিয়াছেন, পাপীর প্রতি ঈশ্বরের এতই ক্রোধ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার নিজ পুত্রের শোণিত ভিন্ন অপর কিছু দ্বারা সে দুর্জ্জয় ক্রোধশান্তি অসম্ভব হইত। এমনও শুনা যায় যে, ঈশ্বর তাঁহার বাছাই-করা লোকগুলিকেই উদ্ধার করিবেন, আর সকলের অদৃষ্টে যাহা হয় ঘটিবে। খৃষ্টান-ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। সামান্য অপরাধে যিনি অনন্ত নরকদণ্ড বিধান করেন, এক দম্পতির অবাধ্যতার জন্য সমুদায় উত্তরবংশীয়দিগকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন, একজন নিরীহের প্রাণ না লইয়া পাপীর প্রতি যাঁহার করুণা উদ্রেক হয় না, সে খামখেয়ালী প্রবলপ্রতাপ বিধাতার কথা কেমন করিয়া বলিব? যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের নামে প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন; খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে বিভীষিকা।

মুসলমান-ধর্ম্মও মহম্মদকে লঙ্ঘন করিয়াছে। অন্য প্রবন্ধে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। ডাক্তার মোমারি তাঁহার প্রবন্ধে সায়েদ আমীর আলি সাহেবের "মহম্মদের জীবনচরিত" নামক

গ্রন্থ হইতে ইহার অনুকূলে দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মোমারি সাহেব কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। কারণ, বোধ হয়, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদের ন্যায় কোনও বিশেষ ধর্ম্ম-সংস্থাপকের নামের সহিত হিন্দুধর্ম্ম গ্রথিত হয় নাই, এবং, ইহা ভিন্ন, হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মত ও বিশ্বাসে আবদ্ধ নহে। নানা শাস্ত্র, নানা মত, নানা কথা, নানা বিধান—সুতরাং ধরিবার ছুঁইবার মত কিছু পাওয়া কঠিন। কোথাও তেত্রিশকোটী দেবতার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, কোথাও সেই তেত্রিশকোটী দেবতা মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে; হিন্দুধর্ম্ম ত ঠিক এক ধর্ম্ম নহে—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাই পুঁথিরক্ষিত হইয়া সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্ম নামের মধ্যে কোনপ্রকারে স্থানলাভ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এদেশেও ঋষিবাক্য প্রত্যহ লঙ্ঘিত হইয়াছে, এবং ঋষিবাক্য-লঙ্ঘনই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। আরও, ইদানীং আমাদের মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম-সংস্থাপকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের অবস্থা দেখিলেই মোমারি সাহেবের অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। চৈতন্যের ধর্ম্ম এবং পরবর্ত্তী বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্ম, নানকের ধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান শিখদিগের ধর্ম্ম, এইসকল তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

এইরূপে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে চিরদিন দুই প্রকারের ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। গুরুপুরোহিত ও জনসাধারণের ধর্ম্ম এক, এবং ধর্ম্মসংস্থাপক ও অল্পসংখ্যক লোকের ধর্ম্ম এক। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সুবিধাই আদর্শ, শেষোক্ত শ্রেণীর আদর্শ ন্যায়;

এক পক্ষ নীতিকে পশ্চাতে রাখিয়া দেন, অন্য পক্ষ নীতিকেই সর্ব্বোচ্চস্থান দিয়া থাকেন; এক পক্ষের ধর্ম্ম কতকটা অসভ্য অবস্থার এবং অভিব্যক্তির নিম্নশ্রেণীর, অপর পক্ষের ধর্ম্ম অভিব্যক্তির চরম ফল। ডাক্তার মোমারি সেইজন্য গুরুপুরোহিত ও জনসাধারণের ধর্ম্মকে অতীত কালের ধর্ম্মের মধ্যে ফেলিয়াছেন। এবং মহাজনদিগের ধর্ম্মকেই ভবিষ্যতের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভবিষ্যতের ধর্ম্মই এখন প্রতিদিন ধীরে ধীরে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, ভবিষ্যতের ধর্ম্মে দেবতা স্থান পাইবেন কি না? দেবদেবী ত প্রতিদিন লোপ পাইতেছে—ঈশ্বর কি থাকিবেন? কনফ্যুশস্, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ এই চারিজন ধর্ম্ম-সংস্কারকের মধ্যে শেষোক্ত দুই জনই ব্রহ্মবাদী। এবং শুনা যায়, নাস্তিক্য-ধর্ম্ম কেবলমাত্র নীতি বৈ আর কিছুই নহে। মোমারি সাহেব বলেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বরবিহীন নীতি নীতিবিহীন ঈশ্বর অপেক্ষা শতগুণে ভাল। কিন্তু আচরণ-প্রধান ধর্ম্মকে শুদ্ধমাত্র নৈতিক ধর্ম্মহিসাবে দেখা সঙ্গত নয়। ধর্ম্মও যে সর্ব্বত্র সুব্যক্তরূপে ঈশ্বরবাদী তাহা বলা যায় না। এবং ধর্ম্ম এবং নীতি দুই বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করাও ভ্রম। নীতি বাদ দিয়া ধর্ম্ম, কিম্বা একেবারে ধর্ম্মশূন্য নীতি অসম্ভব। নীতির মধ্যেও, অন্ততঃ গূঢ়ভাবে, ঈশ্বরনিষ্ঠাই প্রকাশ পায়। ঈশ্বর আমাদিগকে সদনুষ্ঠানরত দেখিতে চাহেন—এবং সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন। সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সেও ঈশ্বরবাদীরই মত, তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে, তাঁহার অবারিত প্রীতিলাভে সমর্থ। নীতি ধর্ম্মের পত্তনভূমি—

ধর্ম্মের সূচনা; কেবল, ধর্ম্ম এখনও আপনাকে আপনি বুঝিবার মত স্পষ্টভাব ধারণ করে নাই। যে নীতিপরায়ণ ব্যক্তি চিরদিন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছেন, তত্ত্ববিদ্যায় একটা ভুল করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহাকে ধর্ম্মপরাঙ্মুখ বলা যায়!

কিন্তু নাস্তিকতা যে ভ্রম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ডাক্তার মোমারি প্রকৃতির একরূপতা, চিন্তাবময়তা এবং উন্নতিশীলতা আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথমে প্রকৃতির একরূপতা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে ইহাই প্রথম প্রমাণ। কিন্তু ইহাই অবশ্য যথেষ্ট নহে; তবে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রকৃতিতে অনিয়ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিবার কারণ হইত। প্রকৃতির একরূপতা আবিষ্কারের পূর্ব্বে একেশ্বরবাদ টিঁকিতে পারিত না। একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে বহু পরিবর্ত্তনশীল ইচ্ছার উপর হইতে বিশ্বাস হরণ করা চাই। যিনি সমস্ত প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যাঁহার ইচ্ছার বিচিত্র নিত্য বিকাশ, সেই অনন্তস্বরূপে বিশ্বাসস্থাপন করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি-বহির্ভূত সসীম দেবতার প্রতি বিশ্বাস ভাঙ্গা চাই।

দ্বিতীয়, প্রকৃতির চিন্তাবময়তা। বেকন বলেন, বিজ্ঞান প্রকৃতির ব্যাখ্যান। কিন্তু যেখানে জ্ঞানের সম্পর্ক নাই সেখানে ব্যাখ্যা অসম্ভব; উন্মাদের কার্য্যের মধ্যে কে কবে সঙ্গতি বাহির করিতে পারিয়াছে? জ্ঞানসম্পর্কশূন্য পরমাণুসমষ্টির মধ্যে নিয়মও থাকিত না, বৈজ্ঞানিক আলোচনারও সুবিধা হইত না। এবং তাহা জ্ঞান উদ্রেক করিতেও পারিত না। এখন আমরা যে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের কার্য্যপ্রণালী তন্ন তন্ন বলিয়া দিতে

পারি সে এই জ্ঞানেরই সম্পর্কে। বিজ্ঞানের প্রতি নূতন আবিষ্কার প্রকৃতির অবিচলিত শৃঙ্খলা এবং সুনিয়ম—এক কথায়, জড়ের অন্তরে নিহিত জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। এবং এই জ্ঞান চিৎ ব্যতীত সম্পূর্ণ জড় হইতে অভিব্যক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়, প্রকৃতির উন্নতিশীলতা। অন্য কথায়, অভিব্যক্তি। চতুর্দ্দিকের দুঃখকষ্ট দেখিয়া যখন ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে অবিশ্বাস জন্মে, তখন অভিব্যক্তিবাদ বুঝাইয়া দেয় যে, ইহারই মধ্য হইতে প্রতিদিন উন্নতির পর উন্নতি সূচিত হইতেছে। আরও বলে যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান কিন্তু খামখেয়ালী নহেন। অসঙ্গত যথেচ্ছাচরণ তাঁহার স্বভাব নহে। কিন্তু ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলায় তিনি এই বিপুল সৃষ্টিকে প্রতিদিন অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতেছেন।

এইরূপে মোমারি সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতের ধর্ম্ম ঈশ্বরবাদী না হইয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মানবাত্মার অমরতা ভবিষ্যতের ধর্ম্মে টিঁকিবে কি না? মোমারি সাহেব বলিয়াছেন, টিঁকিবে। প্রথম কারণ, ইহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই, বরঞ্চ অনুকূলে কিছু কিছু অনুমানসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে। প্রকৃতির সর্ব্বত্র আমরা যে শৃঙ্খলা এবং ক্রমোন্নতি দেখিতে পাই, তাহা এই ভাবেরই অনুকূল। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের অন্তরে চিরদিন সুখের জন্য তৃষ্ণা রহিয়াছে, অথচ সুখ আমাদের ভাগ্যে মিলে না; আমাদের অন্তরে পূর্ণতালাভের আকাঙ্ক্ষা অহরহ পোষিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আমরা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হীন; আমাদের অন্তরে ন্যায়ের যে উজ্জ্বলভাব মুদ্রিত হইয়া আছে, প্রতিবেশীদের সম্পদ্বিপদে

তাহা প্রতিদিন লঙ্ঘিত হইতেছে ;—অমরতাই এই সকল বিরোধের একমাত্র মীমাংসা। তৃতীয়তঃ, সাধুতাকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভালবাসে, সে লাভের প্রত্যাশা রাখে না, সাধুতার জন্যই সে সাধুতার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু সৎ যদি নিতান্ত নশ্বর হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহার আর আকর্ষণ থাকে না। অতএব, অমরতা ভবিষ্যতের ধর্ম্মে উপেক্ষিত না হইবারই সম্ভাবনা।

মোমারি সাহেবের শেষ প্রশ্ন, খৃষ্টধর্ম্ম এবং চার্চ থাকিবে কি না? উত্তর—এখন যাহা আছে, ইহা থাকিবে না। তিনি বলেন, যীশুখৃষ্টে ফিরিয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। আমরা এখানে তাহার বিস্তারিত উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। আমাদের পাঠকসাধারণের এ বিষয়ে বোধ করি বিশেষ আগ্রহ নাই।

কিন্তু মোমারি সাহেবের কথাটা পাল্টাইয়া আমরা স্বদেশের প্রতি প্রয়োগ করিতে পারি। তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, আমাদের দেশেরও প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিক এই কথাগুলি খাটে। গুরুপুরোহিতদিগের বিধি-বিধান ত এখনই লঙ্ঘিত হইতেছে। যে সকল আচার অনুষ্ঠান অসুবিধাজনক তাহা কেহ মানে না। সমাজের সর্ব্বত্র কেবল একটা ভীষণ অবিশ্বাসের আধিপত্য। প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা ও কাপট্যাবলম্বন করিতে চারিদিক হইতে পরামর্শ বর্ষিত হয়। এই মিথ্যাচরণই বাহ্যতঃ এখন সমাজকে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহাই তাহার ক্ষয়ের কারণ। প্রতিদিন অল্পে অল্পে তাহার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্ব বলসঞ্চয় করিতেছে—একদিন সহসা এ মিথ্যাজাল ছিন্ন করিয়া সে আপন প্রবল বিক্রম প্রকাশ করিবে। সে দিন খুব বেশী দূর নহে।

স্বরলিপি।

বাহার—কাওয়ালি।

সব সখি মিলে গাওরে :
গাওরে, সবে, এই বিলাস-অলস সরস বসন্তে।
অদূরে বাঁশী মধুর বাজে,
ধরে তান বিহঙ্গ সবে
কত ললিত বিচিত্র স্বরে।
দেখ, পিককুল আকুল কুঞ্জে কুঞ্জে,
কুহু কুহু মুহু মুহু কুহরে,
পাপিয়া ঝঙ্কারে।
ধীরে ধীরে সমীর বিহরে,
সব বন আকুল চূত-মুকুল-বাসে ;
তরুবর-পল্লব মর্ম্মরে হরষে,
জল-থল করে শশী সরসে,
মলয়ের সুখকর পরশে,
মনখুলে সবে গাওরে।

৩+৩

১০।১।২´।৩।

০ ১ ॥ ২´
॥ ধঞ্ঝা পা মা মা । ধা -পমপা মজ্ঞা -মা । ঞধা -ঞধা -ঞা -া ।
॥ স ব স খি । মি — লে — । গা — — ও ।

৩
। র্সা -া -া -া । র্সা -া -া -া । ঞধা -ঞধা ঞা র্সা ।
। রে — — — । গা — — ও । রে — স বে ।

। ঞা ধা ধা ঞধা। -ঞা পপা মা পা। মা (ম)জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা।
। এ ই, বি লা। — স, অ ল স। স র স, র।

। রা -া সা -া। (স)-মা -া মা -া। পা পা পা পা।
। স — ন্তে —। অদূ — রে —। বাঁ শ রী, ম।

। পা -র্সা -া র্সা। ঞর্সা -া ঞা -ধা। ঞা -া ঞা -া।
। ধু — — র। বা — জে —। ধ — রে —।

। ঞা -া -র্সা র্সা। র্সা (জ্ঞ)র্রা -া র্সা। র্সা র্সা ঞধা ঞা।
। তা — — ন। বি হ — ঙ্গ। স বে ক ত।

। র্সা র্সা (ম)র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্মর্জ্ঞর্মা র্রা র্সা র্সা। ধঞা পা মা মা।
। ল লি ত, বি। চি ত্র স্ব রে। স র স থি।

। ধা -পমপা মজ্ঞা -মা। ঞধা -ঞধা -ঞা -া। র্সা -া ধা ধা।
। মি — লে —। গা — — ও। রে — দে খ।

। মা ধা ধা ঞা। ঞা -র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সা -া।
। পি ক কু ল। আ — কু ল। কু — ঞ্জে —।

। র্সা -ঞা র্সা -া। ঞা ঞা র্রা র্সা। র্সা র্সা র্রা র্রা।
। কু — ঞ্জে —। কু হু কু হু। মু হু মু হু।

। ঞা ঞা র্সা -া। -ধা -া ধা ঞা। র্সা -র্রা -র্জ্ঞা -র্মা।
। কু হ রে —। — — পা পি। য়া — — —।

। -র্মা -র্জ্ঞা -র্রা -র্সা। -র্রা -র্সা -ঞা -ধা। পা র্সঞা র্সা -া॥
। — — — —। — — — —। ঝ ঙ্কা রে —॥

২
। সা -া মা -পা। মা -পা (ম)জ্ঞা -া। মা ধা -া পা।
। ধী — রে —। ধী — রে —। স মী — র।

। ধা ঞা র্সা -া। -া -া ধা ঞা। র্সা র্রা র্সা -ঞা।
। বি হ রে —। — — স ব। ব ন আ —।

। ধা ধা ঞা র্সা। ম্জ্ঞা -জ্ঞর্মা র্রা র্সা। ঞধা -ঞা পা -া।
। কু ল, চূ ত। মু — কু ল। বা — সে —।

। না সা সা সা। মা -া মা মা। পা -া পা পা।
। ত রু ব র। প — ল্ল ব। ম — র্ম্ম রে।

। পা পা পা -া। ঞা ঞা ঞা ঞা। ঞা ঞা র্সা র্সা।
। হ র ষে —। ত ল থ ল। ক রে শ শা।

। র্সা ঞা র্সা -া। ঞা র্রা র্সা র্সা। র্মা র্মা র্রা র্সা।
। স র সে —। ম ন য়ে র। সু খ ক র।

। ঞা ঞা র্সা -া। ধঞা পা মা মা। ধা -পমপা মজ্ঞা -মা।
। প র শে —। ম ন খু লে। স — বে —।

। ঞধা -ধঞা র্সা -া॥
। গা ও রে —॥

ব্যাখ্যা।

জ্ঞ = কোমল গা ; ঞ = কোমল নি।

লোক-চেনা।

আসঙ্গ-লিপ্সা।

আসঙ্গ-লিপ্সা অর্থাৎ সংসর্গ-বাসনা। বন্ধুতা, সমাজ-প্রিয়তা, মায়া-মমতা এই বৃত্তিরই প্রকারান্তর মাত্র। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বাৎসল্য-বৃত্তির স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাৎসল্য-বৃত্তির যে

স্থান তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিলে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের ঠিক্ মধ্যস্থলে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানটি বাস্তু-নিষ্ঠা অর্থাৎ গৃহানুরাগের স্থান। এই বাস্তু-নিষ্ঠার উভয় পার্শ্বে আসঙ্গ-লিপ্সা-বৃত্তি অবস্থিত।

ডাক্তার গল্‌কে কোন ব্যক্তি বলেন যে, তাঁহার পরিচিত একটি মহিলা আছেন, তিনি বন্ধুতার আদর্শ-স্থল—তাঁহার মাথার ছাঁচ তুলিলে ভাল হয়। ডাক্তার গল্ তখন জানিতেন না বন্ধুতা-বৃত্তির স্থান কোথায়। তিনি সেই মহিলার মস্তকের ছাঁচ তুলিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার মাথার পশ্চাদ্ভাগের দুই পার্শ্বে ঢিবির মত উঁচু হইয়া আছে। তাহা হইতেই তাঁহার প্রথম মনে হইল, উহাই বন্ধুতার স্থান। ক্রমে অনেক মস্তক পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ধারণা আরও দৃঢ় হইল। এইরূপে তিনি আসঙ্গ-লিপ্সার স্থান আবিষ্কার করিলেন।

যাহাদিগের এই বৃত্তি বলবতী, তাহাদের হৃদয় অত্যন্ত মমতা-ময়—ভালবাসার প্রতিদান পাইলে তাহারা অতীব সুখী হইয়া থাকে। তাহারা ভালবাসার বস্তুকে আগ্রহের সহিত আলি-ঙ্গন করে—বন্ধুদিগের হস্তপীড়ন করিবার সময় দৃঢ়ভাবে আগ্রহের সহিত হস্তপীড়ন করে। যে সকল বালকদিগের এই বৃত্তি প্রবল, তাহারা কুকুর, খর্গস, পাখী প্রভৃতি জীবজন্তু পুষিতে ভালবাসে। এই বৃত্তি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বেশী প্রবল; স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই মায়া-মমতার পরা-কাষ্ঠা দেখা যায়। এমন কি, রাজদণ্ডার্হ অধম অপরাধীদিগের মধ্যেও এই বৃত্তির জলন্ত প্রকাশ কখন কখন দেখা যায়। হত্যা-পরাধে মেরি ম্যাসিন্ নামক কোন স্ত্রীলোকের এডিনবরা নগরে ফাঁসি হয়। সে এক ব্যক্তিকে ভালবাসিত। সে ভাল-

যাহা তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। যে পুরুষ তাহাকে ভাল-বাসিত, সে তাহাকে একটা রুমাল পাঠাইয়া দেয়—রুমালের এক কোণে তার নিজের নাম লিখিয়া দিয়াছিল। এবং তাহার সহিত আধখানা কমলানেবু পাঠাইয়াছিল। আর তার এই অনুরোধ ছিল যে, ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ যে আধখানা কমলানেবু পাঠাইতেছে তাহা যেন সে ফাঁসিকাষ্ঠের মঞ্চে উঠিবার সময় আহার করে—বাকী অর্দ্ধ ঠিক্ সেই সময়ে সেও আহার করিবে। যে দিন তাহার ফাঁসি হইবে তাহার পূর্ব্ব দিনের সমস্ত রাত্রি সেই রুমালের কোণাটি সে মুখে করিয়া ছিল—এমন কি সেই ফাঁসিকাষ্ঠের মঞ্চে উঠিয়াও তাহা ছাড়ে নাই। ঠিক্ ফাঁসি হইবার সময়ে কারারক্ষক তাহাকে সেই আধখানা কমলানেবু দিল—এবং সে কমলানেবুটি লইয়া নির্ভীকভাবে এই কথা বলিল, "তাকে বোলো, আমাকে বাঁচাইবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে জেনে আমি সুখে মরিতেছি এবং তাহার কথামত আমি কমলানেবুটি খাইতেছি। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। তাকে বোলো, আমার এই মৃত্যুকালের শেষ অনুরোধ, সে যেন মদ্যপান ও কুসংসর্গ ত্যাগ করে, আর অধিক রাত্রি করিয়া বাড়ি না আসে।" এই স্ত্রীলোকের মাথার ছাঁচ তোলা হইয়াছিল। আসঙ্গ-লিপ্সার বৃত্তি-স্থান উহাতে খুব বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে এই বৃত্তি বিভিন্ন আকারে দৃষ্ট হয়। কেহ বা লোকসমাজে মেশামিশি করিতে ভালবাসে—কিন্তু বন্ধুত্ব করিতে পারে না। কাহারও আলাপী অনেক কিন্তু একটিও বন্ধু নাই। কেহ বা বেশী লোকের সহিত আলাপ করিতে পারে না—কিন্তু দুই চারি জনের সহিত তাহার অকাট্য বন্ধুত্ব। চরিত্র দুই জনের হয় তো সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ

তাহারা সখ্যবন্ধনে চিরজীবন আবদ্ধ। আসঙ্গলিপ্সা তাহা-দের দুই জনের মধ্যে প্রবল, তাহাই তাহাদের একমাত্র বন্ধন। ইতর জীবজন্তুদিগের মধ্যেও এই বৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়— কুকুরের প্রভুসংসর্গ-লালসা তো সর্ব্বজনবিদিত। ঘোড়া গরু প্রভৃতি পশুরা সঙ্গীছাড়া হইলে একেবারে মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। কুকুরেরা যখন প্রভুর প্রতি ভালবাসা জানাইতে চাহে, তখন্ তাহারা তাহাদের প্রভুর পায়ে মাথার সেই অংশটি ঘসে যেখানে আসঙ্গলিপ্সা-বৃত্তি অবস্থিত।

যাহার আসঙ্গ-লিপ্সার সহিত আত্মাভিমান প্রবল, বন্ধুদিগের সহিত তাহার মধ্যে মধ্যে চটাচটি হইয়া যায়। যাহার আসঙ্গ-লিপ্সার সহিত অর্জ্জনস্পৃহা প্রবল, সে বন্ধুদিগের জন্য আর সব ত্যাগস্বীকার করিতে পারে কিন্তু অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়। যাহার আসঙ্গলিপ্সার সহিত যশোলিপ্সা ও উপচিকীর্ষা প্রবল, সে বন্ধুদিগের মধ্যে মুক্তহস্ত ও বন্ধুত্ব বিষয়ে রেশারিশি করিয়া থাকে—এবং বন্ধুদের ভৎসনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। যাহার যশোলিপ্সা ও আত্মাভিমান অত্যন্ত বেশী ও কার্য্য-কারণানুভব-বৃত্তি কিছু কম, সে বন্ধুদের মধ্যে নেতৃত্বলাভের ইচ্ছা করে। যাহার প্রতিবিধিৎসা, জিঘাংসা ও আত্মাভিমান কিছু কম এবং যশোলিপ্সা, দয়া, ন্যায়পরতা, ভাবুকতা ও হাস্য-প্রিয়তা বেশী তাহার অনেক বন্ধু, অল্প শত্রু। যাহার স্মরণ-শক্তি বেশী, সে পুরাতন বন্ধুত্বের সামান্য সামন্য ঘটনাসকল স্মরণ করিয়া আনন্দলাভ করে ও যাহার বুদ্ধি-বিবেচনাশক্তি বেশী, সে বন্ধু-দিগকে সৎ পরামর্শ দেয়—তাহাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভাল উপায় সকল বলিয়া দেয় এবং তাহাদের চরিত্র ঠিক্ বুঝিতে পারে। এবং যাহাদের সাবধানতা-বৃত্তি প্রবল, তাহারা সতর্কতার

সহিত বন্ধু নির্ব্বাচন করে। যাহার আসঙ্গ-লিপ্সা বেশী এবং সেই সঙ্গে জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাভিমান, দৃঢ়তা ও দয়া অত্যন্ত বেশী এবং যশোলিপ্সা গোপনেচ্ছা ও ন্যায়পরতা কম, সে যেমন উৎসাহী বন্ধু তেমনি ভীষণ শত্রু হইতে পারে। বন্ধু হইলে তাহার মত আর বন্ধু নাই, শত্রু হইলে তাহার মত আর শত্রু নাই। আসঙ্গ-লিপ্সার সহিত যাহাদের বাৎসল্য ও পৈত্রপুরুষিক আসক্তি অত্যন্ত প্রবল তাহারা নিজ পরিবার ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহারা অত্যন্ত গৃহ-নিষ্ঠ।

পঞ্চভূতের ডায়ারি।

দৃশ্য। পদ্মাতীরস্থ পল্লিগ্রাম। বারান্দার সম্মুখে নদীতটে একখণ্ড ধান্যক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। ঘনরোপিত শিশু ধান্যবৃক্ষগুলি যেন গাঢ় সবুজবর্ণের অগ্নিশিখার মত কাঁপিতেছে। এই নিবিড় সবুজ রঙটি যেন নিরতিশয় নিদ্রার মত দৃষ্টিকে আপনার অন্তস্তলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে চায়, দু'টি চক্ষু তাহার সুগভীর কোমলতার মধ্যে বারম্বার অবগাহন করিয়া কিছুতেই আর তৃপ্তির শেষ পায় না। এই শ্যামলতা রমণীর যৌবন-সৌন্দর্য্যের মত অতলস্পর্শ। নির্ম্মল নীলাকাশের অবারিত জ্যোতি এই সরস সম্পূর্ণ সতেজ লাবণ্যরাশির উপরে অনিমেষ প্রেম-দৃষ্টিপাতের মত পড়িয়া রহিয়াছে, এবং সৌভাগ্যমতী পৃথিবীর আনন্দপুলক অবিশ্রাম কম্পিত হইয়া উঠিতেছে।

শরৎকাল। রৌদ্র দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি কি এক নূতন উত্তাপের দ্বারা সোণাকে গলাইয়া বাষ্প করিয়া এত সূক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন যে, সোণা আর নাই, কেবল তাহার স্বর্ণময়

লাবণ্যে দশদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বায়ুহিল্লোলের মধ্যে একটি চিরপরিচিত স্পর্শ প্রবাহিত হইতে থাকে। কাজকর্ম্ম ভুলিয়া যাইতে হয়; বেলা চলিয়া যাইতেছে, না, মন্ত্রমুগ্ধ আলস্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে বুঝা যায় না।

আমি বলিতেছিলাম—শরতের প্রভাতে যেন বহুকালের স্মৃতি একত্রে মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া রক্ত-আকারে হৃদয়ের শিরার মধ্যে সঞ্চরণ করে। কবিতায় অনেক সময়ে এই স্মৃতি-জাগরণের কথা লেখা হয়, সে কথা সকল সময়ে ঠিকটি বোঝা যায় না, মনে হয় ও একটা কবিতার অলঙ্কারমাত্র। হৃদয়ের ঠিক ভাবটি ভাষায় প্রকাশ করা এমনি কঠিন কাজ! বাঁশির শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু কিসের স্মৃতি তাহার কোন ঠিকানা নাই। যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই তাহাকে এতদেশ থাকিতে স্মৃতিই বা কেন বলিব, বিস্মৃতিই বা না বলিব কেন, তাহার কোন কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু "বিস্মৃতি জাগিয়া ওঠে" এমন একটা কথা ব্যবহার করিলে শুনিতে বড় অসঙ্গত বোধ হয়। অথচ কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে। অতীত জীবনের যে সকল শতসহস্র স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদের প্রত্যেককে পৃথক করিয়া চিনিবার যো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতন মহাদেশের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যাহারা বিস্মৃতি-মহাসাগররূপে নিস্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা কোন কোন সময়ে চন্দ্রোদয়ে অথবা দক্ষিণের বায়ুবেগে একসঙ্গে চঞ্চল ও তরঙ্গিত হইয়া উঠে, তখন আমাদের চেতন হৃদয় সেই বিস্মৃতি-তরঙ্গের আঘাত অভিঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যপূর্ণ অগাধ অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহাবিস্মৃত

অতিবিস্তৃত বিপুলতার একতান ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

শরতের ঐ দিগন্তসংলগ্ন শুভ্র মেঘখণ্ড যেমন, হৃদয়ের এই অনির্দ্দিষ্ট ভাবটিও সেইরূপ। যে জলকণা সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে রুদ্রনৃত্যে যোগ দিত এবং যে শিশিরবিন্দুটি যূথীকলিকার মুখাগ্রভাগে দোদুল্যমান ছিল, তাহারা বাষ্প হইয়া ঐ মেঘের মধ্যে এক হইয়া আছে; পৃথিবীর দিকে চাহিয়া মৃদু বায়ুভরে অনন্ত আকাশময় স্বপ্নের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে; সহসা এক সময়ে আপনাকে ধারণ করিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া এক পস্‌লা অশ্রুধারার মত ঝরিয়া পড়িবে।——

—শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমার এই আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাসে হাস্য-সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন—ভ্রাতঃ, করিতেছ কি! এইবেলা সময় থাকিতে ক্ষান্ত হও। কবিতা ছন্দে শুনিতেই ভাল লাগে—তাহাও সকল সময়ে নহে। কিন্তু সরল গদ্যের মধ্যে যদি তোমরা পাঁচজনে পড়িয়া কবিতা মিশাইতে থাক, তবে, তাহা প্রতিদিনের ব্যবহারের পক্ষে অযোগ্য হইয়া উঠে। বরং দুধে জল মিশাইলে চলে, গোপবংশে এমন সাধুপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করে নাই যে উক্তকার্য্যে লিপ্ত নহে, কিন্তু জলে দুধ মিশা-ইলে তাহাতে প্রাত্যহিক স্নান পান চলে না। কবিতার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে গদ্য মিশ্রিত করিলে আমাদের মত গদ্যজীবী লোকের পরিপাকের পক্ষে সহজ হয়—কিন্তু গদ্যের মধ্যে কবিত্ব একেবারে অচল।—

—বাস্! মনের কথা আর নহে। আমার শরৎ-প্রভাতের নবীন ভাবাঙ্কুরটি প্রিয় বন্ধু ক্ষিতি তাঁহার তীক্ষ্ণ নিড়ানীর একটি খোঁচায় একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিলেন। একটা তর্কের

কথায় সহসা বিরুদ্ধ মত শুনিলে মানুষ তেমন অসহায় হইয়া পড়ে না, কিন্তু ভাবের কথায় কেহ মাঝখানে ব্যাঘাত করিলে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, ভাবের কথায় শ্রোতার সহানুভূতির প্রতিই একমাত্র নির্ভর। শ্রোতা যদি বলিয়া উঠে, কি পাগ্‌লামি করিতেছ, তবে কোন যুক্তিশাস্ত্রে তাহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এইজন্য ভাবের কথা পাড়িতে হইলে প্রাচীন গুণীরা শ্রোতাদের হাতেপায়ে ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিতেন। বলিতেন, সুধীগণ মরালের মত নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করেন। নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিয়া সভাস্থ লোকের গুণগ্রাহিতার প্রতি একান্ত নির্ভর প্রকাশ করিতেন। কখনো বা ভবভূতির ন্যায় সুমহৎ দম্ভের দ্বারা আরম্ভ হইতেই সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এবং এত করিয়াও ঘরে ফিরিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন, যে দেশে কাচ এবং মাণিকের এক দর, সে দেশকে নমস্কার। দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন "হে চতুর্ম্মুখ, পাপের ফল আর যেমনই দাও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু অরসিকের কাছে রসের কথা বলা এ কপালে লিখিয়ো না, লিখিয়ো না, লিখিয়ো না!" বাস্তবিক, এমন শাস্তি আর নাই। জগতে অরসিক না থাকুক, এত বড় প্রার্থনা দেবতার কাছে করা যায় না, কারণ, তাহা হইলে জগতের জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। অরসিকের দ্বারাই পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাঁহারা জনসমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাঁহারা না থাকিলে সভা বন্ধ, কমিটি অচল, সংবাদপত্র নীরব, সমালোচনার কোঠা একেবারে শূন্য; এজন্য, তাঁহাদের প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে। কিন্তু

ঘানিযন্ত্রে শর্ষপ ফেলিলে অজস্রধারে তৈল বাহির হয় বলিয়া তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়া কেহ মধুর প্রত্যাশা করিতে পারে না—অতএব হে চতুর্ম্মুখ, ঘানিকে চিরদিন সংসারে রক্ষা করিও, কিন্তু তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়ো না এবং গুণীজনের হৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়ো না।

শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর কোমল হৃদয় সর্ব্বদাই আর্ত্তের পক্ষে। তিনি আমার দুরবস্থায় কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া কহিলেন "কেন, গদ্যে পদ্যে এতই কি বিচ্ছেদ!"

আমি কহিলাম—পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন। উভয়ের ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। অবলা বাহিরে বিচরণ করিলে তাহার বিপদ ঘটিবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু যদি কোন রূঢ়-স্বভাব ব্যক্তি তাহাকে অপমান করে, তবে ক্রন্দন ছাড়া তাহার আর কোন অস্ত্র নাই। এইজন্য, অন্তঃপুর তাহার পক্ষে নিরাপদ দুর্গ। পদ্য কবিতার সেই অন্তঃপুর। ছন্দের প্রাচীরের মধ্যে সহসা কেহ তাহাকে আক্রমণ করে না। প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সে আপনার জন্য একটি দুরূহ অথচ সুন্দর সীমা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আমার হৃদয়ের ভাবটিকে যদি সেই সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম, তবে ক্ষিতি কেন, কোন ক্ষিতিপতির সাধ্য ছিল না তাহাকে সহসা আসিয়া পরিহাস করিয়া যায়!

ব্যোম গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে নামাইয়া নিমীলিতনেত্রে কহিলেন—আমি ঐক্যবাদী। একা গদ্যের দ্বারাই আমাদের সকল আবশ্যক সুসম্পন্ন হইতে পারিত, মাঝে হইতে পদ্য আসিয়া মানুষের মনোরাজ্যে একটা অনাবশ্যক বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে; কবি নামক একটা স্বতন্ত্রজাতির সৃষ্টি করি-

য়াছে। সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে যখন সাধারণের সম্পত্তি অর্পিত হয়, তখন তাহার স্বার্থ হয় যাহাতে সেটা অন্যের অনায়ত্ত হইয়া উঠে। কবিরাও ভাবের চতুর্দ্দিকে কঠিন বাধা নির্ম্মাণ করিয়া কবিত্ব নামক একটা কৃত্রিম পদার্থ গড়িয়া তুলিয়াছে। কৌশল-বিমুগ্ধ জনসাধারণ বিস্ময় রাখিবার স্থান পায় না। এমনি তাহাদের অভ্যাস বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, ছন্দ ও মিল আসিয়া ক্রমাগত হাতুড়ি না পিটাইলে তাহাদের হৃদয়ের চৈতন্য হয় না, স্বাভাবিক সরল ভাষা ত্যাগ করিয়া ভাবকে পাঁচরঙা ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হয়। ভাবের পক্ষে এমন হীনতা আর কিছুই হইতে পারে না। পদ্যটা না কি আধুনিক সৃষ্টি, সেই-জন্যে, সে হঠাৎ-নবাবের মত সর্ব্বদাই পেখম তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, আমি তাহাকে দু' চক্ষে দেখিতে পারি না। এই বলিয়া ব্যোম পুনর্ব্বার গুড়গুড়ি মুখে দিয়া টানিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী দীপ্তি ব্যোমের প্রতি অবজ্ঞাকটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন—বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, বলিয়া একটা তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম কেবল জন্তুদের মধ্যে নহে, মানুষের রচনার মধ্যেও খাটে। সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবেই ময়ূরীর কলাপের আবশ্যক হয় নাই, ময়ূরের পেখম ক্রমে প্রসারিত হইয়াছে। কবিতার পেখমও সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল, কবিদিগের ষড়যন্ত্র নহে। অসভ্য হইতে সভ্য এমন কোন দেশ আছে যেখানে কবিত্ব স্বভাবতই ছন্দের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে নাই!

শ্রীযুক্ত সমীরণ এতক্ষণ মৃদুহাস্যমুখে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে ছিলেন। দীপ্তি যখন আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন, তখন তাঁহার মাথায় একটা ভাবের উদয় হইল। তিনি

একটা সৃষ্টিছাড়া কথার অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, কৃত্রিমতাই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান গৌরব। মানুষ ছাড়া আর কাহারো কৃত্রিম হইবার অধিকার নাই। গাছকে আপনার পল্লব প্রস্তুত করিতে হয় না, আকাশকে আপনার নীলিমা নির্ম্মাণ করিতে হয় না, ময়ূরের পুচ্ছ প্রকৃতি স্বহস্তে চিত্রিত করিয়া দেন। কেবল মানুষকেই বিধাতা আপনার সৃজন-কার্য্যের অ্যাপ্রেণ্টিস্ করিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রতি ছোটখাটো সৃষ্টির ভার দিয়াছেন। সেই কার্য্যে যে যত দক্ষতা দেখাইয়াছে, সে তত আদর পাইয়াছে। পদ্য গদ্য অপেক্ষা অধিক কৃত্রিম বটে; তাহাতে মানুষের সৃষ্টি বেশী আছে; তাহাতে বেশী রঙ ফলাইতে হইয়াছে, বেশী যত্ন করিতে হইয়াছে। আমাদের মনের মধ্যে যে বিশ্বকর্ম্মা আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজনকক্ষে বসিয়া নানা গঠন, নানা বিন্যাস, নানা প্রয়াস, নানা প্রকাশ-চেষ্টায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন, পদ্যে তাঁহারই নিপুণ হস্তের কারুকার্য্য অধিক আছে। সেই তাহার প্রধান গৌরব। অকৃত্রিম ভাষা জলকল্লোলের, অকৃত্রিম ভাষা পল্লবমর্ম্মরের, কিন্তু মন যেখানে আছে সেখানে বহুযত্নরচিত কৃত্রিম ভাষা।

স্রোতস্বিনী অবহিত ছাত্রীর মত সমীরণের সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার সুন্দর নম্র মুখের উপর একটা যেন নূতন আলোক আসিয়া পড়িল। অন্যদিন নিজের একটা মত বলিতে যেরূপ ইতস্ততঃ করিতেন, আজ সেরূপ না করিয়া একেবারে আরম্ভ করিলেন, "সমীরণের কথায় আমার মনে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে—আমি ঠিক পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব কি না জানি না। সৃষ্টির যে অংশের সহিত আমাদের হৃদয়ের যোগ—অর্থাৎ, সৃষ্টির যে অংশ শুদ্ধমাত্র আমাদের মনে জ্ঞানসঞ্চার করে

না, হৃদয়ে ভাবসঞ্চার করে, যেমন ফুলের সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতের মহত্ত্ব; সেই অংশে কতই নৈপুণ্য খেলাইতে হইয়াছে, কতই রঙ ফলাইতে হইয়াছে, কত আয়োজন করিতে হইয়াছে; ফুলের প্রত্যেক পাপড়িটি কত যত্নে সুগোল সুডোল করিতে হইয়াছে, তাহাকে বৃন্তের উপর কেমন সুন্দর বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড় করাইতে হইয়াছে, পর্ব্বতের মাথায় চিরতুষার মুকুট পরাইয়া তাহাকে নীলাকাশের মধ্যে কেমন মহিমার সহিত আসীন করা হইয়াছে, পশ্চিম সমুদ্রতীরের সূর্য্যাস্তপটের উপর কত রঙের কত তুলি পড়িয়াছে। ভূতল হইতে নভস্তল পর্য্যন্ত কত সাজসজ্জা, কত রঙচঙ, কত ভাবভঙ্গী, তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র মানুষের মন ভুলিয়াছে! ঈশ্বর তাঁহার রচনায় যেখানে প্রেম, সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাকেও গুণপনা করিতে হইয়াছে। সেখানে তাঁহাকেও ধ্বনি এবং ছন্দ, বর্ণ এবং গন্ধ বহুযত্নে বিন্যাস করিতে হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে যে ফুল ফুটাইয়াছেন, তাহাতে কত পাপড়ির অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন এবং আকাশপটে একটিমাত্র জ্যোতিঃপাত করিতে তাঁহাকে যে কেমন সুনির্দ্দিষ্ট সুসংযত ছন্দ রচনা করিতে হইয়াছে—বিজ্ঞান তাহার পদ ও অক্ষর গণনা করিতেছে। ভাবপ্রকাশ করিতে মানুষকেও নানা নৈপুণ্য অবলম্বন করিতে হয়। শব্দের মধ্যে সঙ্গীত আনিতে হয়, ছন্দ আনিতে হয়, সৌন্দর্য্য আনিতে হয়, তবে মনের কথা মনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে। ইহাকে যদি কৃত্রিমতা বলে, তবে সমস্ত বিশ্বরচনা কৃত্রিম!

এই বলিয়া স্রোতস্বিনী আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন সাহায্য প্রার্থনা করিল—তাহার চোখের ভাবটা এই, আমি কি কতকগুলা বকিয়া গেলাম তাহার ঠিক নাই, তুমি ঐটেকে আর

একটু পরিষ্কার করিয়া বল না। এমন সময় ব্যোম হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সমস্ত বিশ্বরচনা যে কৃত্রিম এমন মতও আছে। স্রোত-স্বিনী যেটাকে ভাবের প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, অর্থাৎ দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি, সেটা যে মায়ামাত্র, অর্থাৎ আমাদের মনের কৃত্রিম রচনা একথা অপ্রমাণ করা বড় কঠিন।

ক্ষিতি মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—তোমরা সকলে মিলিয়া ধান ভানিতে শিবের গান তুলিয়াছ। কথাটা ছিল এই, ভাবপ্রকাশের জন্য পদ্যের কোন আবশ্যক আছে কি না। তোমরা তাহা হইতে একেবারে সমুদ্র পার হইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব, লয়-তত্ত্ব, মায়াবাদ প্রভৃতি চোরাবালির মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হই-য়াছ। আমার বিশ্বাস ভাবপ্রকাশের জন্য ছন্দের সৃষ্টি হয় নাই। ছোট ছেলেরা যেমন ছড়া ভালবাসে, তাহার ভাব-মাধুর্য্যের জন্য নহে—কেবল তাহার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির জন্য, তেমনি অসভ্য অবস্থায় অর্থহীন কথার ঝঙ্কারমাত্রই কানে ভাল লাগিত। এইজন্য অর্থহীন ছড়াই মানুষের সর্ব্বপ্রথম কবিত্ব। মানুষের এবং জাতির বয়স ক্রমে যত বাড়িতে থাকে, ততই ছন্দের সঙ্গে অর্থ সংযোগ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অনেক সময়ে মানুষের মধ্যে দুই একটা গোপন ছায়াময় স্থানে বালক-অংশ থাকিয়া যায়; ধ্বনিপ্রিয়তা, ছন্দপ্রিয়তা সেই গুপ্ত বালকের স্বভাব। আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অংশ অর্থ চাহে, ভাব চাহে; আমাদের অপরিণত অংশ ধ্বনি চাহে, ছন্দ চাহে।

দীপ্তি গ্রীবা বক্র করিয়া কহিলেন—ভাগ্যে আমাদের সমস্ত অংশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ওঠে না! মানুষের নাবালক অংশটিকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই, তাহারই কল্যাণে জগতে যা' কিছু মিষ্টত্ব আছে।

সমীরণ কহিলেন—যে ব্যক্তি একেবারে পূরোপূরি পাকিয়া গিয়াছে—সেই জগতের জ্যাঠা ছেলে। কোন রকমের খেলা, কোন রকমের ছেলেমানুষী তাহার পছন্দসই নহে। আমাদের আধুনিক হিন্দুজাতটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জ্যাঠা জাত, অত্যন্ত বেশীমাত্রায় পাকামি করিয়া থাকে, অথচ নানান্ বিষয়ে কাঁচা। জ্যাঠা ছেলের এবং জ্যাঠা জাতির উন্নতি হওয়া বড় দুরূহ, কারণ, তাহার মনের মধ্যে নম্রতা নাই। আমার এ কথাটা প্রাইভেট্। কোথাও যেন প্রকাশ না হয়। আজকাল লোকের মেজাজ ভাল নয়।

আমি কহিলাম—যখন কলের যাঁতা চালাইয়া সহরের রাস্তা মেরামত হয়, তখন কাষ্ঠফলকে লেখা থাকে—কল চলিতেছে সাবধান! আমি ক্ষিতিকে পূর্ব্বে হইতে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমি কল চালাইব। বাষ্পযানকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করেন কিন্তু সেই কল্পনা-বাষ্পযোগে গতিবিধিই আমার সহজসাধ্য বোধ হয়। গদ্যপদ্যের প্রসঙ্গে আমি আর একবার শিবের গান গাহিব। ইচ্ছা হয় শোন।—

গতির মধ্যে খুব একটা পরিমাণ-করা নিয়ম আছে। পেণ্ডুলম নিয়মিত তালে দুলিয়া থাকে। চলিবার সময় মানুষের পা মাত্রা রক্ষা করিয়া উঠে পড়ে; এবং সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমান তাল ফেলিয়া গতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে থাকে। সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লয় আছে। এবং পৃথিবী এক মহাছন্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

ব্যোমচন্দ্র অকস্মাৎ আমাকে কথার মাঝখানে থামাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—স্থিতিই যথার্থ স্বাধীন, সে আপনার অটল গাম্ভীর্য্যে বিরাজ করে—কিন্তু গতিকে প্রতিপদে আপনাকে

নিয়মে বাঁধিয়া চলিতে হয়। অথচ সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্তসংস্কার আছে যে, গতিই স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপ, এবং স্থিতিই বন্ধন। তাহার কারণ, ইচ্ছাই মনের একমাত্র গতি এবং ইচ্ছা অনুসারে চলাকেই মূঢ় লোকে স্বাধীনতা বলে। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা জানিতেন, ইচ্ছাই আমাদের সকল গতির কারণ, সকল বন্ধনের মূল; এই জন্য মুক্তি, অর্থাৎ চরম-স্থিতি লাভ করিতে হইলে ঐ ইচ্ছাটাকে গোড়া-ঘেঁষিয়া কাটিয়া ফেলিতে তাঁহারা বিধান দেন, দেহমনের সর্ব্বপ্রকার গতিরোধ করাই যোগসাধন।

সমীরণ ব্যোমের পৃষ্ঠে হাত দিয়া সহাস্যে কহিলেন, একটা মানুষ যখন একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে, তখন মাঝখানে তাহার গতিরোধ করার নাম গোলযোগ সাধন।

আমি কহিলাম, বৈজ্ঞানিক ক্ষিতির নিকট অবিদিত নাই যে, গতির সহিত গতির, এক কম্পনের সহিত অন্য কম্পনের ভারী একটা কুটুম্বিতা আছে। সা সুরের তার বাজিয়া উঠিলে মা সুরের তার কাঁপিয়া উঠে। আলোক-তরঙ্গ, উত্তাপ-তরঙ্গ, ধ্বনি-তরঙ্গ, স্নায়ু-তরঙ্গ প্রভৃতি সকলপ্রকার তরঙ্গের মধ্যে এইরূপ একটা আত্মীয়তার বন্ধন আছে। আমাদের চেতনাও একটা তরঙ্গিত কম্পিত অবস্থা। এইজন্য বিশ্বসংসারের বিচিত্র কম্প-নের সহিত তাহার যোগ আছে। ধ্বনি আসিয়া তাহার স্নায়ু-দোলায় দোল দিয়া যায়, আলোক-রশ্মি আসিয়া তাহার স্নায়ু-তন্ত্রীতে অলৌকিক অঙ্গুলি আঘাত করে। তাহার চিরকম্পিত স্নায়ুজাল তাহাকে জগতের সমুদায় স্পন্দনের ছন্দে নানাসূত্রে বাঁধিয়া জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

হৃদয়ের বৃত্তি, ইংরাজিতে যাহাকে ইমোশন্ বলে, তাহা

আমাদের হৃদয়ের আবেগ, অর্থাৎ গতি ; তাহার সহিতও অন্যান্য বিশ্বকম্পনের একটা মহা ঐক্য আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের সহিত, ধ্বনির সহিত তাহার এ কটা স্পন্দনের যোগ, একটা সুরের মিল আছে।

এইজন্য সঙ্গীত এমন অব্যবহিতভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে—সে যে হৃদয়ের স্বদেশী ভাষা বলে। হৃদয় যেমন করিয়া কাঁপে, সেও যে ঠিক তেম্‌নি করিয়া কাঁপিতে থাকে ; তাহার ধ্বনির তরঙ্গ ঠিক যে হৃদয়ের সমান ছন্দে উত্থান-পতন করে। এইজন্য উভয়ের মধ্যে মিলন হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। ঝড়ে এবং সমুদ্রে যেমন মাতামাতি হয়, গানে এবং প্রাণে তেমনি একটি নিবিড় সংঘর্ষ হইতে থাকে।

এই কারণে সঙ্গীত আপনার কম্পন সঞ্চার করিয়া আমাদের সমস্ত অন্তরকে চঞ্চল করিয়া তোলে। একটা অনির্দ্দেশ্য আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দেয়। মন উদাস হইয়া যায়। অনেক কবি এই অপরূপ ভাবকে অনন্তের জন্য আকাঙ্ক্ষা বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। আমিও কখনো কখনো এমনতর ভাব অনুভব করিয়াছি এবং এমনতর ভাষাও প্রয়োগ করিয়া থাকিব। কেবল সঙ্গীত কেন, সন্ধ্যাকাশের সূর্য্যাস্তছটাও কত-বার আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত বিশ্বজগতের হৃৎস্পন্দন সঞ্চা-রিত করিয়া দিয়াছে ; যে একটি অনির্ব্বচনীয় বৃহৎ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়াছে, তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের সুখদুঃখের কোন যোগ নেই, তাহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিখিল চরাচরের সামগান। কেবল সঙ্গীত এবং সূর্য্যাস্ত কেন, যখন কোন প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া তোলে, তখন তাহাও আমাদিগকে সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহা একটা মহৎ ধর্ম্ম, একটা বৃহৎ উপাসনার আকার ধারণ করে, দেশকালের শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মত অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।

এইরূপে প্রবল স্পন্দনে আমাদিগকে বিশ্বস্পন্দনের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। বৃহৎ সৈন্য যেমন পরস্পরের নিকট হইতে ভাবের উন্মত্ততা আকর্ষণ করিয়া লইয়া একপ্রাণ হইয়া উঠে, তেমনি বিশ্বের কম্পন সৌন্দর্য্যযোগে যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তখন আমরা সমস্ত জগতের সহিত একতালে পা ফেলিতে থাকি, নিখিলের প্রত্যেক কম্পমান পরমাণুর সহিত একদলে মিশিয়া অনিবার্য্য আবেগে অনন্তের দিকে ধাবিত হই।

এই ভাবকে কবিরা কত ভাষায় কত উপায়ে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কত লোকে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই—মনে করিয়াছে উহা কবিদের কাব্যকুয়াশা মাত্র।

কারণ, ভাষার ত হৃদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাহাকে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। সে দূতমাত্র, হৃদয়ের খাস্‌মহলে তাহার অধিকার নাই, আম্ দরবারে আসিয়া সে আপনার বার্ত্তা জানাইয়া যায় মাত্র। তাহাকে বুঝিতে, অর্থ করিতে অনেকটা সময় যায়। কিন্তু সঙ্গীত একেবারে এক ইঙ্গিতেই হৃদয়কে আলিঙ্গন করিয়া ধরে।

এইজন্য কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সঙ্গীত নিযুক্ত করিয়া দেন। সে আপন মায়াস্পর্শে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। ছন্দে এবং ধ্বনিতে যখন হৃদয় স্বতই বিচলিত হইয়া উঠে, তখন ভাষার কার্য্য অনেক সহজ হইয়া আসে। দূরে যখন বাঁশি

বাজিতেছে, পুষ্পকানন যখন চোখের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রেমের কথার অর্থ কত সহজে বোঝা যায়। সৌন্দর্য্য যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ের সহিত ভাবের পরিচয় সাধন করিতে পারে এমন আর কেহ নয়।

কেবল তাহাই নয়। ভাবের সহিত সঙ্গীত যোগ করিয়া কবিতা তাহার সমস্ত দৈন্য দূর করিয়া দেয়। তাহাকে প্রতি-দিনের ধূলিতল হইতে তুলিয়া লইয়া একটি সৌন্দর্য্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়—তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি অনন্তের সুর বাজিতে থাকে। পৃথিবীর চারিদিকে রহস্যময় জ্যোতিষ্কখচিত নীলাকাশ যেমন, ভাবের চারিদিকে সঙ্গীত তেমনি। চারিদিকে এই আকাশটি থাকাতে আমাদের ধূলির পৃথিবীরও এত গৌরব, তাই আমরা মর্ত্ত্যভূমির সমস্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বর্গের সহিত, অনন্ত জগতের সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিয়াছি। কবিতার সঙ্গে সঙ্গীত এবং সৌন্দর্য্য থাকাতে আমাদের প্রতি-দিবসের ভাবগুলি চিরদিবসের হইয়া দাঁড়ায়, আমাদের চিত্ত-কোটরের সুখদুঃখ বেদনার উপর অনন্তের জ্যোতি নিপতিত হইয়া তাহার মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়।

সুর এবং তাল, ছন্দ এবং ধ্বনি, সঙ্গীতের দুই অংশ। গ্রীকরা "জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গীত" বলিয়া একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, শেক্স্‌পিয়রেও তাহার উল্লেখ আছে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটা গতির সঙ্গে আর একটা গতির বড় নিকট-সম্বন্ধ। অনন্ত আকাশ যুড়িয়া চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা তালে তালে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিশ্বব্যাপী মহা সঙ্গীতটি যেন কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায়। ছন্দ সঙ্গীতের একটা রূপ। কবিতায় সেই ছন্দ এবং ধ্বনি দুই মিলিয়া ভাবকে কম্পা-

ম্বিত এবং জীবন্ত করিয়া তোলে, বাহিরের ভাষাকেও হৃদয়ের ধন করিয়া দেয়। যদি কৃত্রিম কিছু হয় ত ভাষাই কৃত্রিম, সৌন্দর্য্য কৃত্রিম নহে। ভাষা মানুষের, সৌন্দর্য্য সমস্ত জগতের এবং জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার।

শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আনন্দোজ্জ্বলমুখে কহিলেন—নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্ত্তমান থাকে। সঙ্গীত, আলোক, দৃশ্যপট, সুন্দর সাজসজ্জা সকলে মিলিয়া নানা দিক হইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে, তাহার মধ্যে একটা অবিশ্রাম ভাবস্রোত নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানা কার্য্যরূপে প্রবাহিত হইয়া চলে—আমাদের মনটা নাট্য-প্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করে এবং দ্রুতবেগে ভাসিয়া চলিয়া যায়। অভিনয়স্থলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে, সেখানে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্মিলিত হয়, বোধ হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

ব্যোম চোখ বুজিয়া কহিলেন—শেক্‌স্‌পিয়র বলেন, সমস্ত সংসারটা নাট্যশালা। প্রকৃতি নামক একটি নটী রঙ মাখিয়া অভিনয় করিতেছে, প্রলয়ের পঞ্চমাঙ্কে এই মহা ট্র্যাজেডির অবসান।—ওরে তামাক দিয়ে যা! আগুন নিভে গেছে।

দার্শনিক মতামত।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্য-জীবনের আবর্ত্ত দুই পাক ঘুরিলে নিম্ন-লিখিত প্রকার পর্য্যায়-ক্রমের অন্বেষণ পাওয়া যাইতে পারে—যথা,

	অহং	
	মন	(জিজ্ঞাসা)
সাংখ্যের অভিব্যক্তি-ক্রম {	বুদ্ধি	(সামান্য জ্ঞান)
	পুনরায়	
	অহং	(অহঙ্কার)
	মন	(মীমাংসা)
	বুদ্ধি	(বিজ্ঞান)

এই ছয়টি ধাপের মধ্য হইতে প্রথমজন্মের বুদ্ধি ও দ্বিতীয় জন্মের অহংকার এবং মন, এই তিন বৃত্তিকে পৃথক্ করিয়া বাছিয়া লইলেই আমরা দেখিতে পাই যে, সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি হইতে মন পর্য্যন্ত যে একটি ধারাবাহিক অভিব্যক্তির ক্রম নিরূপিত হইয়াছে তাহার সহিত আমাদের প্রদর্শিত অভিব্যক্তি-ক্রমের সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে। তা' ছাড়া—আমরা পরে দেখাইব যে, প্রথম জন্মের অহং এবং মন—প্রকৃতি-শব্দের অভিধেয়, এবং সেই প্রকৃতি গুণত্রয়ের সঙ্ঘাত। কিন্তু এইসূত্রে কোনো কোনো পরমতান্বেষী পাঠকের মনে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতে পারে—তিনি মনে করিতে পারেন যে, লেখক নিশ্চয়ই সাংখ্য-মতাবলম্বী। এই সব মত-চর্চ্চার গোলোযোগ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া নির্ব্বিবাদে সত্যান্বেষণ করি, ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিলাষ; এইজন্য নিম্ন-লিখিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আমরা আমা-

সের সমস্ত দার্শনিক মতামত মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া মনকে হাল্কা করিয়াছি—

প্রশ্ন। সাংখ্যমতাবলম্বী?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। বৈদান্তিক?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। কান্টিষ্ট্।

উত্তর। না।

প্রশ্ন। স্পেন্সীরিয়ান্।

উত্তর। কোনো জন্মে না।

প্রশ্ন। সংশয়বাদী?

উত্তর। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—না।

প্রশ্ন। স্বমতাবলম্বী?

উত্তর। কোথায় চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র, কোথায় খদ্যোত! না।

মতান্বেষী ব্যক্তি যদি দ্বিতীয়বার ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তবে দ্বিতীয়প্রকার উত্তর পাইবেন যথা,—

প্রশ্ন। সাংখ্যমতাবলম্বী?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। বৈদান্তিক?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। কান্টিষ্ট্?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। সংশয়বাদী?

উত্তর। সংশয়ই জ্ঞানের প্রথম পঁইটে (Descartes)—হাঁ।

প্রশ্ন। স্বমতাবলম্বী?

উত্তর। অবশ্য! (অশ্বত্থমা হতো বটে—কিন্তু ইতি গজো! স্বমত খদ্যোত বটে—কিন্তু অন্যের চক্ষে!)

উপরি-উক্ত দুই-মুখো প্রশ্নোত্তর কোন্ পাঠক কি ভাবে গ্রহণ করেন বলিতে পারি না—B. A. মহোদয় হয় তো বলিবেন "Contradiction in terms", তর্কালঙ্কার মহাশয় হয় তো বলিবেন "বদতো ব্যাঘাতঃ", বন্ধুলোকে হয় তো বলিবে, "বুঝিতে পারিলাম না", শত্রুলোকে বলিবে "আর বিলম্ব নাই!" ইত্যাদি। অতএব ঐ দুই প্রশ্নোত্তরের একটু টীকা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। প্রথম প্রশ্নোত্তরে "না" শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, "তুমি যাহা ভাবিতেছ, আমি তাহা নহি" অর্থাৎ "তুমি যাহা বলিতেছ আমি সর্ব্বাংশে তাহা নহি।" দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরে "হাঁ" শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, "তুমি যতটা ভাবিতেছ ততটা নহে,—কিন্তু কতকপরিমাণে তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহা বটে।" কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই—যাহা বলিলাম সমস্ত শুনিয়া একজন বাহিরে চস্‌মা-চক্ষু এবং অন্তরে দিব্য-চক্ষু M. A. মহাত্মা হয়তো আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া বলিবেন "ওহো! Eclectic?" ইহারও উত্তর পূর্ব্ববৎ না এবং হাঁ দুইই। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা অক্ষর "এ" এবং ইংরাজি অক্ষর "k" জোড়া দিয়া যদি "এক" গড়িয়া তোলা হয় এবং তাহার সঙ্গে পারস্য অক্ষরে "লেক্" এবং চীন-দেশীয় অক্ষরে "টিক্" জোড়া দিয়া "এক্‌লেক্‌টিক্" গড়িয়া তোলা হয়, তবে তাহা যে সাপ ব্যাঙ কি হইল—তাহা সকল দেশের সকল লোক একত্র জোটবদ্ধ হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেও কেহই তাহার অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাইবে না—এরূপ কিম্ভূত কিমাকার পাঁচরঙা বেখাপ আবির্ভাব-বিশেষকে যদি

Eclecticism বলা যায়—তবে আমরা Eclectic নহি। কি অর্থে আমরা Eclectic "না" তাহা বলিলাম, কি অর্থে "হাঁ" তাহা এখন বলি; আমি ক্ষুধিত—আমার সম্মুখে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত—"আপ্‌রুচি খানা"—পায়স মিষ্ট বলিয়া কেবল তাহাকেই সার করিতেছি না, আর, পল্‌তার ঝোল তিক্ত বলিয়া তাহাকেও ছার করিতেছি না—আমার শিক্ষা জঠরানলের নিকট হইতে—জঠরানল সকল বস্তু হইতেই ছার পরিত্যাগ করিয়া সারসংগ্রহ করে; ইহার নাম যদি Eclecticism হয় তবে আমি Eclectic হইতে অরাজি নহি—"অরাজি" শব্দই তাহার প্রমাণ। রূপক ছাড়িয়া দিয়া সাদা কথায়—সাংখ্যের কি মত, বেদান্তের কি মত, ইত্যাদি নানা মুনির কাহার কি মত তাহা আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাস্য নহে—আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাস্য—সত্য কি? সত্য অন্বেষণ করিতে করিতে যদি কাহারো কোন মত আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়, তবে তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া আমরা তাহা হইতে ("পলালমিব ধান্যার্থী") তুষাংশ পরিত্যাগ করিয়া ধান্যাংশ আত্মসাৎ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। আমরা সত্যের অনুরোধে কখনো বা সাংখ্যের কোনো একটা মত অবলম্বন করিব, কখনো বা বেদান্তের কোনো একটা মত অবলম্বন করিব, কখনো বা কাণ্টের কোনো একটা মত অবলম্বন করিব, শতমুনির শত মত অবলম্বন করিব; কিন্তু আমাদের নিজের একটা মত গোড়ায় স্থির আছে, তাহার সহিত মিলাইয়া না দেখিয়া কাহারো কোনো মতকে আমরা সহসা আমাদের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না;—এইজন্য ঐ সকল নানা মতের যে অংশ-গুলা পরস্পর-বিরোধী তাহা আমাদের আলোচনা-ক্ষেত্রে স্থান পাইতে পারিবে না,—দ্বারোপান্তে এইরূপ একটি

বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে যে, "অগ্রে বিবাদ ভঞ্জন কর—তাহার পরে প্রবেশ কর।" এবারকার প্রবন্ধ মতামতের উপর দিয়াই চলিয়া গেল—সাংখ্যের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য যাহা, তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বুদ্ধচরিত।

সপ্তম অধ্যায়।

বুদ্ধ ৬৮ অঞ্জন-অব্দে, পূর্ণিমা-তিথিতে, বিশাখা-নক্ষত্রে, বৈশাখ মাসে, মঙ্গলবারে, জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়টি ইউরোপীয় গণনামতে ঠিক কোন্ বৎসর, তাহা লইয়া এখনও পণ্ডিত-দিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছে। আমরা সিংহলদেশের গণনাটি আপাততঃ গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছি। যখন শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করেন, তখন শাক্যদিগের মধ্যে অঞ্জনাব্দ বলিয়া একটি অব্দ প্রচলিত ছিল। অঞ্জন বুদ্ধের মাতামহ। তাঁহার অন্যতর নাম অনুশাক্য। ইনি কোলি বা ব্যাঘ্রপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে একটি নির্দ্দিষ্ট অব্দ-মতে সকল ঘটনার গণনা হইত। তাহা কি, কোন্ সময় বা ঘটনা হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহা মীমাংসা করি-বার আমাদিগের কোন উপায় নাই। তবে এইপর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রচলিত অব্দে অনেকপ্রকার ভ্রম দৃষ্ট হও-য়াতে অঞ্জন সেই অব্দের ৮৬৪০ সনে স্বীয় নামে একটি নূতন অব্দ প্রচার করেন। খ্রীষ্টাব্দমতে ধরিলে তখন পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দ ৬৯১ বৎসর ছিল। এই অঞ্জনাব্দ শাক্যদিগের মধ্যে অনেক-

কাল প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইলেই তাহা স্থগিত হয় এবং তখন হইতে বুদ্ধাব্দ বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত হয়। ১৪৮ অঞ্জনাব্দে বুদ্ধের মৃত্যু হয়। সুতরাং ১৪৮ অঞ্জনাব্দে পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দ ৫৪৩ ছিল, এবং যেহেতু বুদ্ধ ৮০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন, তাঁহার জন্মবৎসর সেইজন্য পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দ ৬২৩ বলিয়া ধার্য্য করা যাইতে পারে।

কানিংহাম সাহেব এই গণনাতে ৬৬বৎসর ভুল আছে ইহা স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধ ৫৫৮ পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মত যে সর্ব্বসম্মত তাহা বলিতে পারি না। সেইজন্য যে অব্দ সিংহলদেশে বরাবর প্রচলিত আছে তাহাই আমরা গ্রহণ করিলাম। বোধ হয়, সময়ক্রমে নূতন আলোক আসিয়া সন্দেহ-তিমির দূর করিয়া দিবে।

বৌদ্ধদিগের মতে যেদিন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, সেইদিন তাঁহার পত্নী যশোধরার জন্ম হয়, সেইদিন তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং প্রিয় অশ্ব কণ্টিক জন্মলাভ করে, এবং সেইদিন উরুবেল জঙ্গলে বোধিদ্রুম বলিয়া প্রসিদ্ধ অশ্বথবৃক্ষও অঙ্কুরিত হয়।

বুদ্ধের জন্মসংবাদ কপিলবস্তু এবং ব্যাঘ্রপুরে প্রেরিত হইল। উভয় স্থান হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া তাঁহাকে পিতৃসদনে লইয়া গেল। ঘোর আনন্দের কোলাহল চারিদিক হইতে উত্থিত হইল। প্রজাদিগের আনন্দিত হইবার অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ শুদ্ধোদন অতিশয় সৎপ্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাহার পর, মায়াদেবী একজন সতীসাধ্বী, পতিব্রতা রমণী বলিয়া প্রজারা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত। তাহার উপর আবার এত অধিকবয়সে তাঁহাদিগের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে, ইহা দেখিয়া যে, সকলের আনন্দোচ্ছ্বাস হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

জন্মের পঞ্চ দিবস পরে নবজাত সন্তানের নামকরণ হইল। শুদ্ধোদন এইজন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। রাজবাটীর একটি ঘর নানা সুগন্ধদ্রব্যে পূর্ণ এবং পুষ্পমালায় চারিদিক সুশোভিত হইল। সেই দিন দুগ্ধ, চিনি এবং মধু মিশ্রিত করিয়া শিশু ও আগন্তুকসকলের জন্য পরমান্ন প্রস্তুত হইল। এক শত আশীজন অধ্যাপক সেইদিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন বিতরণ করিয়া অবশেষে পুত্রের লক্ষণসকল নিরূপণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আটজন জ্যোতিষী ছিলেন—তাঁহারা হাত দেখিয়াও গণনা করিতে পারিতেন। সাতজন একমত হইয়া বলিলেন যে, যদি এই শিশু মনুষ্যসমাজে বাস করেন, তাহা হইলে তিনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া ধরায় সমুদায় দেশকে একছত্রে আনয়ন করিতে পারিবেন, আর যদি সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কালক্রমে তিনি একজন বুদ্ধ হইবেন। অবশিষ্ট একজন অধ্যাপক হাত দেখিয়া বলিলেন—"না! এই শিশু কখন জনসমাজে থাকিতে পারিবেন না। ইনি নিশ্চয়ই জীবনবন্ধন কাটিয়া বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হইবেন।" শিশু জীবগণের মুক্তির কারণ হইবেন, তাঁহার পুণ্যে বিশ্বের গতি হইবে, এইকারণে তাঁহাকে সিদ্ধার্থ নাম প্রদত্ত হইল।

কিন্তু সংসারে অমিশ্রিত সম্ভোগ কখন থাকে না। শিশু জন্মিবার সাতদিন পরে তাঁহার জননী মায়াদেবীর কাল হইল। মহৎ লোকের জননী মহতী হন—একথা ইতিহাসে একপ্রকারে প্রমাণিত হইয়াছে। মায়াদেবী যেরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ছিলেন, তাহাতে একথার আরও একটি অধিক প্রমাণ পাওয়া গেল। বৌদ্ধেরা বলেন যে, মায়াদেবী পৃথিবী হইতে চলিয়া

গেলে তুষিত-স্বর্গের অধিবাসিনী হন এবং সঞ্চিত পুণ্য-রাশির বলে তাঁহাকে আর পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিতে হয় নাই।

মায়াদেবীর ভগ্নী মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাঁহার সপত্নী ছিলেন। যখন সিদ্ধার্থ মাতৃহীন হন, তখন তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই মহা-প্রজাপতি গৌতমী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ভিক্ষুকী-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের বাল্যকালের কথা ইতিহাস মধ্যে অধিক পাওয়া যায় না। সকলেই বলেন যে, শৈশবাবস্থা হইতে তাঁহার ভাবী মহত্ত্ব যেন তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভাবে চরিত্রে অঙ্কিত ছিল। ইহাও কথিত আছে যে, যখন তাঁহার পিতা মঙ্গলার্থ তাঁহাকে কপিলবস্তুর দেবমন্দিরে লইয়া যান, তখন শিশুকে দেখিয়াই মন্দি-রস্থ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিসকল সজীব হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া সিদ্ধার্থকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিল। সেই দেবতাদিগের নাম-গুলিও ললিতবিস্তর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। নামগুলি এই—শিব, স্কন্দ, নারায়ণ, চন্দ্র, সূর্য্য, বৈশ্রবণ, শক্র এবং লোকপালগণ। এ গল্পটি সত্য না হউক, কিন্তু ইহা হইতে আমরা একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার জানিতে পারিতেছি। তখন প্রতিমূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত ছিল—পৌরাণিক দেবদেবীর আধিপত্য ছিল না। প্রতিমূর্ত্তি-পূজা এদেশে কোন সময়ে ছিল না, ইহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদিগের অনুভব এই যে, আর্য্যজাতির জন্মের সঙ্গে ইহারও সৃষ্টি হয় এবং এমন কোন সময় ছিল না যখন ভারতবাসীরা একেবারে একেশ্বরবাদী ছিল। সাধারণ লোকদিগের জন্য প্রতি-মূর্ত্তির অভাব সর্ব্বপ্রথম হইতেই লক্ষিত হয় এবং বিশুদ্ধ একেশ্বর-বাদ কেবল ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তবে ভার-

তের পুস্তকসমূহ পাঠ করিলে ইহা জানিতে পারা যায় যে, প্রতিমূর্ত্তি-পূজা সকলসময়ে একপ্রকারের ছিল না। বৈদিক সময়ের প্রতিমূর্ত্তি একপ্রকার এবং পৌরাণিক প্রতিমূর্ত্তি আর একপ্রকার। বুদ্ধের সময় বৈদিক দেবদেবীর পূজা হইত। মহামতি সুপ্রসিদ্ধ Burnouf নেপালের বৌদ্ধসাহিত্য পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দিব্য অবদান গ্রন্থে কৃষ্ণের নাম একবারও উল্লিখিত নাই। তিনি এবং মহাত্মা কোলব্রুক উভয়েই এই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ভারতে কৃষ্ণপূজা বুদ্ধের সমসাময়িক ছিল না, তাঁহার অনেক পরে হইয়াছে। পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে, আমরা কৃষ্ণের বিষয় বলিতেছি না, কৃষ্ণপূজার বিষয় বলিতেছি। মহাভারত বুদ্ধের অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখন বুদ্ধের জন্ম হয় তখন পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণের কথা তখনকার লোকেরা সকলেই জানিত। কিন্তু কথা হইতেছে যে, কৃষ্ণপূজা কি তখন প্রচলিত ছিল? বোধ হয়, না। নিদেন ইহা বলা যাইতে পারে যে, তখন দেশের কোন কোন ভাগে কৃষ্ণপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সমুদায় ভারতের দেবদেবীর মধ্যে কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে পূজিত হইতেন, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। বৌদ্ধসূত্রগুলি বুদ্ধের মৃত্যুর পরেই লিখিত হয়। সে সকলে কৃষ্ণের নাম নাই—অন্যান্য দেবদেবীর নাম আছে। ললিতবিস্তর গ্রন্থ এখন যে ভাবে বর্ত্তমান আছে, তাহা বোধ হয় খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে লিখিত হয়। তাহাতেও কৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তির নাম নাই। কিন্তু ললিতবিস্তরে মহাভারতের কথা পাওয়া যায়

এবং তাহার একাদশ অধ্যায়ে একজন বুদ্ধের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে করিতে বলিতেছেন :—এই যুবার অঙ্গ বৈশ্রবণ অপেক্ষা সুন্দর এবং উজ্জ্বল। ইনি কি রাহু? ইহা কি বজ্রধারী ইন্দ্রের দেহ, না সূর্য্যের, না চন্দ্রের? ইনি কি সর্ব্বশক্তিমান কাম-দেব, না রুদ্র, না কৃষ্ণ?" * এখানে আমরা কৃষ্ণের নাম পাইতেছি। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ললিতবিস্তর গ্রন্থ বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন কণিষ্ক বলিয়া একজন প্রবলপরাক্রান্ত বৌদ্ধ রাজা ভারতের মধ্যদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ সভা † হয় এবং সেই সভাতে অনেকগুলি পুস্তক সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে ললিতবিস্তর একখানি। আমরা যে ললিতবিস্তর পাঠ করি ইহা তাহাই। কণিষ্ক খ্রীঃ অব্দ ১০ সালে ভারতের রাজা হন।

অনার্য্য ব্রাহ্মণ।

আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভিন্ন ভারতবর্ষের অপর জাতিমাত্রই আর্য্যেতর—হয় সম্পূর্ণ অনার্য্য এবং শূদ্রপদবাচ্য, নয় আর্য্য-শোণিতের সহিত অনার্য্য-শোণিতের মিশ্রণফল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য এখনকার দিনে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণই একমাত্র অবশিষ্ট ভারত-

* Lalita vistara by Foucaux.

† আমার অশোকচরিত গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের চারিটি সভার বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে।

বর্ত্তীয় আর্য্যসন্তান।—কিন্তু যখন শুনা যায় যে, এখানেও সংশয় মিটে নাই, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও এত বিজাতীয় শ্রেণীবিভাগ এবং পরস্পরের জাতিগৌরবের প্রতি এমনি অবিশ্বাস যে, এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতেও লজ্জা বোধ করে, এবং আকারে প্রকারে, চালচলনে, দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক সামান্য অনুষ্ঠানটিতে পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একেবারে আর্য্য অনার্য্য প্রভেদ, তখন আমাদের পূর্ব্ববিশ্বাসকে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়।

হণ্টার সাহেব তাঁহার উড়িষ্যার বিবরণের একস্থলে প্রসঙ্গক্রমে হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহলপ্রান্ত অবধি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই জাতিবিভাগের যাবতীয় দৃষ্টান্ত এবং তৎসংক্রান্ত কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, হিমালয়ের পাদমূলে চম্বা নামক প্রদেশে গাড়ী নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। ইহারা মেষ চরাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। রাখালদিগের সহিত ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে কিছুই প্রভেদ নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া বাহির হয়, সন্ধ্যাকালে ধেনু চরাইয়া ঘরে ফিরে। হণ্টার সাহেব ইহাদিগকে—বিশেষতঃ গাড়ী স্ত্রীলোকদিগকে—বিশেষ সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আরও একটু দক্ষিণে কাংরা উপত্যকায় ব্রাহ্মণেরা হল চালনা করে। সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণাচক্ষে দেখেন এবং আপনাদিগের স্বজাতি বলিয়া আমল দেন না। স্থানীয় ব্রাহ্মণবংশাবলীর মধ্যেও ইহাদের কোনও উল্লেখ নাই।

সিমলা পাহাড়ে ব্রাহ্মণেরা রাখাল, কৃষক, কুলি এবং মজুরের কাজ করিয়া থাকে। একটু দুরবর্ত্তী স্থানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে

বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা গৌরবের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়, এবং পিতৃগণ কন্যাদিগকে অসৎ উদ্দেশ্যে বিক্রয় করিতে লজ্জা-বোধ করে না। হণ্টার সাহেবের একজন ব্রাহ্মণ খানসামা ছিল—সে যে সকল কাজ করিত, সাহেবের একজন গোয়ালা চাকর সে সকল কাজ স্পর্শ করা তাহার জাতির অনুপযুক্ত মনে করিত।

পাতিয়ালায় অনেক ব্রাহ্মণ-মজুর আছে। ইহাদের কেহ কেহ পাল্কীবেহারার কাজ করিয়া খায়।

দক্ষিণে আসিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে একদল ব্রাহ্মণ-কৃষক দেখা যায়। ইহাদের নাম তগা। কিম্বদন্তী এই যে, ব্রাহ্মণের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কৃষি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া ইহাদের এই নাম—তগা ত্যাগের অপভ্রংশ। কিন্তু স্যর হেনরি ইলিয়ট্ সাহেব বলেন, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ একজন শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জাতিচ্যুত হয়েন। সেই অবধি ইহারা এক স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভুসা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত। এবং তাহাদের এক স্বতন্ত্র বর্ণভেদ-প্রণালী আছে।

উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরে হলচালক ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এবং শুনা যায় যে, একজন প্রবলপ্রতাপ ভূপতি দেব-পূজাকালে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ না পাওয়াতে গলায় পৈতা দিয়া বিস্তর ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করেন। ইহাদের অনেকে একসময় অযোধ্যায় গিয়া বসতি করে। কিন্তু সেখানকার ব্রাহ্মণসমাজ ইহাদিগকে গ্রহণ করে নাই।

অযোধ্যার সওয়ালাখী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ও এইরূপ রাজ-অনুগ্রহের ফল। রাজা রাম বঘেল নামক নরপতি একবার অনেক ব্রাহ্মণ লইয়া ধুমধাম সহকারে এক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন।

সওয়া লক্ষ ব্রাহ্মণ সহজে মিলিল না। রাজা হুকুম দিলেন সওয়া লক্ষ সামান্য প্রজার গলায় পৈতা দিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হউক্। রাজাজ্ঞা অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল এবং রাজসভা ব্রাহ্মণে ভরিয়া গেল।—গল্প আছে, কৃষ্ণও নাকি একবার এইরূপে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ প্রস্তত করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে বিশ্বামিত্রকে তবু তপস্যা করিতে হইয়াছিল। ইদানীং রাজপ্রসাদই যথেষ্ট।

বারাণসীর সন্নিহিত প্রদেশে ভুঁইহার ব্রাহ্মণদিগের জাতি সম্বন্ধেও লোকের সন্দেহ আছে। তাহারা বহুদিন অবধি কৃষি-কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এবং দেশীয় রাজশাসনে তাহাদিগকে কর দিতে হইত না।

এমনও দু'একটি বিবরণ শুনা যায় যে, এক প্রদেশের ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়। সেকালে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া যদি ইহা সম্ভব হয় বলা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও হয় ব্রাহ্মণেরা নয় সেখানকার ক্ষত্রিয়েরা বর্ণশঙ্কর।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের কথা কাহারও অবিদিত নাই। রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। কিন্তু কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের হীনতার সকল কারণ আমরা জানি না। অনেকে অনুমান করেন যে, দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত বিবাহাদিতে তাঁহাদের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়াই ইহার কারণ।

উড়িষ্যায়ও দুই জাতীয় ব্রাহ্মণ দেখা যায়। এক জাতীয়কে দেখিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হয়, অপর জাতি চাষ করে, মজুরী করে, নারিকেল বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে এবং

তাহাদের আকারপ্রকারে ব্রহ্মণ্যের কণামাত্র আভাসও পাওয়া যায় না।

দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মণ্যের আরও দুর্দ্দশা। প্রবাদ আছে, পরশুরাম একবার ধীবরদিগকে জালের দড়ির পৈতা পরাইয়া ব্রাহ্মণ করিয়া লইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আগত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখেন না। মালাবারে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ উপাধিধারীদিগের মধ্যে পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন কনিষ্ঠদিগের বিবাহ নিষেধ। কিন্তু কনিষ্ঠেরা নায়ার কন্যাদিগের সহিত সহবাসে সন্তুষ্ট থাকে—এবং এইরূপে বিধি রক্ষিত হয়।

নায়ার ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার এবং বিধিব্যবস্থায় তাহাদিগের অনার্য্য মূল সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। পুত্রের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে ভাগিনেয় বিষয়ের অধিকারী।

দাক্ষিণাত্যে চোল ব্রাহ্মণেরা যে কত জাতির সম্মিশ্রণ বলা যায় না। এবং মদুরায় কর্ম্মকারেরা অবধি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

এমন কি, সমুদ্রপারে সিংহলেও এই ব্রাহ্মণীকরণের তরঙ্গ পহুঁছিয়াছিল বোধ হয়। মদুরার রাজা উত্তর হইতে একবার আটচল্লিশ সহস্র অনার্য্যকে স্বরাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরেরা কৃষিকার্য্য করিত। এবং সিংহলে যদিও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, কিন্তু সেখানেও চাষী ব্রাহ্মণ নামেই ইহারা পরিচিত।

ব্রহ্মণ্যের এই সকল শাখাপ্রশাখা আলোচনা করিয়া হণ্টার সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ইংরাজ আসিয়া যেমন জাতিভেদটা আইনবদ্ধ হইয়াছে পূর্ব্বে এতটা ছিল না। ইহার মধ্যে মধ্যে অনেক ছিদ্র ছিল। এবং সেই সকল ছিদ্রপথ দিয়া কালে কালে

অনেক সম্পূর্ণ বিজাতীয় শোণিত ব্রাহ্মণবংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এবং অনেক স্থলে সম্পূর্ণ এক হইলেও ব্রাহ্মণ এবং আর্য্য সর্ব্বত্র একার্থবাচক নহে।

প্রসঙ্গ-কথা।

(সমুদ্রযাত্রা।)

বাঙ্গলা দেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র এবং চটি পুঁথি বাক্যোচ্ছ্বাসে ফেনিল ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে—পরস্পর আঘাত প্রতিঘাতেরও শেষ নাই।

তর্কটা এই লইয়া যে, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ, না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া কোন কথা নহে। কারণ, যাহা অন্যহিসাবে ভাল অথবা যাহাতে কোন মন্দর সংশ্রব দেখা যায় না, তাহা যে শাস্ত্রমতে ভাল না হইতে পারে একথা স্বীকার করিতে আমাদের কোন লজ্জা নাই।

যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম, তবে সেই মঙ্গলের দিক হইতে যুক্তি আকর্ষণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিতাম। আগে দেখাইতাম অমুক কার্য্য আমাদের পক্ষে ভাল এবং অবশেষে দেখাইতাম তাহাতে আমাদের শাস্ত্রের সম্মতি আছে।

সমুদ্রযাত্রার উপকারিতার পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ থাক্ না কেন, যদি শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে একটিমাত্র বচন থাকে, তবে সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হইবে। তাহার অর্থ এই, আমাদের কাছে সত্যের অপেক্ষা বচন বড়, মানবের শাস্ত্রের নিকট জগদীশ্বরের শাস্ত্র ব্যর্থ।

শাস্ত্রই যে সকলসময়ে বলবান তাহাও নহে। অনেকে বলেন বটে, ঋষিদের এমন অমানুষিক বুদ্ধি ছিল যে, তাঁহারা যেসকল বিধান দিয়াছেন, সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ করিয়া আমরা অন্ধবিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে তাহা পালন করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু সমাজে অনেক সময়েই শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করেন এবং তখন লোকাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া থাকেন।

তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে, শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য অভ্রান্ত নহে। যদি অভ্রান্ত হইত, তবে লোকাচার তাহার কোনরূপ অন্যথা করিলে লোকাচারকে দোষী করা উচিত হইত। কিন্তু দেশাচার ও লোকাচারের প্রতি যদি শাস্ত্রবিধি-সংশোধনের ভার দেওয়া যায়, তবে শাস্ত্রের অমোঘতা আর থাকে না—তবে স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।

তাহা যদি না খাটিল, তবে আমাদের কর্ত্তব্যের নিয়ামক কে? শুভবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে। লোকাচার। কিন্তু লোকাচারকে কে পথ দেখাইবে? লোকাচার যে অভ্রান্ত নহে ইতিহাসে তাহার শতসহস্র প্রমাণ আছে। লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না, এত সংস্কারকের অভ্যুদয় হইত না।

বিশেষতঃ যে লোকসমাজের মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই সেখানকার জড় লোকাচার আপনাকে আপনি সংশোধন করিতে পারে না। স্রোতের জল অবিশ্রাম গতিবেগে নিজের দূষিত অংশ ক্রমাগত পরিহার করিতে থাকে। কিন্তু বদ্ধ জলে দোষ প্রবেশ করিলে তাহা সংশোধিত হইতে পারে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমাদের সমাজ বদ্ধ সমাজ। একে ত আভ্যন্তরিক সহস্র আইনে বদ্ধ, তাহার পরে আবার ইংরাজের আইনেও বাহির হইতে অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন পড়িয়া গেছে। সমাজ-সংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার ছিল এবং পূর্ব্বকালে তাঁহারা সে কাজ করিতেন। কিন্তু অনধিকারী ইংরাজ আমাদের সমাজকে যে অবস্থায় হাতে পাইয়াছে ঠিক সেই অবস্থায় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সে নিজেও কোন নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে সাহস করে না, বাহির হইতেও কোন নূতন নিয়মকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কোন্‌টা বৈধ, কোন্‌টা অবৈধ তাহা সে অন্ধভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন সমাজের কোন সচেতন স্বাভাবিক শক্তি সহজে কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না।

এমন বাঁধা-সমাজের মধ্যে যদি লোকাচার মানিতে হয়, তবে একটা মৃত দেবতার পূজা করিতে হয়। সে কেবল একটা নিশ্চল নিশ্চেষ্ট জড়-কঙ্কাল। সে চিন্তা করে না, অনুভব করে না, সময়ের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার দক্ষিণে বামে নড়িবার শক্তি নাই। সমস্ত হতভাগ্য জাতি, তাহার সমস্ত ভক্ত উপাসক, যদি তাহার সম্মুখে পড়িয়া পলে পলে

আপনার মরণব্রত উদযাপন করে, তথাপি সে কল্যাণ-পথে তিলার্দ্ধ-মাত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

যাঁহারা শাস্ত্র হইতে বিধি সংগ্রহ করিয়া লোকাচারকে আঘাত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা কি করেন? তাঁহারা মৃতকে মারিতে চাহেন। যাহার বেদনাবোধ নাই তাহার প্রতি অস্ত্র-প্রয়োগ করেন, যে অন্ধ, তাহার নিকট দীপশিখা আনয়ন করেন। অস্ত্র প্রতিহত হয়, দীপশিখা বৃথা আলোকদান করে।

তাঁহাদের আর একটা কথা জানা উচিত। শাস্ত্রও এক সময়ের লোকাচার। তাঁহারা অন্যসময়ের লোকাচারকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া বর্ত্তমানকালের লোকাচারকে আক্রমণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন, বহু প্রাচীনকালে সমুদ্রযাত্রার কোন বাধা ছিল না। বর্ত্তমান লোকাচার বলে, তখন ছিল না এখন আছে, ইহার কোন উত্তর নাই।

এ যেন এক শত্রুকে তাড়াইবার উদ্দেশে আর এক শত্রুকে ডাকা। মোগলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাঠানের হাতে আত্মসমর্পণ করা। যাহার নিজের কিছুমাত্র শক্তি আছে সে এমন বিপদের খেলা খেলিতে চাহে না।

আমাদের কি নিজের কোন শক্তি নাই? আমাদের সমাজে যদি কোন দোষের সঞ্চার হয়, যদি তাহার কোন ব্যবস্থা আমাদের সমস্ত জাতির উন্নতি-পথের ব্যাঘাতস্বরূপ আপন পাষাণ মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে, তবে তাহা দূর করিতে গেলে

আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এই প্রাচানকালে তাহার কোন নিষেধ-বিধি ছিল কি না? যদি দৈবাৎ পাওয়া গেল, তবে দিনকতক পণ্ডিতে পণ্ডিতে শাস্ত্রে শাস্ত্রে দেশব্যাপী একটা লাঠালাঠি পড়িয়া গেল—আর যদি দৈবাৎ অনুস্বরবিসর্গ-বিশিষ্ট একটা বচনার্দ্ধ না পাওয়া গেল, তবে আমরা কি এমনই নিরুপায় যে সমাজের সমস্ত অসম্পূর্ণতা সমস্ত দোষ শিরোধার্য্য করিয়া বহন কবিব, এমন কি, তাহাকে পবিত্র বলিয়া পূজা করিব? দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়?

আমরা কি নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধির বলে মাথা তুলিয়া বলিতে পারি না—পূর্ব্বে কি ছিল এবং এখন কি আছে তাহা জানিতে চাহি না, সমাজের যাহা দোষ তাহা দূর করিব, যাহা মঙ্গল তাহা আবাহন করিয়া আনিব? আমাদের শুভাশুভ জ্ঞানকে হস্তপদ ছেদন করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়া দিব, আর একটা গুরুতর আবশ্যক পড়িলে, দেশের একটা মহৎ অনিষ্ট, একটা বৃদ্ধ অকল্যাণ দূর করিতে হইলে, সমস্ত পুরাণ সংহিতা আগম নিগম হইতে বচনখণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া উদ্ভ্রান্ত হইতে হইবে—সমাজের হিতাহিত লইয়া বয়স্কলোকের মধ্যে এরূপ বাল্যখেলা আর কোন দেশে প্রচলিত আছে কি?

আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, যে লোকাচারকে তাহার স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছি, সে আবার এমনি মূঢ় অন্ধ যে, সে নিজের নিয়মেরও সঙ্গতি রক্ষা করিতে জানে না। কত হিন্দু যবনের জাহাজে চড়িয়া উড়িষ্যা, মাদ্রাজ সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে—তাহাদের জাতি লইয়া কোন কথা উঠিতেছে

না, এদিকে সমুদ্রযাত্রা বিধিসঙ্গত নহে বলিয়া লোকসমাজ চীৎকার করিয়া মরিতেছে। দেশে শত শত লোক অখাদ্য ও যবনান্ন খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল, প্রকাশ্যে যবনের প্রস্তুত মদ্যপান করিতেছে, কেহ সেদিকে একবার তাকায়ও না, কিন্তু বিলাতে গিয়া পাছে অনাচার ঘটে এজন্য বড় সশঙ্কিত! কিন্তু যুক্তি নিষ্ফল। যাহার চক্ষু আছে তাহার নিকট এ সকল কথা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবারও আবশ্যক ছিল না। কিন্তু লোকাচার নামক প্রকাণ্ড জড়-পুত্তলিকার মস্তকের অভ্যন্তরে ত মস্তিষ্ক নাই, সে একটা নিশ্চল পাষাণমাত্র। কাককে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ হাঁড়ি চিত্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে খাড়া করিয়া রাখে, লোকাচার সেইরূপ চিত্রিত বিভীষিকা। যে তাহার জড়ত্ব জানে সে তাহাকে ঘৃণা করে, যে তাহাকে ভয় করে তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোপ পায়।

আজকাল অনেক পুস্তক ও পত্রে আমাদের বর্ত্তমান লোকাচারের অসঙ্গতি দোষ দেখান হয়। বলা হয়, একদিকে আমরা বাধ্য হইয়া অথবা অন্ধ হইয়া কত অনাচার করি, অন্যদিকে সামান্য আচার বিচার লইয়া কত কড়াক্কড়! কিন্তু হাসি পায় যখন ভাবিয়া দেখি কাহাকে সে কথাগুলা বলা হইতেছে! শিশুরা পুত্তলিকার সঙ্গেও এমনি করিয়া কথা কয়। কে বলে লোকাচার যুক্তি অথবা শাস্ত্র মানিয়া চলে? সে নিজেও এমন মহা অপরাধ স্বীকার করে না। তবে তাহাকে যুক্তির কথা কেন বলি?

সমাজের মধ্যে যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা বিনা

যুক্তিতেই সাধিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য যখন এই জাতিনিগড়বদ্ধ দেশে জাতিভেদ কথঞ্চিৎ শিথিল করেন, তখন তাহা যুক্তিবলে করেন নাই, চরিত্রবলে করিয়াছিলেন।

আমাদের যদি এরূপ মত হয় যে, সমুদ্রযাত্রার উপকার আছে, মনুর যে নিষেধ বিনা কারণে ভারতবর্ষীয়দিগকে চির-কালের জন্য কেবল পৃথিবীর একাংশেই বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে, সেই কারাদণ্ডবিধান নিতান্ত অন্যায় ও অনিষ্টজনক, দেশে বিদেশে গিয়া জ্ঞান অর্জ্জন ও উন্নতিসাধন হইতে কোন প্রাচীন বিধি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না, যিনি আমাদিগকে এই সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণের অধিকার দিয়াছেন—তবে আমরা আর কিছু শুনিতে চাহি না, তবে কোন শ্লোকখণ্ড আমাদিগকে ভয় দেখাইতে, কোন লোকাচার আমাদিগকে নিষেধ করিতে পারে না।

বাঁধও ভাঙ্গিয়াছে। কেহ শাস্ত্র ও লোকাচারের মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই। বঙ্গগৃহ হইতে সন্তানগণ দলে দলে সমুদ্রপার হইতেছে এবং ক্ষীণবল সমাজ তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে না। সমাজের প্রধান বল নীতিবল যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে বেশীদিন কেহ ভয় করিবে না। যে সমাজ মিথ্যাকে কপটতাকে মার্জ্জনা করে, অর্দ্ধগুপ্ত অনাচারের প্রতি জানিয়া-শুনিয়া চক্ষু নিমীলন করে, যাহার নিয়মের মধ্যে কোন নৈতিক কারণ, কোন যৌক্তিক সঙ্গতি নাই, সে যে নিতান্ত দুর্ব্বল। সমাজের সমস্ত বিশ্বাস যদি দৃঢ় হইত, যদি সেই অখণ্ড

বিশ্বাস অনুসারে সে নিজের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত করিত, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করা বড় দুরূহ হইত।

যাঁহারা শুভবুদ্ধির প্রতি নির্ভর না করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে চান, তাঁহারা দুর্ব্বল। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে কোন যুক্তি নাই—সমাজ শাস্ত্রমতে চলে না।

দ্বিতীয় কথা এই, লোকাচার যে, সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে তাহার একটা অর্থ আছে। হিন্দুসমাজের অনেকগুলি নিয়ম পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ। একটা ভাঙ্গিতে গেলে আর একটা ভাঙ্গিয়া পড়ে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হয়। বাল্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীনবিবাহ আসিয়া পড়ে। স্বাধীনবিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে সমাজের বিস্তর রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং জাতিভেদের মূল ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসে। কিন্তু তাই বলিয়া এখন স্ত্রী-শিক্ষা কে বন্ধ করিতে পারে ?

সমুদ্রপার হইয়া বিদেশযাত্রাও আমাদের বর্ত্তমান সমাজ রক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। আমাদের সমাজে কোন প্রকার স্বাধীনতার কোন অবসর নাই। আমরা নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল অন্ধভাবে সমাজের অন্ধকূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বিধান। মৃত্যুর ন্যায় শান্ত অবস্থা আর নাই, সেই অগাধ শান্তি লাভ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব আমাদের জীবনীশক্তি লোপ করা হইয়াছে। একটি সমগ্র বৃহৎ জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নির্জ্জীব করিয়া ফেলিতে অল্প আয়োজন করিতে

হয় নাই। কারণ, মনুষ্যত্বের অভ্যন্তরে একটি অমর জীবনের বীজ নিহিত আছে যে, সে যদি কোন ছিদ্র দিয়া একটুখানি স্বাধীন সূর্য্যালোক ও বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়, অমনি অঙ্কুরিত, পল্লবিত বিকশিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। সেই ভয়ে আমাদের হিন্দুসমাজ কোথাও কোন ছিদ্র রাখিতে চাহে না; আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যেখানেই কালক্রমে একটি ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে, একটি ছিদ্র আবিষ্কৃত হইতেছে সেখানেই পুনর্ব্বার নূতন মৃত্তিকালেপ ও নূতন ইষ্টকপাত করিতে হইতেছে। আমাদের সমাজ জীবন্ত নহে, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্ত্তন নাই, তাহা সুসম্বদ্ধ, পরিপাটি প্রকাণ্ড জড়-অট্টালিকা। তাহার প্রত্যেক কক্ষ পরিমিত, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক যথাস্থানে বিন্যস্ত।

স্বাধীনতাই এ সমাজের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। যে রৌদ্রবৃষ্টি বায়ুতে জীবিত পদার্থের জীবনধারণ হয়, সেই রৌদ্রবৃষ্টি বায়ুতেই ইহার ইষ্টক জীর্ণ করে, এইজন্য সমাজ-শিল্পী অদ্ভুত নৈপুণ্যসহকারে এই কারাগারের মধ্যে সমস্ত স্বাধীন স্বাভাবিক শক্তির প্রবেশ প্রতিরোধ করিয়াছে।

যে যেখানে আছে, সে ঠিক সেইখানেই থাকিলে তবে এই জড়-সমাজ রক্ষিত হয়। তিলমাত্র নড়িলে-চড়িলে সমস্তটাই সশব্দে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইজন্য যেখানেই জীবন-চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তৎক্ষণাৎ চাপ দিতে হয়।

সমুদ্রপার হইয়া নূতন দেশে নূতন সভ্যতার নূতন নূতন আদর্শলাভ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে চিন্তার বন্ধন মুক্তি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যে সমস্ত নিয়ম আমরা বিনা সংশয়ে আজন্মকাল পালন করিয়া আসিয়াছি, কখনও কারণ জিজ্ঞাসাও মনে উদয় হয় নাই, সে সম্বন্ধে নানা যুক্তি তর্ক ও সন্দেহের উদ্ভব হইবে। সেই মানসিক আন্দোলনই হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ। বাহ্যতঃ ম্লেচ্ছ-সংসর্গ ও সমুদ্রপার হওয়া কিছুই নহে কিন্তু সেই অন্তরের মধ্যে স্বাধীন মনুষ্যত্বের সঞ্চার হওয়াই যথার্থ লোকাচার-বিরুদ্ধ।

কিন্তু হায়! আমরা সমুদ্রপার না হইলেও মনুর সংহিতা অন্যজাতিকে সমুদ্রপার হইতে নিষেধ করিতে পারে নাই। নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ নূতন বিশ্বাস জাহাজ-বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমাদের যে গোড়াতেই ভ্রম। সমাজরক্ষার জন্য যদি আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা, তবে গোড়ায় ইংরাজি শিক্ষা হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত ছিল। পর্ব্বতকে যদি মহম্মদের নিকট যাইতে নিষেধ কর, মহম্মদ যে পর্ব্বতের কাছে আসে, তাহার উপায় কি? আমরা যেন ইংলণ্ডে না গেলাম কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা যে আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বাঁধটা সেই ত ভাঙ্গিয়াছে। আজ যে এত বাক্‌চাতুরী, এত শাস্ত্র-সন্ধানের ধূম পড়িয়াছে, মূলে আঘাত না পড়িলে ত তাহার কোন আবশ্যক ছিল না।

কিন্তু মূঢ় লোকাচার এমনি অন্ধ অথবা এমনি কপটাচারী যে,

সে দিকে কোন দৃকপাত নাই। অতি বড় পবিত্র হিন্দুও শৈশব হইতে আপন পুত্রকে ইংরাজি শিখাইতেছে। এমন কি মাতৃভাষা শিখাইতেছে না। এবং শিক্ষাসমিতি-সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাশিক্ষা প্রস্তাব উঠিতেছে তখন স্বদেশের লোকেই ত তাহাতে প্রধান আপত্তি করিতেছে।

কেরাণীগিরি না করিলে যে উদরপূর্ণ হয় না। পাশ করিতেই হইবে। পাশ না করিলে চাকরী চুলায় যাক্, বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ইংরাজি শিক্ষার মর্য্যাদা দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে এম্‌নি বদ্ধমূল হইয়াছে।

কিন্তু এ কি ভ্রম, একি দুরাশা! ইংরাজি শিক্ষাতে কেবলমাত্র যতটুকু কেরাণীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকীটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিবে না! এ কি কথনো সম্ভব হয়! দীপশিখা কেবল যে আলো দেয় তাহা নহে, পলিতাটুকুও পোড়ায়, তেলটুকুও শেষ করে। ইংরাজি শিক্ষা কেবল যে মোটামোটা চাকুরি দেয় তাহা নহে, আমাদের লোকাচারের আবহমান সূত্রগুলিকেও পলে পলে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

এখন যতদিন এই শিক্ষা চলিবে এবং ইহার উপর আমাদের জীবিকানির্ব্বাহ নির্ভর হইবে, ততদিন যিনি যেমন তর্ক করুন, শাস্ত্র মৃতভাষায় যতই নিষেধ ও বিভীষিকা প্রচার করুক, বাঙ্গালী সমুদ্রপার হইবে, পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিপথের যাত্রীদের সঙ্গ ধরিয়া একত্রে যাত্রা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

সমালোচনা।

কঙ্কাবতী। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

এই উপন্যাসটি মোটের উপর যে আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে_তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোন বাঁধা নিয়ম, কোন চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়ম-পথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ, রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসঙ্গত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম-বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বচ্ছ-পটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

কিন্তু লেখক যে তাঁহার উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশকে রোগ-শয্যার স্বপ্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নে এমন কোন অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু

এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা নেপথ্যবর্ত্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল ভাব ও দৃশ্যের সংঘটন করা হইয়াছে, যাহা ঠিক বালিকার স্বপ্নের আয়ত্ত-গম্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্দ্ধরাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত দিক হইতে আর একটা গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমত করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে "অ্যালিস্ ইন্ দি ওয়াণ্ডার্ল্যাণ্ড্" নামক একটি ইংরাজি গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এইরূপ অসম্ভব, অবাস্তব কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এরূপ নিকট-সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্ত্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।

কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমরা এইসমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়াছি। এবং আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালকবালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালক-বালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরস গ্রন্থ আমাদের দেশের অতি অল্পলোকই লিখিতে পারেন। তাহার একটা কারণ, আমরা

জাতটা কিছু স্বভাববৃদ্ধ, পৃথিবীর অধিকাংশ কাজকেই ছেলে-মানুষী মনে করি ; সে স্থলে যথার্থ ছেলেমানুষী আমাদের কাছে যে কতখানি অবজ্ঞার যোগ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমরা ছেলেদের খেলাধূলা গোলমাল প্রায়ই ধমক দিয়া বন্ধ করি, তাহাদের বাল্য উচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিই, তাহাদিগকে ইস্কুলের পড়ায় ক্রমিক নিযুক্ত রাখিতে চাহি, এবং যে ছেলের মুখে একটি কথা ও চক্ষের পলকপাত ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন প্রকার গতি নাই, তাহাকেই শিষ্ট ছেলে বলিয়া প্রশংসা করি। আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না, অতএব আমরা ছেলেমানুষী বই পছন্দই বা কেন করিব, রচনার ত কথাই নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া নীতি উপদেশ দিই। য়ুরোপীয় জাতিদের কাজও যেমন বিস্তর, লেখারও তেমনি সীমা নাই। যেমন তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সকলপ্রকার কার্য্যানুষ্ঠানে পরিপক্কতালাভ করিয়াছে, তেমনি খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ কৌতুক পরিহাসে বালকের ন্যায় তাহাদের তরুণতা। এইজন্য তাহাদের সাহিত্যে ছেলেদের বই এত বহুল এবং এমন চমৎ-কার। তাহারা অনায়াসে ছেলে হইয়া ছেলেদের মনোহরণ করিতে পারে এবং সে কার্য্যটা তাহারা অনাবশ্যক ও অযোগ্য মনে করে না। তাহাদের সমস্ত সাহিত্যেই এই তরুণতার আভাস পাওয়া যায়। চার্ল্‌স্‌ ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গলায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকদের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত—তাহারা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলিত—হইল কি ? ইহা হইতে কি পাওয়া গেল ? ইহার তাৎপর্য্য কি, লক্ষ্য

কি? তাহারা পাকালোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ, সরস্বতীর সঙ্গেও লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায়; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কি রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙোমুল্লুকনিবাসী শ্রীমান্ ঘাঁঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভবিবাহবার্ত্তা আমাদের এই দুইঠেঙোমুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকসম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের নিবেদন এই যে, সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো চারটে কাজের কথা, তত্ত্বকথা, আমরা ধারণা করিতে পারি। আমাদের দেশের এই পঞ্চবিংশতি কোটি সুগম্ভীর কাঠের পুঁতুলের মধ্যে যদি কোন দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস এবং বাল্যচাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতরকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানব-হৃদয় জলধির বিচিত্র উত্থানপতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়। কখনো বাল্যের অকৃত্রিম হাস্য, কখনো যৌবনের উন্মাদ আবেগ, কখনো বার্দ্ধক্যের স্মৃতিভারাতুর চিন্তা, কখনো অকারণ উল্লাস, কখনো সকারণ তর্ক, কখনো অমূলক কল্পনা, কখনো সমূলক তত্ত্বজ্ঞান আনয়ন করিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মানসিক ষড়ঋতুর প্রবাহ রক্ষা করে, তাহাকে মরিয়া যাইতে দেয় না।

সাধনা।

দান প্রতিদান।

বড় গিন্নি যে কথাগুলা বলিয়া গেলেন তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন তাহার চিত্তপুত্তলি একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল। বিশেষতঃ কথাগুলা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা—এবং স্বামী রাধামুকুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বূলের সহিত তাম্রকূটধূম সংযোগ করিয়া খাদ্য পরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গেলেন।

কিন্তু এরূপ অসামান্য পরিপাকশক্তি সকলের নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমণি আজ শয়ন-গৃহে আসিয়া স্বামীর সহিত এমন ব্যবহার করিল যাহা ইতিপূর্ব্বে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইত, আজ একেবারে সবেগে কঙ্কণ ঝঙ্কার করিয়া স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিছানার একপাশে শুইয়া পড়িল এবং ক্রন্দনাবেগে শয্যাতল কম্পিত করিয়া তুলিল। রাধাগোবিন্দ তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকাণ্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ঔদাসীন্যে স্ত্রীর অধৈর্য্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদু গম্ভীর স্বরে জানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কার্য্যবশতঃ ভোরে উঠিতে হইবে, এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যক। স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মুহূর্ত্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। রাধাগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" রাসমণি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন "শোন নাই কি?"

রাধাগোবিন্দ। শুনিয়াছি। কিন্তু বৌঠাকরুণ একটা কথাও ত মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অন্নেই প্রতিপালিত নহি? তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি? যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাহাও খাওয়াপরার সামিল করিয়া লইতে হয়।

"এমন খাওয়াপরায় কাজ কি?"

"বাঁচিতে ত হইবে।"

"মরণ হইলেই ভাল হয়।"

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর, আরাম বোধ করিবে।"

বলিয়া রাধাগোবিন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধাগোবিন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্কও নয়; প্রায় গ্রাম-সম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড় গিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষতঃ শশিভূষণ দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে ছোটবৌয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে জিনিষটা নিতান্ত এক-

যোড়া না মিলিত, সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটবৌকেই দিতেন। তাহা ছাড়া অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধাগোবিন্দের পরামর্শের প্রতি বেশী নির্ভর করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কর্ম্মের সমস্ত ভার রাধাগোবিন্দের উপরেই ছিল। বড় গিন্নির সর্ব্বদাই সন্দেহ রাধাগোবিন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে—তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধাগোবিন্দের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহাদের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্প সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধাগোবিন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া বিরসমুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? অসুখ হয় নাই ত।" রাধাগোবিন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন "দাদা, আর ত আমার এখানে থাকা হয় না।" শশিভূষণ সভয়ে সস্নেহে কহিলেন "কেন ভাই?" রাধাগোবিন্দ গত সন্ধ্যাকালে বড় গৃহিণীর আক্রমণ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন। শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন "এই! এ ত নূতন কথা নহে। ও ত পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো

কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! কথা আমাকেও ত মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া ত সংসারত্যাগ করিতে পারি না।” রাধা কহিলেন “মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কি করিতে! কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে।” শশিভূষণ কহিলেন “তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি!” আর অধিক কথা হইল না। রাধাগোবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড় গৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে; সহস্র উপলক্ষে যখন-তখন তিনি রাধাগোবিন্দকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; মুহুর্মুহু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধাগোবিন্দ যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ত আজিকার নহে—দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাৎতাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসীর নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত—তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি! জীবনের এতগুলো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়? কিন্তু

এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্ন-প্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ, এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে আজ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের মধ্যে গবর্মেণ্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারীসম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত। একদিন খবর আসিল শশিভূষণের একমাত্র জমিদারী পরগণা এনাৎসাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে। রাধাগোবিন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন "আমারই দোষ!" শশিভূষণ কহিলেন "তোমার কিসের দোষ! তুমি ত খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাতে পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কি করিতে পার?"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোন ফল নাই—এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোন কাজকর্ম্মে হাত দিবেন সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মুহূর্ত্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন। প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধাগোবিন্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্ব্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্ত্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই-

সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধাগোবিন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধাগোবিন্দ পূর্ব্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী সহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি-ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল, এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধাগোবিন্দ প্রথম হই-তেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জিলার অধিকাংশ বড় বড় জমিদারের কার্য্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্ব্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাস-মণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ এবং ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোন গর্ব্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোন একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল; বোধ করি, দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোন একটা বিষয়ে বড় গিন্নির ইচ্ছার প্রতি-কূলে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিল—কিন্তু সে কেবল একটি দিন মাত্র—তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্ব্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল; এবং রাত্রে রাধাগোবিন্দ কি কি যুক্তিপ্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর রা রহিল না, বড় গিন্নির দাসীর মত হইয়া রহিল;—শুনা যায়, রাধাগোবিন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করি-য়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই—অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্প-

তির মিলনসাধন করাইয়া দেন ; এবং বলেন,"ছোটবৌ ত সে দিন আসিয়াছে,আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্য্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে ? ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ কর।"

রাধাগোবিন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় নিয়ম অনু-সারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড় গিন্নির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বই মন্দ নহে, কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবে-চনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতে-ছিলেন। আর কেহ তাহা ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধাগোবিন্দের চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সময়ে গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধাগোবিন্দ এপাশ-ওপাশ করিতেছে।

রাধাগোবিন্দ অনেক সময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত,"তো-মার কোন ভাবনা নাই দাদা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব—কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশী দিন দেরীও নাই।"

বাস্তবিক বেশী দিন দেরীও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল, সে ব্যবসায়ী লোক, জমি-দারীর কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়া-ছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদর খাজনা দিতে হইত—এক পয়সা মুনফা পাইত না। রাধাগোবিন্দ বৎসরের মধ্যে দুই একবার লাঠিয়াল লইয়া লুঠপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত।

প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যবসা-জীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত, এবং রাধা-গোবিন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্ব্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মকদ্দমা-মাম্‌লা করিয়া বারবার অকৃতকার্য্য হইয়া এই ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধাগোবিন্দ সেই পূর্ব্ব সম্পত্তি পুনর্ব্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় যত অল্পদিন মনে হইল আসলে ততটা নয়। ইতি-মধ্যে প্রায় দশবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্ব্বপ্রান্তে প্রৌঢ় বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তররুদ্ধ মান-সিক উত্তাপের বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্দ্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন, তখন কি জানি কেন, আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারি-লেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়—সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধা-গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল ভাই?" রাধাগোবিন্দ বলিলেন "অবশ্য, শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈ কি!"

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোট বড় সকলেই খাইয়া গেল, ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখীকাঙালগণ পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্য্যে তিন চারি দিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না—তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল—বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "বড় শক্ত ব্যাধি।"

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধাগোবিন্দ কহিলেন "দাদা, তোমার অবর্ত্ত-মানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব সেই উপদেশ দিয়া যাও।" শশিভূষণ কহিলেন "ভাই, আমার কি আছে যে কাহাকে দিব!" রাধাগোবিন্দ কহিলেন "সবই ত তোমার!" শশিভূষণ উত্তর দিলেন "এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।" রাধাগোবিন্দ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। রাধাগোবিন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা দু'টি ধরিয়া কহিল "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করি-য়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর ত সময় নাই।" শশিভূষণ কোন উত্তর করিলেন না—রাধাগোবিন্দ বলিয়া গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল। "দাদা, আমার ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে ভাব সে অন্ত-র্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে ত হয় ত তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ

ছিল, তুমি ধনী আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম সেই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সে প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুঠ করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।”

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, “ভাই, ভালই করিয়াছিলে। কিন্তু যে জন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল? কাছে কি রাখিতে পারিলে? দয়াময় হরি!” বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। রাধাগোবিন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল “দাদা, মাপ করিলে ত।” শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন “ভাই, তবে শোন। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।” রাধাগোবিন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে কহিল—“দাদা, মাপ যদি করিয়াছ, তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ কর। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়োনা।”

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে—রাধাগোবিন্দের মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। তাহাতে কি বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধাগোবিন্দ বুঝিয়া থাকিবে।

ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা।

দ্বাপরযুগে অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহভেদ করিবার সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু নির্গমনের পথ বাহির করিতে পারেন নাই, কলিযুগে ইংরাজি শিক্ষায় নব্যবঙ্গেরও কতকটা সেই দশা—আমরা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম, কিন্তু সেই জ্ঞান সাধারণ্যে প্রচার করিবার পথ খুঁজিয়া পাই না। ইংরাজি শিক্ষাও আবার শুধু জ্ঞানটুকুমাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, স্বদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া দিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়। কিন্তু বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষায় কোনরূপ শিক্ষা না পাইয়া তাহাতে নূতনলব্ধ জ্ঞান ব্যক্ত করা কঠিন হইয়া উঠে। হইয়াছে যেন নাবালকের বিষয়প্রাপ্তির মত, অল্পস্বল্প ভোগ করা চলে কিন্তু দানবিক্রয়ের ক্ষমতা নাই।

অনেকে সেইজন্য মনে করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষাটাকে কেবলমাত্র ঘরকন্নার কাজে লাগাইয়া, সাহিত্য এবং জ্ঞানালোচনার ভাষা ইংরাজি করিলেই কোন গোল থাকে না। তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষায় ভাব ব্যক্ত করিবার আর আবশ্যকই থাকে না। এবং শিক্ষার বিস্তারের সহিত অল্পে অল্পে ইংরাজি ভাষায় দেশ ছাইয়া ফেলে। এইরূপে প্রাদেশিক ভাষার বিলোপে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যসাধনের পথও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে।

বাস্তবিক যদি ইহা সম্ভবপর হয়, হউক্;—শিশু বঙ্গভাষাকে সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়া ভারতবর্ষের উন্নতিস্রোত রোধ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? কিন্তু ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন যদি দেশের সর্ব্বসাধারণের উন্নতিকে বাদ দিয়া না হয়, তাহা

হইলে বোধ করি, সাধারণপ্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র শিক্ষিতজনবোধ্য বিদেশীয় ভাষা অবলম্বনে বিশেষ সুবিধা হয় না। কারণ, শিক্ষাবলে সমাজের এক অংশ যে ভাবে গঠিত হইতে থাকে, বিদেশী ভাষার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া অপর অংশে সে ভাবের প্রবাহ সহজে পঁহুছে না; এইরূপে ভাষাভেদে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবপ্রবাহসঞ্চার বন্ধ হইয়া গিয়া প্রত্যেক অঙ্গ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সমগ্র সমাজদেহের সম্যক পুষ্টিসাধনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

প্রাচীন ভারতে বিস্তৃত শূদ্রসমাজ যে ব্রাহ্মণজনোচিত জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিল,সে কেবল মনুর বিধানগুণে নহে, কিন্তু সংস্কৃতভাষার দুর্ভেদ্য দুর্গে জ্ঞানের বিজন অবরোধই তাহার প্রধান কারণ। সমভাষায় যে ভাব অনুশীলিত হয়, শিক্ষিতদের হৃদয়শিখর হইতে নামিয়া স্বাভাবিক নিয়মে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নিঃশব্দে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং সম্যক্ আয়ত্ত না হইলেও সাধারণের উপর তাহার একটা মোটামুটি প্রভাব থাকিয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত তখন কেবলমাত্র সাহিত্যের ভাষা, শিক্ষিতের ভাষা; রাজসভায় পণ্ডিতেরা বসিয়া তাহার আলোচনা করিতেন, চতুষ্পাঠীতে ছাত্রেরা মিলিয়া অধ্যাপকের নিকট তাহার ব্যাকরণ শিক্ষা করিত; এখন যেমন ইংরাজি না জানিলে সমাজে প্রতিপত্তি হয় না, তখন সেইরূপ সংস্কৃত না শিখিলে সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিত। সাধারণ লোকের সংস্কৃতভাষার সহিত সুতরাং বড় একটা সংস্পর্শ ছিল না। তাহারা জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে প্রচলিত ভাষায় তুচ্ছপ্রসঙ্গের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

কিন্তু বুদ্ধদেব আসিয়া যখন দেশের সর্ব্বসাধারণকে বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক অহ্বান করিলেন, সম্ভ্রান্ত সংস্কৃত ছাড়িয়া তাঁহাকে পালির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ফল হইল যে, ব্রাহ্মণশাসনের সংস্কৃত বেড়া কাজে লাগিল না, এবং দেখিতে দেখিতে দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভাব বায়ুতাড়িত বহ্নিশিখার ন্যায় হুহুশব্দে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

চৈতন্যও যখন বাঙ্গলা দেশের গৃহে গৃহে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইলেন, প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃতশাস্ত্র রচনা না করিয়া বঙ্গসন্তানকে তিনি তাহার মাতৃভাষায় আহ্বান করিলেন—নির্জ্জীব বঙ্গসমাজও আলোড়িত হইয়া উঠিল। এবং নবদ্বীপের সমস্ত শুষ্ক পাণ্ডিত্য সে বৈষ্ণবপ্রেমের প্রবাহ রোধ করিতে পারিল না।

কেবলমাত্র শিক্ষিতবোধ্য ভাষা যতই সম্পূর্ণ এবং সম্ভ্রান্ত হউক্ না কেন, প্রেমের সহজ ভাষার নিকট তাহা চিরদিনই নিষ্ফল। প্রেমের ভাষা আমাদের মাতৃভাষা—মাতৃস্তন্যের সহিত প্রতিদিন যাহা পান করিয়া পিতৃপিতামহক্রমে আমরা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছি।

বাঙ্গলা লেখকেরাও তাই বুদ্ধ এবং চৈতন্যের পদানুসরণ করিয়া স্বদেশীয় ভাষার মধ্য দিয়া একটা নূতন জীবনপ্রবাহ আনিয়া বঙ্গসমাজের সর্ব্বাঙ্গে একটা স্পন্দন সঞ্চার করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাদের সাহিত্যে এখন অল্পে অল্পে আমাদের নবোদ্ভিন্ন জাতীয়তা অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্য জীবনকে এবং জীবন সাহিত্যকে প্রতিদিন নিঃশব্দে গড়িয়া তুলিতেছে। এবং পরস্পরের সহায়তায় উভয়েরই স্থায়িত্বের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারে যাঁহারা প্রাদেশিক ভাষার বিনাশ-

সম্ভাবনা কল্পনা করেন, তাঁহাদের সেই বহুযত্নপোষিত আশার বিরুদ্ধে এক প্রধান উদাহরণ এই নব্য বঙ্গসাহিত্য। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যখন গ্রাম্য বলিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে উপেক্ষা করিতেন, ইংরাজিশিক্ষিতেরাই তখন বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়া এই বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চার করেন এবং সেই ইংরাজি-শিক্ষিতেরাই এপর্য্যন্ত অবিশ্রাম যত্নে ইহাকে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

শুধু বাঙ্গলা দেশ বলিয়া নহে, ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে ইংরাজিশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, সেইখানেই ইংরাজিশিক্ষিতদের যত্নে সাহিত্যবদ্ধ হইয়া প্রাদেশিক ভাষার স্থায়িত্বলাভ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহারাষ্ট্রী, গুজরাটি হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতে ইংরাজি শিক্ষার বাতাসে সাহিত্যের নব নব অঙ্কুর উদ্গত হইয়া উঠিতেছে। তবে বাঙ্গলা দেশেই ইংরাজি শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়, সেই-জন্য বঙ্গসাহিত্যই অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনায় অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বত্রই যদি ইংরাজির শুভাগমনে দেশীয় সাহিত্যের এইরূপ অভ্যুদয় দেখা যায়, তাহা হইলে ইংরাজি শিক্ষাকেই প্রাদে-শিক ভাষার উন্নতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বোধ হয় না। বাস্তবিকও তাহাই। ইংরাজি শিক্ষায় মানবহৃদয়ে ভাবপ্রকাশ ও জ্ঞানবিস্তারের যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, ইহা তাহারই অনিবার্য্য ফল। নহিলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিয়া সুদূর যশোবিস্তার, রাজসম্মান বা অর্থাগমের কিছুমাত্র সুবিধা হয় না; এবং দেশের লোকেও ইংরাজি লেখককে যেরূপ সুম্মানে পথ ছাড়িয়া দেয়, বাঙ্গলা লেখককে দেখিলে তাদৃশ সসঙ্কোচ সম্ভ্রম অনুভব করে না।

মনে করা যাক্ একসময় ইংরাজি ভাষাই দেশের বালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে প্রচলিত হইবে, কিন্তু সে দিন যে বহুদূরে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে দেশের যে বৃহৎ অংশ ইংরাজি না জানে তাহাদের কি গতি হইবে? তাহারা কি জ্ঞানলাভের জন্য সেই দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবে? যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহারা কখনই আপন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভ্রাতাভগিনীদিগের প্রতি এতকাল উদাসীন হইয়া থাকিবেন না; তাঁহারা নিজে যাহা বুঝিতেছেন অন্য লোককে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন এবং সেই চেষ্টাতেই দেশীয় সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিবে এবং পরিপুষ্ট হইবে। এইরূপে দেশীয় সাহিত্যের যতই পরিণতি হইতে থাকিবে, বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের আশা ততই সুদূরপরাহত হইবে। সংক্ষেপে বলিলে ইহা একটি স্বতোবিরোধী বচনের মত শুনিতে হইবে;—আমরা যত ইংরাজি শিখিব ততই দেশী সাহিত্য বিস্তৃত হইবে, এবং দেশী সাহিত্য যতই বিস্তৃত হইবে ততই ভবিষ্যতে ইংরাজি ভাষা ব্যাপ্তির ব্যাঘাত করিবে।

আরও, ইংরাজিকেই যদি কাহারও আদেশানুসারে আমাদের সাহিত্যের ভাষা করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেই কি সাহিত্য সেই মহামহিমের আদেশ পালন করিবে? সে আশা দুরাশা মাত্র। ইংরাজি সাহিত্যের কোথাও আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিবে না। তোতাপাখীর মত আমরা সে সাহিত্যকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যে সাহিত্য স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের অন্তরের উত্তাপে আপনি ব্যক্ত হইয়া উঠে, তাহার প্রত্যেক কথার সহিত আমাদের জীবনের যেমন এক চিরন্তন নিগূঢ় যোগ থাকিয়া যায়, পরিপূর্ণ ইংরাজি সাহি-

ত্যের সহিত আমাদের জীবনের সেরূপ অবিচ্ছেদ্য যোগ সাধিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, ইংরাজি সাহিত্য আমাদের জাতীয়তা বিকাশের ফল নহে, এবং দেশে, কালে, সকল বিষয়েই তাহা আমাদের সুখদুঃখের বাহির, সুতরাং স্বদেশীয় সাহিত্যের মত আমাদের জীবনগঠনে ইহার প্রভাবও তেমন অমোঘ নহে।

ইহা কেবলমাত্র কল্পনা নহে। ফরাসী ভাষায় সাহিত্যরচনা যখন জর্ম্মণদেশের প্রথা ছিল, তখনকার জর্ম্মণির সাহিত্য শুনা যায়, কেবলমাত্র ফরাসী সাহিত্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিমাত্র—তাহার মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই, জর্ম্মণ বল নাই, কেবল কতকগুলি পরিপাটি অনুকরণ এবং নির্ভুল ব্যাকরণলীলা। কিন্তু জর্ম্মণেরা যখন দেশীয় ভাষায় সাহিত্যানুশীলন সুরু করিল, তখন জর্ম্মণির গৌরবে য়ুরোপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। এখন এই ভারতবর্ষের দূরপ্রান্তেও জর্ম্মণ কবির গাথা শিক্ষিতজনের চিত্তহরণ করে।

ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না করিলেও একথা স্বীকার করিতে হয় যে, ইংরাজি এদেশের সর্ব্বসাধারণের ভাষা হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এবং য়ুরোপীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহার অনুকূল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ফ্রান্স এবং স্পেন যখন রোমক শাসনের অধীন ছিল, তখন উক্ত দেশের ভদ্রসমাজের রোমীয় আচার ব্যবহারের সহিত লাটিন ভাষাও প্রচলিত ছিল, এবং রোমকেরা কখনও তত্তৎ দেশের ভাষার উন্নতিসাধনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু ফ্রান্স এবং স্পেনের ভাষা লাটিন হইল না—জাতীয় জীবনবিকাশের সহিত ধীরে ধীরে জাতীয় সাহিত্য মুকুলিত হইয়া উঠিল। গ্রীস যখন রোমের অধীনতা স্বীকার করে, তখন তাহার পূর্ব্বগৌরব কিছুই নাই, লাটিন ভাষা এবং লাটিন সাহিত্যই সর্ব্বত্র প্রবল এবং তৎকালীন

গ্রীক লেখকেরা লাটিন লেখকদিগের তুলনায় অতি হীন, তথাপি লাটিন গ্রীকের স্থান অধিকার করিতে পারিল না। তাহার পরেও বহুবৎসরের তুরস্কশাসন গ্রীসকে নির্বীর্য্য করিয়া রাখিয়াছিল। এই শতাব্দীকালমাত্র গ্রীস আপন লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত দারুণ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও পরাধীন গ্রীস আপন মাতৃভাষাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্য যদিও গ্রীক সাহিত্যের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ নহে, তথাপি সে দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিবে, কারণ, দেশের মাটির মধ্যে তাহার শিকড় আছে। স্কুল কালেজে একমাত্র ইংরাজিতেই শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয় বটে, তাহার ফলে বঙ্গসন্তানের জীবনে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে না। কিন্তু দেশের ভাষা বাঙ্গলাই থাকিয়া যায়। বাহিরের কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় ভাষণপ্রসঙ্গে কিম্বা পত্রব্যবহারে বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিলেও বাড়িতে আসিয়া মা,বোন,স্ত্রী কন্যার সহিত ইংরাজিতে স্নেহপ্রীতির আদান প্রদান চলে না। এবং বিবাহের পূর্ব্বে বাঙ্গলা বই কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিতে রাজি না হইলেও গৃহিণীর শুভাগমন হইতে অনেক ইংরাজিনবীশের বাঙ্গলা গ্রন্থের সহিত পরিচয়ও সাধিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের ভরসাও সেইখানে। বঙ্গসাহিত্য আমাদের অন্তঃপুরেই প্রতিদিন জীবনে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়া নিঃশব্দে দেশের সর্ব্বত্র তাহার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ডায়ারি।

সমীরণ এক সমস্যা উত্থাপিত করিলেন, তিনি বলিলেন— ইংরাজি সাহিত্যে গদ্য অথবা পদ্য কাব্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। ডেস্‌ডিমোনার নিকট ওথেলো এবং ইয়াগো কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে, ক্লিয়োপাট্রা আপনার শ্যামল বঙ্কিম বন্ধনজালে অ্যাণ্টনিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি লতাপাশবিজড়িত ভগ্ন-মন্দিরের ন্যায় অ্যাণ্টনির উচ্চতা সর্ব্বসমক্ষে দৃশ্যমান রহিয়াছে। ল্যামার্ম্মূরের নায়িকা আপনার সকরুণ, সরল সুকুমার সৌন্দর্য্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক না কেন, রেভ্‌ন্‌স্‌উডের বিষাদ-ঘনঘোর নায়কের নিকট হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী এবং সূর্য্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ম্ময়ী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়। প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যেও দেখ।—বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সজীব মূর্ত্তি যদি কাহারও থাকে তবে সে কেবল বিদ্যার ও মালিনীর, সুন্দর-চরিত্রে পদার্থের লেশমাত্র নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান। ইহার কারণ কি?

সমীরণের এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য স্রোতস্বিনী

অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন এবং দীপ্তি নিতান্ত অমনোযোগের ভাণ করিয়া টেবিলের উপর একটা গ্রন্থ খুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

ক্ষিতি কহিলেন, তুমি বঙ্কিম বাবুর যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছ সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্য্যপ্রধান নহে। মানস জগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্য্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন? কার্য্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।

দীপ্তি আর থাকিতে পারিল না—গ্রন্থটি ঠেলিয়া ফেলিয়া এবং ঔদাসীন্যের ভাণ পরিহার করিয়া বলিয়া উঠিল—কেন? দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলার চরিত্র কি কার্য্যেই বিকশিত হয় নাই? এমন নৈপুণ্য, এমন তৎপরতা এমন অধ্যবসায় উক্ত উপন্যাসের কয় জন নায়ক দেখাইতে পারিয়াছে? আনন্দমঠ ত কার্য্যপ্রধান উপন্যাস। সত্যানন্দ, জীবানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্তানসম্প্রদায় তাহাতে কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কবির বর্ণনামাত্র, যদি কাহারো চরিত্রের মধ্যে যথার্থ কার্য্যকারিতা পরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা শান্তির। দেবীচৌধুরাণীতে কে কর্ত্তৃত্বপদ লইয়াছে? রমণী। কিন্তু সে কি অন্তঃপুরের কর্ত্তৃত্ব? নহে।

সমীরণ কহিলেন, ভাই ক্ষিতি, তর্কশাস্ত্রের সরলরেখার দ্বারা সমস্ত জিনিষকে পরিপাটিরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। সতরঞ্চ ফলকেই ঠিক লাল কালো রঙের সমান চক কাটিয়া ঘর আঁকিয়া দেওয়া যায়, কারণ, তাহা নির্জ্জীব কাষ্ঠমূর্ত্তির রঙ্গভূমি মাত্র। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বড় সীধা জিনিষ নহে, তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্ম্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয়

করিয়া দাও না কেন, বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্য্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট্‌পালট্‌ হইয়া যায়। সমাজের লৌহকটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত, তবে মনুষ্যের শ্রেণীবিভাগ ঠিক সমান অটলভাবে থাকিত; কিন্তু জীবন যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্‌ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নব নব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্ত্তমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব। তাহাকে সমালোচনশাস্ত্রের বিশেষণ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা মিথ্যা। হৃদয়বৃত্তিতে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিখিয়া পড়িয়া দিতে পারে না। ওথেলো ত মানসপ্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কি প্রচণ্ড! কিং লিয়ারে হৃদয়ের ঝটিকা কি ভয়ঙ্কর!

ব্যোম সহসা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আহা, তোমরা বৃথা তর্ক করিতেছ। যদি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে কার্য্যই স্ত্রীলোকের। কার্য্যক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্যত্র স্থান নাই। যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জ্জনবাসী। ক্যাল্‌ডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল পুরুষ যখন একাকী ঊর্দ্ধনেত্রে নিশীথ আকাশের গ্রহতারকার গতিবিধি নির্ণয় করিত, তখন সে কি সুখ পাইত? কোন্‌ নারী এমন অকাজে কালক্ষেপ করিতে পারে? যে জ্ঞান কোন কার্য্যে লাগিবে না কোন্‌ নারী তাহার জন্য জীবন ব্যয় করে? যে ধ্যান কেবলমাত্র সংসারনির্ম্মুক্ত আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দজনক, কোন্‌ রমণীর কাছে তাহার মূল্য আছে? ক্ষিতির কথামত পুরুষ যদি যথার্থ কার্য্যশীল হইত, তবে মনুষ্যসমাজের এমন উন্নতি হইত না— তবে একটি নূতন তত্ত্ব একটি নূতন ভাব বাহির হইত না। নির্জ্জ-

নের মধ্যে, অবসরের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ, ভাবের আবির্ভাব। যথার্থ পুরুষ সর্ব্বদাই সেই নির্লিপ্ত নির্জ্জনতার মধ্যে থাকে। কার্য্যবীর নেপোলিয়নও কখনই আপনার কার্য্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না; তিনি যখন যেখানেই থাকুন একটা মহা নির্জ্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন—তিনি সর্ব্বদাই আপনার একটা মস্ত আইডিয়ার দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া তুমুল কার্য্যক্ষেত্রের মাঝখানেও বিজনবাস যাপন করিতেন। ভীষ্ম ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের একজন নায়ক কিন্তু সেই ভীষণ জন-সংঘাতের মধ্যেও তাঁহার মত একক প্রাণী আর কে ছিল! তিনি কি কাজ করিতেছিলেন, না, ধ্যান করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকই যথার্থ কাজ করে। তাহার কাজের মাঝখানে কোন ব্যবধান নাই। সে একেবারে কাজের মধ্যে লিপ্ত জড়িত। সেই যথার্থ লোকালয়ে বাস করে, সংসার রক্ষা করে। স্ত্রীলোকই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গদান করিতে পারে, তাহার যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়, সে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে না।

দীপ্তি কহিল, তোমার সমস্ত সৃষ্টিছাড়া কথা—কিছুই বুঝিবার যো নাই। মেয়েরা যে কাজ করিতে পারে না এ কথা আমি বলি না, তোমরা তাহাদের কাজ করিতে দাও কই?

ব্যোম কহিলেন—স্ত্রীলোকেরা আপনার কর্ম্মবন্ধনে আপনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন আপনার ভস্ম আপনি সঞ্চয় করে, নারী তেমনি আপনার স্তূপাকার কার্য্যাবশেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত করিয়া ফেলে—সেই তাহার অন্তঃপুর—তাহার চারিদিকে কোন অবসর নাই। তাহাকে যদি ভস্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্য্যরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় তবে কি কম কাণ্ড হয়! পুরুষের সাধ্য কি তেমন দ্রুতবেগে তেমন

তুমুল ব্যাপার করিয়া তুলিতে! পুরুষের কাজ করিতে বিলম্ব হয়; সে এবং তাহার কার্য্যের মাঝখানে একটা দীর্ঘ পথ থাকে, সে পথ বিস্তর চিন্তার দ্বারা বিকীর্ণ। রমণী যদি একবার বহি-র্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূধূ করিয়া উঠে। এই প্রলয়কারিণী কার্য্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এই অগ্নিতে কেবল শয়নগৃহের সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছে, শীতার্ত্ত প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীর অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। যদি আমাদের সাহিত্যে এই সুন্দরী বহ্নিশিখাগুলির তেজ দীপ্যমান হইয়া থাকে তবে তাহা লইয়া এত তর্ক কিসের জন্য!

আমি কহিলাম আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীলোক যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

স্রোতস্বিনীর মুখ ঈষৎরক্তিম এবং সহাস্য হইয়া উঠিল। দীপ্তি কহিল, এ আবার তোমার বাড়াবাড়ি।

বুঝিলাম দীপ্তির ইচ্ছা আমাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বজাতির গুণগান বেশী করিয়া শুনিয়া লইবে। আমি তাহাকে সে কথা বলিলাম, এবং কহিলাম স্ত্রীজাতি স্তুতিবাক্য শুনিতে অত্যন্ত ভাল-বাসে। দীপ্তি সবলে মাথা নাড়িয়া কহিল, কখনই না।

স্রোতস্বিনী মৃদুভাবে কহিল—সে কথা সত্য। অপ্রিয় বাক্য আমাদের কাছে অত্যন্ত অধিক অপ্রিয় এবং প্রিয় বাক্য আমাদের কাছে বড় বেশী মধুর।

স্রোতস্বিনী রমণী হইলেও সত্যকথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আমি কহিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। গ্রন্থকারদের মধ্যে কবি এবং গুণীদের মধ্যে গায়কগণ বিশেষরূপে স্তুতিমিষ্টান্ন-

প্রিয়। শুনা যায়, টেনিস্‌ন্ যথেষ্ট জনাদরসত্ত্বেও লেশমাত্র অপ্রিয় সমালোচনা সহ্য করিতে পারিতেন না। এরূপ উদাহরণ আরো অনেক আছে। আসল কথা, মনোহরণ করা যাহাদের কাজ, প্রশংসাই তাহাদের কৃতকার্য্যতা পরিমাণের একমাত্র উপায়। অন্য সমস্ত কার্য্যফলের নানারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, স্তুতিবাদলাভ ছাড়া মনোরঞ্জনের আর কোন প্রমাণ নাই। সেইজন্য গায়ক প্রত্যেকবার সমের কাছে আসিয়া বাহবা প্রত্যাশা করে। সেইজন্য অনাদর গুণীমাত্রের কাছে এত অধিক অপ্রীতিকর।

সমীরণ কহিলেন—কেবল তাহাই নয়, নিরুৎসাহ মনোহরণকার্য্যের একটি প্রধান অন্তরায়। শ্রোতার মনকে অগ্রসর দেখিলে তবেই গায়কের মন আপনার সমস্ত ক্ষমতা বিকশিত করিতে পারে। অতএব, স্তুতিবাদ শুদ্ধ যে তাহার পুরস্কার তাহা নহে, তাহার কার্য্যসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ।

আমি কহিলাম, স্ত্রীলোকেরও প্রধান কার্য্য আনন্দদান করা। তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে সঙ্গীত ও কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিলে তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেইজন্যই স্ত্রীলোক স্তুতিবাদে বিশেষ আনন্দলাভ করে। কেবল অহঙ্কার পরিতৃপ্তির জন্য নহে, তাহাতে সে আপনার জীবনের সার্থকতা অনুভব করে। ত্রুটি অসম্পূর্ণতা দেখাইলে একেবারে তাহাদের মর্ম্মের মূলে গিয়া আঘাত করে। এইজন্য লোকনিন্দা স্ত্রীলোকের নিকট বড় ভয়ানক।

ক্ষিতি কহিলেন—তুমি যাহা বলিলে দিব্য কবিত্ব করিয়া বলিলে, শুনিতে বেশ লাগিল, কিন্তু আসল কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কার্য্যের পরিসর সঙ্কীর্ণ। বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ কালে

তাহার স্থান নাই। উপস্থিতমত স্বামীপুত্র আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীদিগকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই তাহার কর্ত্তব্য সাধিত হয়। যাহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র দূরদেশ ও দূরকালে বিস্তীর্ণ, যাহার কর্ম্মের ফলাফল সকলসময় আশু প্রত্যক্ষগোচর নহে, নিকটের লোকের ও বর্ত্তমান কালের নিন্দাস্তুতির উপর তাহার তেমন একান্ত নির্ভর নহে, সুদূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা অনাদর উপেক্ষা ও নিন্দার মধ্যেও তাহাকে অবিচলিত বল প্রদান করিতে পারে। লোকনিন্দা, লোকস্তুতি সৌভাগ্যগর্ব্ব এবং মান অভিমানে স্ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে তাহার প্রধান কারণ, জীবন লইয়া তাহাদের নগদ কারবার, তাহাদের সমুদায় লাভ লোকসান বর্ত্তমানে; হাতে হাতে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদের একমাত্র পাওনা; এইজন্য তাহারা কিছু কষাকষি করিয়া আদায় করিতে চায়, এক কানাকড়ি ছাড়িতে চায় না।

দীপ্তি বিরক্ত হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় বিশ্বহিতৈষিণী রমণীর দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। স্রোতস্বিনী কহিলেন, বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব সকল সময়ে এক নহে। আমরা বৃহৎ ক্ষেত্রে কার্য্য করি না বলিয়া আমাদের কার্য্যের গৌরব অল্প একথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। পেশী, স্নায়ু অস্থিচর্ম্ম বৃহৎ স্থান অধিকার করে, মর্ম্মস্থানটুকু অতি ক্ষুদ্র এবং নিভৃত। আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই মর্ম্মকেন্দ্রে বিরাজ করি। পুরুষদেবতাগণ বৃষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করেন, স্ত্রীদেবীগণ হৃদয়শতদলবাসিনী, তাঁহারা একটি বিকশিত ধ্রুব সৌন্দর্য্যের মাঝখানে পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন। পৃথিবীতে যদি পুনর্জ্জন্ম লাভ করি তবে আমি যেন পুন-

শীব নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। যেন ভিখারী না হইয়া অন্নপূর্ণা হই। একবার ভাবিয়া দেখ, সমস্ত মানবসংসারের মধ্যে প্রতিদিবসের রোগশোক, ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ; প্রতিমুহূর্ত্তে কর্ম্মচক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি কত স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে; প্রতিগৃহের রক্ষাকার্য্য কত অসীম প্রীতিসাধ্য; যদি কোন প্রসন্নমূর্ত্তি, প্রফুল্লমুখী, ধৈর্য্যময়ী লোকবৎসলা দেবী প্রতিদিবসের শিয়রে বাস করিয়া তাহার তপ্ত ললাটে স্নিগ্ধস্পর্শ সিঞ্চন করেন, আপনার কার্য্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রত্যেক মুহূর্ত্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন, এবং প্রত্যেক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রান্ত স্নেহে তাহার কল্যাণ ও শান্তি বিধান করিতে থাকেন, তবে তাঁহার কার্য্যস্থল সঙ্কীর্ণ বলিয়া তাঁহার মহিমা কে অস্বীকার করিতে পারে? যদি সেই লক্ষ্মীমূর্ত্তির আদর্শখানি হৃদয়ের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখি, তবে নারীজন্মের প্রতি আর অনাদর জন্মিতে পারে না।

ইহার পর আমরা সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এই অকস্মাৎ নিস্তব্ধতায় স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কথা কি বলিতেছিলে—মাঝে হইতে অন্য তর্ক আসিয়া সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

আমি কহিলাম—আমি বলিতেছিলাম, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা আমাদের পুরুষের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

ক্ষিতি কহিলেন, তাহার প্রমাণ?

আমি কহিলাম, প্রমাণ হাতে হাতে। প্রমাণ ঘরে ঘরে। এ সকল প্রমাণকে ঠিক আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে আনিয়া দাঁড় করান যায় না, প্রমাণ অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে হয়।

পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার সময় কোন কোন নদী দেখা যায়, যাহার অধিকাংশে তপ্ত শুষ্ক বালুকা ধূধূ করিতেছে—কেবল একপার্শ্ব দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ নদীটি অতি নম্র মধুর স্রোতে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই দৃশ্য দেখিলে আমাদের সমাজ মনে পড়ে। আমরা অকর্ম্মণ্য, নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হূহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং যে কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুই দিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর আমাদের বামপার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন এক ধ্রুব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহীন, ঐক্যহীন; সহস্র পদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম। যে দিকে জলস্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেইদিকে সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা, এবং যে দিকে আমরা, সেদিকে কেবল মরু চাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি। সমীর, তুমি কি বল?

সমীরণ স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিয়া কহিলেন—অদ্যকার সভায় নিজেদের অসারতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্ত্তিমতী বাধা বর্ত্তমান। আমি তাঁহাদের নাম করিতে চাহি না। বিশ্বসংসারের মধ্যে বাঙ্গালী পুরুষের আদর কেবল আপন অন্তঃপুরের মধ্যে। সেখানে তিনি কেবলমাত্র প্রভু নহেন, তিনি দেবতা। আমরা যে দেবতা নহি, তৃণ ও মৃত্তিকার পুত্তলিকামাত্র, সে কথা আমাদের উপাসকদের নিকট

প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি ভাই? ঐ যে আমাদের মুগ্ধ বিশ্বস্ত ভক্তটি আপন হৃদয়-কুঞ্জের সমুদয় বিকশিত সুন্দর পুষ্প-গুলি সোনার থালে সাজাইয়া আমাদের চরণতলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, ও কোথায় ফিরাইয়া দিব? আমাদিগকে দেব-সিংহাসনে বসাইয়া ঐ যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি আপন নিভৃত নিত্য প্রেমের নির্নিমেষ সন্ধ্যাদীপটি লইয়া আমাদের এই গৌরব-হীন মুখের চতুর্দ্দিকে অনন্ত অতৃপ্তিভরে শত সহস্রবার প্রদক্ষিণ করাইয়া আরতি করিতেছে, উহার কাছে যদি খুব উচ্চ হইয়া না বসিয়া রহিলাম, নীরবে পূজা না গ্রহণ করিলাম তবে উহা-দেরই বা কোথায় সুখ আর আমাদেরই বা কোথায় সম্মান! যখন ছোট ছিল তখন মাটির পুতুল লইয়া এম্‌নিভাবে খেলা করিত যেন তাহার প্রাণ আছে, যখন বড় হইল তখন মানুষ-পুতুল লইয়া এম্‌নি ভাবে পূজা করিতে লাগিল যেন তাহার দেবত্ব আছে—তখন যদি কেহ তাহার খেলার পুতুল ভাঙ্গিয়া দিত তবে কি বালিকা কাঁদিত না, এখন যদি কেহ ইহার পূজার পুতুল ভাঙ্গিয়া দেয় তবে কি রমণী ব্যথিত হয় না? যেখানে মনুষ্যত্বের যথার্থ গৌরব আছে সেখানে মনুষ্যত্ব বিনা ছদ্মবেশে সম্মান আকর্ষণ করিতে পারে, যেখানে মনুষ্যত্বের অভাব সেখানে দেবত্বের আয়োজন করিতে হয়। পৃথিবীতে কোথাও যাহাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা নাই তাহারা কি সামান্য মানবভাবে স্ত্রীর নিকট সম্মান প্রত্যাশা করিতে পারে? কিন্তু আমরা যে এক একটি দেবতা, সেইজন্য এমন সুন্দর সুকুমার হৃদয়গুলি লইয়া অসঙ্কোচে আপনার পঙ্কিল চরণের পাদপীঠ নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছি।

দীপ্তি কহিলেন, যাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে সে মানুষ হইয়া

দেবতার পূজা গ্রহণ করিতে লজ্জা অনুভব করে এবং যদি পূজা পায় তবে আপনাকে সেই পূজার যোগ্য করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু বাঙ্গলা দেশে দেখা যায়, পুরুষসম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লজ্জভাবে আস্ফালন করে। যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশী। আজকাল স্ত্রীদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন। আজকাল নৈবেদ্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে। কিন্তু পত্নীদিগকে পূজা করিতে শিখানো অপেক্ষা পতিদিগকে দেবতা হইতে শিখাইলে কাজে লাগিত। পতিদেবপূজা হ্রাস হইতেছে বলিয়া যাঁহারা আধুনিক স্ত্রীলোকদিগকে পরিহাস করেন, তাঁহাদের যদি লেশমাত্র রসবোধ থাকিত তবে সে বিদ্রূপ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের নিজেকে বিদ্ধ করিত! হায় হায়, বাঙ্গালীর মেয়ে পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্যই করিয়াছিল তাই এমন দেবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে! কি বা দেবতার শ্রী! কিবা দেবতার মাহাত্ম্য!

স্রোতস্বিনীর পক্ষে ক্রমে অসহ্য হইয়া আসিল। তিনি মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—তোমরা উত্তরোত্তর সুর এম্নি নিখাদে চড়াইতেছ যে, আমাদের স্তবগানের মধ্যে যে মাধুর্য্যটুকু ছিল তাহা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। এ কথা যদি বা সত্য হয় যে, আমরা তোমাদের যতটা বাড়াই তোমরা তাহার যোগ্য নহ, তোমরাও কি আমাদিগকে অযথারূপে বাড়াইয়া তুলিতেছ না? তোমরা যদি দেবতা না হও, আমরাও দেবী নহি। আমরা যদি উভয়েই আপোষের দেবদেবী হই, তবে আর ঝগড়া করিবার প্রয়োজন কি? তা'ছাড়া আমাদের ত সকল গুণ নাই—হৃদয়মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে ত তোমরা বড়।

আমি কহিলাম—মধুর কণ্ঠস্বরে এই স্নিগ্ধ কথাগুলি বলিয়া তুমি বড় ভাল করিলে, নতুবা দীপ্তির বাক্যবাণবর্ষণের পর সত্যকথা বলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। দেখি, তোমরা কেবল কবিতার মধ্যে দেবী, মন্দিরের মধ্যে আমরা দেবতা। দেবতার ভোগ যাহা কিছু সে আমাদের, আর তোমাদের জন্য কেবল মনুসংহিতা হইতে দুইখানি কিম্বা আড়াইখানি মাত্র শ্লোক আছে। তোমরা আমাদের এমনি দেবতা যে, তোমরা যে সুখস্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী এ কথা মুখে উচ্চারণ করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সমগ্র পৃথিবী আমাদের, অবশিষ্টভাগ তোমাদের; আহারের বেলা আমরা, উচ্ছিষ্টের বেলা তোমরা। প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের এবং দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ, রোগের শয্যা এবং বাতায়নের প্রান্ত তোমাদের! আমরা দেবতা হইয়া সমস্ত পদসেবা পাই এবং তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পদপীড়ন সহ্য কর—প্রণিধান করিয়া দেখিলে এ দুই দেবত্বের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। এই ত গেল দেবদেবীর কথা। বুদ্ধিবৃত্তিতে বাঙ্গলাদেশে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমার এই মত; এদেশে শিক্ষিত মেয়েরা শিক্ষিত পুরুষের অপেক্ষা যথার্থ সুশিক্ষিত হয় এই আমার ধারণা। আমাদের শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে এমন একটা মূঢ় অহমিকা আছে যে, তাহারা আপনাদের বাড়াবাড়িটা বুঝিতে পারে না, হয় ত কুড়ানো পেখম পুচ্ছে বাঁধিয়া আস্ফালন করিবার হাস্যজনকতা অনুভব করে না, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা কেমন সহজে শোভনভাবে আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, কেমন সংযম ও সৌন্দর্য্যের সহিত সমস্ত আতিশয্য পরিহার করেন।

সমীরণ কহিলেন,—দেখনা, আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী কোট প্যাণ্ট্‌লুন্‌ পরিয়া বাহির হইয়াছেন এবং স্ত্রী সাড়ি পরিয়া তাহার পার্শ্বে আসীন। একজন পরের পরিচ্ছদে বড়াই করিয়া বেড়াইতেছেন, আর একজন নিজের পরিচ্ছদে কেমন একটি সংযত সম্ভ্রমে বিরাজ করিতেছেন। কেবল সাজসজ্জা নহে, উভয়ের মনের ভাবেরও সেই প্রভেদ। একজন আপনার নূতন শিক্ষাটা লইয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না, সবসুদ্ধ কেমন কিম্ভূত কিমাকার হইয়া উঠে এবং অন্ধ অহঙ্কারে নিজে তাহা বুঝিতেও পারে না। আর একজন আপনার শিক্ষাটিকে কেমন আপনার ভূষণ করিয়া তুলিতে পারেন, কেমন আপনার কর্ত্তব্যের সঙ্গে,হৃদয়ের সঙ্গে, চারিদিকের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারেন। স্বামী যেখানে মচ্‌মচ্‌ খট্‌খট্‌ হুট্‌মুট্‌ করিয়া বেড়ায়, চতুর্দ্দিককে সাহেবি-ভাবে অবজ্ঞা করিয়া আপন প্রাধান্য প্রচার করে, স্ত্রী সেখানে কেমন বিনম্র মধুরভাবে চারিপার্শ্বের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রভেদ যে কেবলমাত্র স্ত্রীচরিত্রের স্বাভাবিক কমনীয়তাবশতঃ তাহা নহে, আমাদের নারীদের মধ্যে একটি প্রকৃতিগত সুবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা আছে। বঙ্গসাহিত্যে স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্য, তাহার কারণ, বঙ্গসমাজে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য।

আমি কহিলাম, তাহার একটা কারণ বঙ্গদেশে পুরুষের কোন কাজ নাই। এদেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছু নাই, সেই গৃহ গঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ভালমন্দ সমস্ত শক্তি স্ত্রীলোকের হাতে। আমাদের রমণীরা সেই শক্তি চিরকাল চালনা করিয়া আসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছিপ্‌ছিপে তক্‌তকে ষ্টীমনৌকা যেমন বৃহৎ বোঝাইভরা গাধাবোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া

চলে, তেমনি আমাদের দেশের গৃহিণী, লোকলৌকিকতা আত্মীয় কুটুম্বিতাপরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার এবং স্বামী নামক একটি চলৎ-শক্তিরহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন। অন্য দেশের পুরুষেরা সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড় বড় পুরুষোচিত কার্য্যে বহুকাল ব্যাপৃত থাকিয়া নারীদের হইতে স্বতন্ত্র একটি প্রকৃতি গঠিত করিয়া তোলে। আমাদের দেশের পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত; কোন বৃহৎভাব, বৃহৎকার্য্য, বৃহৎক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই; অথচ অধীনতার নিপীড়ন, দাসত্বের হীনতা, দুর্ব্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদের নতশিরে সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে পুরুষের কোন কর্ত্তব্য করিতে হয় নাই এবং কাপুরুষের সমস্ত অপমান বহিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোককে কখনো বাহিরে গিয়া কর্ত্তব্য খুঁজিতে হয় না, তরুশাখায় ফলপুষ্পের মত কর্ত্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যখনি ভালবাসিতে আরম্ভ করে, তখনি তাহার কর্ত্তব্য আরম্ভ হয়; তখনি তাহার চিন্তা, বিবেচনা, যুক্তি, কার্য্য, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠে; তাহার সমস্ত চরিত্র উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে। বাহিরের কোন রাষ্ট্রবিপ্লব তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত করে না, তাহার গৌরব হ্রাস করে না, জাতীয় অধীনতার মধ্যেও তাহার তেজ রক্ষিত হয়।

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, আজ আমরা একটি নূতন শিক্ষা ও বিদেশী ইতিহাস হইতে পুরুষকারের নূতন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ভিজা কাঠ জ্বলে না, মরিচাধরা চাকা চলে না; যত জ্বলে তার চেয়ে ধোঁয়া বেশী হয়, যত চলে তাহার চেয়ে

শব্দ বেশী করে। আজ তোমাদের উজ্জ্বলতা, তোমাদের সহজ সুন্দর গতিশক্তি দেখিয়া আমরা লজ্জিত হইতেছি। আমরা চির-দিন অকর্ম্মণ্যভাবে কেবল দলাদলি, কানাকানি হাসাহাসি করিয়াছি, তোমরা চিরকাল তোমাদের কাজ করিয়া আসিয়াছ। এইজন্য শিক্ষা তোমরা যত সহজে যত শীঘ্র গ্রহণ করিতে পার, আপনার আয়ত্ত করিতে পার, তাহাকে আপনার জীবনের মধ্যে প্রবাহিত করিতে পার, আমরা তেমন পারি না। তাহার কারণ, চরিত্র বলিয়া তোমাদের একটা নিজের জিনিষ আছে, একটা পাত্র আছে। নিজের জিনিষ না থাকিলে পরের জিনিষ গ্রহণ করা যায় না, এবং গ্রহণ করিয়া আপনার করা যায় না। এইজন্য আমাদের শিক্ষিত স্ত্রীলোকদের অনুরূপ শিক্ষিত পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য এখনো আমাদের ভার তোমাদিগকে লইতে হইবে। আমাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে, আমাদের বাহ্যাড়ম্বর দূর করিতে, আমাদের আতিশয্য হ্রাস করিতে, আমাদের মিথ্যা দর্প চূর্ণ করিতে, আমাদের বিশ্বাস সজীব রাখিতে এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশকালের সহিত আমাদের সামঞ্জস্যসাধন করাইয়া দিতে হইবে। এক কথায়, দেশের সমুদায় গাধাবোটগুলিকে এখনো তোমাদের জিম্মায় লইতে হইবে। ইহারা একটু একটু বাক্য-বায়ুর পাল উড়াইতে শিখিয়াছে বলিয়া যে মস্ত হইয়াছে তাহা মনে করিয়ো না—ইহাদের মধ্যে একটা আত্মশক্তি, একটা আত্মসম্মান, একটা সুনিয়মিত তেজোরাশির আবশ্যক। গলায় সাহেবী "টাই" এবং পৃষ্ঠে সাহেবের থাব্‌ড়া আমাদের পক্ষে সম্মানকর নহে, কখনো মধুরস্বরে কখনো তীব্রকণ্ঠে এই শিক্ষা তোমরা না দিলে আর উপায় দেখি না। এই পোষা পশুর গলার

চক্‌চকে শিকলটি কাটিয়া দাও এবং ইহার দীর্ঘ কর্ণটি ধরিয়া তন্মধ্যে এই মন্ত্রটি প্রবেশ করাইয়া দাও যে, অন্নব্যঞ্জন যেমন আহার করিবার পক্ষেই পবিত্র কিন্তু কপালে মাথায় লেপিয়া অন্নশালী বলিয়া পরিচয় দিবার পক্ষে অপবিত্র, শিক্ষা তেমনি গায়ে মাথায় মাখিবার নহে, জীর্ণ করিয়া মনের উন্নতিসাধন করিবার এবং কাজে খাটাইবার।

স্রোতস্বিনী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, যদি বুঝিতে পারিতাম আমাদের কিছু করিবার আছে এবং কি উপায়ে কি কর্ত্তব্যসাধন করা যায়, তাহা হইলে আর কিছু না হোক্ চেষ্টা করিতে পারিতাম।

আমি কহিলাম, আর ত কিছু করিতে হইবে না। যেমন আছ তেমনি থাক। লোকে দেখিয়া বুঝিতে পারুক্, সত্য, সরলতা, শ্রী যদি মূর্ত্তি গ্রহণ করে তবে তাহাকে কেমন দেখিতে হয়। যে গৃহে লক্ষ্মী আছে, সে গৃহে বিশৃঙ্খলা কুশ্রীতা নাই। আজকাল আমরা যে সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর হস্ত নাই এইজন্য তাহার মধ্যে বড় বিশৃঙ্খলা, বড় বাড়াবাড়ি—তোমরা শিক্ষিতা নারীরা তোমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য লইয়া যদি এই সমাজের মধ্যে এই অসংযত কার্য্যস্তূপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও তবেই ইহার মধ্যে লক্ষ্মী স্থাপনা হয়, তবে অতি সহজেই সমস্ত শোভন, পরিপাটি এবং সামঞ্জস্যবদ্ধ হইয়া আসে।

স্রোতস্বিনী আর কিছু না বলিয়া সকৃতজ্ঞ স্নেহদৃষ্টির দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিয়া গৃহকার্য্যে চলিয়া গেল।

সভাভঙ্গ।

গাহিছে কাশিনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি স্বর
সাতটি যেন পোষা পাখী।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন্ কোথা যায় না পাই দিশা,
বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি' দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক্ মানে
সঘনে বলে বাহা বাহা!

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায়
কাঠের মত বসি আছে।
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান
ভাল না লাগে তার কাছে
বালকবেলা হ'তে তাহারি গীতে
দিল সে এতকাল যাপি',
বাদল দিনে কত মেঘের গান,
হোলির দিনে কত কাফি!
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে,
গেয়েছে বিজয়ার গান,

হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে
ভাসিয়া গেছে দুনয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে
সভার গৃহ গেছে পূরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা
ভূপালী মূলতানী সুরে।
ঘরেতে বারবার এসেছে কত
বিবাহ-উৎসব রাতি,
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস
জ্বলেছে শত শত বাতি,
বসেছে নব বর সলাজ মুখে
পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে
সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি তার বরজলাল
ধরেছে সাহানার সুর ;—
সে সব দিন আর সে সব গান
হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই
মর্ম্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে
নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু
কাশির বৃথা মাথা নাড়া,

সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়
হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে, ক্ষণেক তরে
বিরাম মাগে কাশিনাথ।
বরজলাল পানে প্রতাপ রায়
হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ,
কহিল, "ওস্তাদ জি,
গানের মত গান শুনায়ে দাও,
এরে কি গান বলে, ছি!
এ যেন পাখী লয়ে বিবিধ ছলে
শিকারী বিড়ালের খেলা!
সেকালে গান ছিল একালে হায়
গানের বড় অবহেলা!"

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ
শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি' সবে, সভার মাঝে
আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে
তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি'
ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায়
বৃহৎ সভাগৃহকোণে,

ক্ষুদ্র পাখী যথা ঝড়ের মাঝে
উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপ রায়
দিতেছে শত উৎসাহ—
"আহাহা, বাহা বাহা!"—কহিছে কানে
"গলা ছাড়িয়া গান গাহ!"

সভার লোকে সবে অন্যমনা,
কেহ কানাকানি করে।
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
কেহ বা চলে' যায় ঘরে।
"ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান"
ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি' কেহ বা বলে
"গরম আজি অতিশয়!"
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক,
ক্ষণেক নাহি রহে চুপ;
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা
শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়,
তুফান মাঝে ক্ষীণ তরি;
কেবল দেখা যায় তানপুরায়
আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হ'তে গানের সুর
উছসি উঠে নিজ সুখে

হেলার কলরব শিলার মত
চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ,
দু'দিকে ধায় দুইজনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান
বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের ভ্রমে
হারায়ে গেল কি করিয়া!
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে
লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে' যায়, পড়ে না মনে,
সরমে মস্তক নাড়ি'
আবার সুরু হতে ধরিল গান
আবার ভুলি দিল ছাড়ি'।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত,
স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন
বাতাসে দীপ নেবে-নেবে!
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া
রাখিল সুরটুকু ধরি',
সহসা হাহা রবে উঠিল কাঁদি
গাহিতে গিয়ে হা-হা করি'!
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা,
কোথায় তাল গেল ভাসি,'

গানের সুতা ছিঁড়ি' পড়িল খসি'
অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপুরার পরে
রাখিল লজ্জিত মাথা,
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে
বাল্য ক্রন্দন-গাথা।
নয়ন ছলছল প্রতাপ রায়
কর বুলায় তার দেহে।
"আইস, হেথা হ'তে আমরা যাই",
কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক দীপজ্বালা নয়ন-ভরা
ছাড়ি সে উৎসব-ঘর
বাহিরে গেল দু'টি প্রাচীন সখা
ধরিয়া দুঁহু দোঁহা কর।

বরজ করযোড়ে কহিল "প্রভু,
মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক
ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা
কেবল তুমি আর আমি।
সেথায় আনিয়োনা নূতন শ্রোতা,
মিনতি তব পদে স্বামি!
একাকী গায়কের নহে ত গান,
মিলিতে হবে দুইজনে!

গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা,
আরেক জন গাবে মনে!
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে
তবে সে মর্ম্মর ফুটে!
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে।

কৃষি-কথা।

সচরাচর এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আজিকালি লোকের ব্যয় যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে এক্ষণে কৃষিকার্য্য দ্বারা সুচারুরূপে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। একথা যে একবারে অসত্য বা অসার, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ আমাদের দেশের লোকেরা যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চালাইয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে যে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করা যায় এবং তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দরূপে যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, একথা অনেকে চিন্তা করেন না। অনেক ভদ্রসন্তানের হয় ত পৈতৃক জমীজমা আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই জ্ঞাত নহেন—কোন্ জমীর কিরূপ উর্ব্বরা-শক্তি আছে, কোন্ জমীতে কত ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, কোন্

জমীতে কি প্রকারের সার কত পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক,—এ সব তত্ত্ব তাঁহারা কিছুই রাখেন না। এক একজন কোরফা প্রজা বা জোতদারের হাতে সমস্ত জমীর ভার অর্পণ করিয়া তাঁহারা পরপদসেবনে রত আছেন। ইঁহাদের দেখাদেখি অনেক চাষার ছেলে চাষ আবাদ ত্যাগ করিয়া, দুই পাত ইংরাজি শিক্ষার দোহাই দিয়া, চাকরীর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। কাজেই দিন দিন দেশে বহুপরিমাণে চাষের জমী পতিত থাকায় অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কৃষির অবনতি হইতেছে—দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। আর চৈতন্য না হইলে চলে না।

কোন কোন ভদ্রসন্তান কোনপ্রকারে চাকরী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, অবশেষে ভগ্নমনে চাষকার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে কিছুই শিক্ষা করেন না—উহার রীতিমত তত্ত্বাবধারণও করেন না। কেবল অপরের উপর নির্ভর করিয়া অবশেষে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং "চাষ ভদ্রলোকের পোষায় না"—এই উপদেশ-বাক্য অসঙ্কুচিত মনে অপরকে প্রদান করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন। যিনি "ইস্‌ক্রু কপ্‌লিং" ও "এক্সেল বাক্সে"র হিসাব রাখিতে রাখিতে জীবনপাত করিলেন, তিনি হয় ত বলিতে পারিবেন না যে, তাঁহার বাড়িতে গাড়ির "ধুরা" বা লাঙ্গলের "ঈশ" কয়খানা আছে। যিনি দশটা হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলকারখানার আপিসে ছোট-সাহেবের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, বা অপর আপিসে বড়-সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাটাইলেন, তিনি কিন্তু নিজের জমীর আইলে যাইতে আলস্য ও লজ্জা বোধ করিবেন, রাখাল কৃষাণকে খাটাইতে অপমান বোধ করিবেন—ইহা অপেক্ষা আমাদের অধঃপতনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

ফলতঃ এরূপ থাকিলে আর চলিতেছে না। আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মনে যাহাতে কৃষির প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা পুনরায় উদ্দীপিত হয়, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের কৃষির প্রতি তাচ্ছল্যভাব দূর হয় এবং তাঁহারা কৃষি সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমাদের চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।

বাণিজ্য ব্যবসা অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে লাভ হইয়া থাকে এবং ইহাতে কোন সময়ে মূলধন বিনষ্ট হয় না। নদী বা সমুদ্রমধ্যে নৌকা বা জাহাজ ডুবিয়া একদিনে মহাজনকে পথের ভিখারী করিতে পারে। কিন্তু হাজার "ওথা" বা জলপ্লাবন হইলেও কৃষকের মূলধন জমীগুলি কোথাও যায় না। এইজন্য চাষারা বলে—"লক্ষার বাণিজ্য ক্ষেতের এক কোণে।" অতএব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পক্ষে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, তবে পূর্ব্বকালে আমাদিগের পিতৃপিতামহগণ যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া লাভবান হইতেন, আমাদের সেরূপ করিলে চলিবেনা। পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশের জমীর উর্ব্বরাশক্তি স্বভাবতই প্রবল ছিল। তখন কোনপ্রকারে জমীটা চষিয়া বীজ বপন করিলেই সকলপ্রকার শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। বৃষ্টির জন্য তখন লোককে এত ভাবিতে হইত না, জলপ্লাবনে দেশ একবারে উৎসন্ন যাইত না। তখন চারি পয়সায় এক জন মজুর পাওয়া যাইত, দশ টাকায় হাতীর মত গোরু পাওয়া যাইত। সুতরাং তখন কৃষিকার্য্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এক্ষণে জমীর উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া গিয়াছে; বর্ষার জন্য প্রায়ই লোককে ভাবনাযুক্ত থাকিতে হয়, প্রায় প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর বৃষ্টির অভাবে

শস্য নষ্ট হয়, লোকের মজুরী ও গবাদির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা চারি পাঁচ গুণ বাড়িয়াছে—কাজেই এক্ষণে আর চাষে সহজে লাভ হয় না। কিন্তু এত সব অসুবিধার মধ্যেও একটি মহান সুবিধা আছে। পূর্ব্বে যেমন অল্পব্যয়ে প্রচুর ফসল জন্মিত, ফসলের মূল্যও তেমনি শস্তা ছিল। এক্ষণে যেমন চাষে ব্যয়বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি ফসলের মূল্যও অতিশয় চড়িয়াছে—তাহাতে অল্প ফসল বিক্রয় করিলেই সকলপ্রকার খরচ পোষাইয়া যায়। তবেই চাষে একবারে লোকসান হইবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তথাপি এক্ষণে জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জলাভাব হইলে "পম্পিং এঞ্জিন" প্রভৃতি ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা শস্যরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল একটি বা দুইটি শস্যের চাষ করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপাদন করাইতে হইবে। তাহা হইলেই অল্পদিন মধ্যে প্রচুর লাভ হইবে এবং অবস্থার উন্নতি হইবে।

আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশের প্রধান প্রধান শস্যের চাষ-প্রণালী যথাসাধ্য বিবৃত করিব, ভরসা করি ইহা দ্বারা তাঁহারা কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। চাষ-আবাদের কথা বলিবার পূর্ব্বে জমী সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, অগ্রে তাহাই বলিতেছি।

বাঙ্গলা দেশের সকল জমীই প্রায় উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন। তন্মধ্যে কোন কোন জেলার কোন কোন বিশেষ জমীতে বিশেষ বিশেষ ফসল উত্তমরূপ জন্মে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলার জমীতে ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে; হুগলি, নদীয়া, যশহর প্রভৃতি জেলায় রবিশস্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। জমীর মৃত্তিকা নানারূপ আছে। তন্মধ্যে

আমাদের দেশে সচরাচর কৃষি সম্বন্ধে দুইপ্রকার মৃত্তিকার জমীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়—এক বেলে মাটির জমী, অর্থাৎ যে জমীর মৃত্তিকায় বালির অংশ বেশী। কোন কোন জেলার চাষারা এই মাটিকে "মেটেল" বা "মিটাল" মাটি বলে। দ্বিতীয়প্রকারের জমীর মাটিতে বালির ভাগ খুব কম, এই মাটিকে "এঁটেল" বা "অঁটালু" মাটি বলে। খাঁটি এঁটেল মাটির জমীতে কোন ফসলই জন্মে না। তাহার সহিত অন্যপ্রকার মৃত্তিকা বা সার যোগ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে হয়। অতিরিক্ত বালিমাটিও ভাল নহে, উহার সহিতও সার মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন হয়। কোন্ জমীতে কিরূপ শস্য উৎপন্ন হয় তাহা ক্রমে বলিব।

প্রধানতঃ, এ দেশে চাষের জমী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,—সেচা, অসেচা, জোল এবং দোকর্ষ। যে জমীতে পুষ্করিণী খালাদি হইতে জল উত্তোলন করিয়া তদ্দারা শস্য রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহাকে সেচা জমী কহে, যাহাতে ঐ রূপ জল দিতে পারা যায় না, তাহাকে অসেচা জমী কহে। খাল জমী যাহাতে সচরাচর গ্রাম-ধোয়া জল গিয়া পড়ে, তাহাকে জোল জমী বলে। যে জমীতে এক বৎসরে দুইটি ফসল জন্মে সেই জমীর নাম দোকর্ষ। এইসকল জমী আবার চারি ভাগে বিভক্ত। সাধারনতঃ পার্সী শব্দে ঐ সকল শ্রেণীর নাম উল্লেখ হয়, যথা,—"আওয়েল," "দোয়েম", "ছোয়েম" এবং "চাহারেম" অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ। এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করিবার কারণ এই যে, ইহা দ্বারা জমীর উর্ব্বরতা ও অনুর্ব্বরতা বুঝিতে পারা যায় এবং তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানতঃ জমীদারেরা খাজনার হার বেশী বা কম ধার্য্য করিয়া থাকেন।

যদি তোমার চাষ করিবার অভিপ্রায় হয়, আর পৈতৃক জমীজমা কিছু না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে কিছু ভাল সেচা জমী বা জোল জমী সংগ্রহ করিবে। ইহাতে প্রথমে কিছু অর্থব্যয় হইবে বটে, কিন্তু অতি অল্পদিনেই ফসল হইতে সেই টাকা উঠিয়া যাইবে। তবে তোমাকে সে জন্য চেষ্টা, যত্ন এবং রীতিমত তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে। কৃষি সম্বন্ধে চাষাদিগের একটি উপদেশ আছে তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক। সে উপদেশ এই,—

"খাটে খাটায় দুনা পায়।
তার অর্দ্ধেক ছাতা মাথায়।
ঘরে বসে' পোছে বাত,
এবার যেমন তেমন আরবার হাবাত।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজে পরিশ্রম করে ও চাকরকে পরিশ্রম করায় সে প্রচুর পরিমাণে শস্য পাইয়া থাকে, যে ব্যক্তি নিজে চাষে খাটে না কিন্তু নিয়ত ছাতা মাথায় দিয়া তদারক করে সে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা কম লাভ পাইয়া থাকে। কিন্তু যে মাঠে না গিয়া কেবল ঘর হইতে চাকরদিগকে শস্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, পরিণামে তাহাকে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব কেবল জমী কিনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, উপযুক্তমত আবাদ করাইতে হইবে। কেমন করিয়া তাহা করিতে হয় বারান্তরে সে কথা বলিব।

স্বরলিপি।

ভূপালী—ঢিমাতেতালা।

আহা কি! চাঁদনী রাত,
হের লো সখি।
আহা কি! চাঁদনী রাত,
হের লো, আকাশ প্লাবিল—ভাসিল রে
বিমল চন্দ্র-করে;
আনন্দ উথলিল, বিহঙ্গেরা জাগিল
ভাবিয়ে প্রভাত;
—ঐ বুঝি বাজে বাঁশী
আসে শ্যামচাঁদ।
সব সখি মিলি একতানে
গাও লো মঙ্গল গান;
অনিল-হিল্লোলে মিশিবে সে তান
বাঁশীর সাথ॥

৪|৩

০ ১ ॥ ২´
॥ ধপা ধা র্সা -া। ধা ধা পা -া । গা গা রা -গা।
॥ আহা কি চাঁ —। দি নী রা ত । হে র লো —।

৩
। -রা -া সা সা। ধপা ধা র্সা -া। ধা ধা পা -া ।
। — — স খি। আহা কি চাঁ —। দি নী রা ত ।

। গা গা রা -গা। -রা -া পা পা। ধা ধা পা -া ।
। হে র লো —। — —আ কাশ। প্লা বি ল — ।

। গা পা গা গা। রা গা রা গা। -রা সা সা সা।
। ভা সি ল রে। বি ম ল, চ। — দ্র ক রে।

। সা -া সা সা। সা সা সা সা। -সা -রা -ন্া -সা।
আ — ন ন্দ। উ থ লি ল। — — — —।

।-ধ্া -না ধ্া -প্া। ধ্া সা সা রা। গা গা গা -া।
। — — — —। বি হ ঙ্গে রা। জা গি ল —।

। রা গা রা রা। সা -া -া -া। ধা -পা ধা ধা।
। ভা বি য়ে, প্র। ভা — — ত। ঐ — বু ঝি।

। ধা পা পা গা। পা গা পা পা। গা -রা -সা -া ॥
। বা জে বাঁ শী। আ সে, শ্যা ম। চাঁ — — দ ॥

২'
। গা -া পা ধা। র্সা -া র্সা র্সা। র্সা -া -া ধা।
। স — ব, স। খি — নি লি। এ — — ক।

। র্রা -া র্সা -া। ধা র্সা র্সর্রা -া। র্রা -র্গা র্রা র্সা।
। তা — নে —। গা ও লো —। ম — ঙ্গ ল।

। র্সা -র্রা -না -র্সা। -ধা -না -ধা -পা। গা গা গা গা।
। গা — — —। — — — ন্। অ নি ল, হি।

। পা -া পা -া। পা পা পা না। ধা -া পা -া।
। ল্লো — লে —। মি শি বে, সে। তা — — ন।

। পা -ধা পা পা। গা -রা -সা -া ॥ ॥
। বাঁ — শী র। সা — — থ ॥ ॥

ব্যাখ্যা।

১। পার্শ্ববর্ত্তী যুগল ছেদ আস্থায়ীর আরম্ভ হইতে পুনরাবৃত্তি করিবার চিহ্ন। আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া যেখানে থামিতে হয় ও থামিয়া অন্তরা প্রভৃতি অন্য কলি ধরিতে হয় সেখানে শিরোদেশে যুগল ছেদ বসে।

উন্নতির যুগ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা কালিদাস ও ভবভূতির যুগ আলোচনা করিয়াছি। সেই যুগে ভারতবর্ষে যেরূপ খ্যাতনামা কবি, জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ লোকসকল আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেরূপ জগতে সচরাচর এক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং সেই যুগেই আরবদেশে মহম্মদ, পারস্য দেশে নওসেরবান এবং রোমরাজ্যে প্রসিদ্ধনামা জষ্টিনিয়ন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব সে যুগটীকে মনুষ্যসমাজের একটী বিশেষ উন্নতির যুগ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মনুষ্যজাতির ইতিহাস সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ কয়েকটী বিশেষ উন্নতির যুগ লক্ষিত হয়। মনুষ্যসমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী, বৎসরের পর বৎসর ক্রমশই উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, এই উন্নতির ফল যেন পাঁচ সাত শতাব্দীর পর এক একবার পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এবং যে যে কালে এই উন্নতির পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হয় সেই কালকেই উন্নতির যুগ বলা যাইতে পারে। সেই উন্নতির যুগগুলি সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে বিশেষ ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

১। খৃষ্টের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জগতের মধ্যে কেবল চারিটী দেশে প্রকৃত সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছিল। নীল নদীকূলে প্রাচীন মিসরবাসীগণ মেম্ফিসনগর স্থাপন করিয়া এবং সুন্দর ও প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী-কূলবাসী প্রাচীন কাল্ডীয়গণও সেই প্রাচীনকালে জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। হোয়াংহো

কূলবাসী প্রাচীন চীন্‌গণও সেইকালে যে প্রাচীন সভ্যতার আলোক প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহাতে পূর্ব্ব-আসিয়া আলোকময়। এবং সিন্ধুনদীকূলে প্রাচীন হিন্দুগণ সেইকালেই যে সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় সুন্দর ধর্ম্মগাথা রচনা করিয়াছিলেন, আর্য্য-জগতে তাহা অদ্যাপি সমাদৃত, এবং হিন্দুজগতে তাহা অদ্যাপি সনাতন ধর্ম্মের মূল। জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আজিও যে সভ্যতার আলোক প্রভা পাইতেছে তাহার প্রথম জ্যোতি, প্রথম বিস্ফুলিঙ্গ, প্রথম প্রদীপচতুষ্টয় এই চারিদেশে চারি জাতি দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছিল। একটী হেমেটিক্ জাতি, দ্বিতীয় সেমেটিক্ জাতি, তৃতীয় তুরাণীয় জাতি, চতুর্থ আর্য্যজাতি।

২। ইহার পর সাত কি আট শত বৎসরে কি ফললাভ হইল দেখা যাউক। অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্বে ১৩০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত যে কাল অতিবাহিত হইয়াছিল সেই কালের জ্ঞানোন্নতি আলোচনা করা যাউক। এই যুগে সমস্ত সভ্যজগতে যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। ভারত-বর্ষে কুরু ও পঞ্চাল, বিদেহ ও কোশল প্রভৃতি অনেক সুসভ্য ও পরাক্রান্ত জাতি গঙ্গা ও যমুনার উপকূলে বাস করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণাদি সঙ্কলন করিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ উপনি-ষদ্ গ্রন্থগুলির প্রতিষ্ঠা করিলেন। চীনদেশে এইসময়ে যে "চাউ" রাজবংশ দেশের অধীশ্বর হইলেন, সে বংশ অদ্যাবধি চীন ইতিহাসে বিখ্যাত ও সম্মানিত। মিসরদেশে এই যুগে প্রসিদ্ধনামা সিসষ্ট্রিস-বংশীয় রাজগণ দেশ শাসন করিতেন এবং কার্ণাক প্রভৃতি স্থানে যে বিস্ময়কর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, ফগুর্সন প্রভৃতি ইউরোপীয় হর্ম্ম্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত-গণ তাহা জগতে অতুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আসি-

ষ্টীয় রাজগণ এই সময়ে মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বিজয় বিস্তার করেন। হিটীয়গণ এই যুগে আসিয়া-মাইনর প্রদেশে যে নগরসমূহ নির্ম্মাণ করেন তাহার নিদর্শন অদ্যাপি পাওয়া যায়। গ্রীক এবং ট্রোজানগণ এই যুগে যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েন তাহারই কাল্পনিক বর্ণনা পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদিপুস্তক হোমরের ইলিয়দ। ফিনিসীয়গণও এই যুগে ভূমধ্যসাগর পার হইয়া আটলান্টিক সাগরে প্রথম বাণিজ্য বিস্তার করেন, এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নগর স্থাপন করেন। এবং ইহুদীগণ এই যুগে প্রসিদ্ধনামা দায়ুদ রাজার অধীনে চারিদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সে দায়ুদের ধর্ম্ম-গাথাগুলি জগতে অদ্যাপি সমাদৃত।

৩। আর ছয় শত বৎসর অতিক্রম করিয়া দেখা যাউক। অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্বে ৬০০ হইতে ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই তিন শত বৎসরের কথা আলোচনা করা যাউক। এই যুগের উন্নতি, ধর্ম্ম-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষা অতি বিস্ময়কর। এই যুগে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব হয়, এবং গৌতম বুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস লইয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম সঙ্গঠিত করিলেন, তাহা হইতে অদ্য জগতের লক্ষ লক্ষ লোকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। চীন-দেশে এই যুগে কনফিউশ্যস্ যে ধর্ম্মশিক্ষা প্রচার করেন, তাহা অদ্যাপি জগতে সমাদৃত। গ্রীসদেশে এই যুগে পিথাগোরস ও সক্রেটিস এবং প্লেটো ও আরিষ্টটল দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিয়া জগদ্বিখ্যাত হইলেন। হিরডোটস, থিউসিডিডিস ও জেনফন এই যুগে ইতিহাস রচনা করেন। পিণ্ডার, সফোক্লিস, ইস্কিলস, ইউরিপিডিস এই যুগে কাব্য রচনা করেন। ফিডিয়াস এই যুগে হর্ম্ম্য ও মূর্ত্তিনির্ম্মাণে জগতে অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ

করেন। পেরিক্লিস এই যুগে এথেন্স্ নগর শাসন করিয়া কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং প্রসিদ্ধনামা আলেক্জাণ্ডর এই যুগে সভ্যজগৎ জয় করিয়া গ্রীক সভ্যতা বিস্তার করিলেন। তাঁহার পঞ্চাশৎ বৎসর পরে অশোকরাজা জগতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। এই যুগের মধ্যে বাবিলনীয় প্রসিদ্ধ সম্রাট নেবুকড্‌নেজার পশ্চিম আসিয়াতে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করেন, এবং বাবিলনে যে হর্ম্ম্য ও উদ্যানাদি প্রস্তুত করেন তাহা প্রাচীনকালে অমানুষিক বলিয়া বোধ হইত। মিসরবাসীগণ এই কালে ফিনিসীয়দিগের সাহায্যে সমস্ত আফ্রিকা অর্ণবপোত দ্বারা পরিক্রমণ করিলেন, এবং আপনাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রগুলির পুনঃসঙ্কলন করিলেন। পারসীক রাজা সাইরস এই যুগে পশ্চিম আসিয়াতে বহুবিস্তীর্ণ পারসীক রাজ্য স্থাপন করিলেন। সম্রাট দারায়স জেন্দাবস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের পুনঃসঙ্কলন করিলেন, এবং ইহুদিগণ এই যুগে প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক (Old Testament) প্রথমে লিপিবদ্ধ করিলেন। আমরা আজকালের সভ্যতার বড় দর্প করি, আজকাল রেল হইয়াছে, জাহাজ হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত মানসিক উৎকর্ষে বুদ্ধ, কনফিউশ্যস ও সক্রেটিসের যুগ অপেক্ষা মহত্তর যুগ কখন জগতে দৃষ্ট হইয়াছে কি না সন্দেহ।

৪। তাহার চারি পাঁচ শত বৎসর পরের যুগ একবার আলোচনা করা যাউক। খৃষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বে ও কিছু পরে সভ্যতার কি কি ফললাভ হইয়াছিল দেখা যাউক। এই সময়ে ভারতবর্ষে ও মিসরদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক আলোচনা হইয়াছিল, এবং যে অষ্টাদশ জ্যোতিষসিদ্ধান্ত অদ্যাপি রূপান্তরিত হইয়া ভারতবর্ষে পাওয়া যায় তাহার প্রারম্ভ এই যুগে। কাশ্মীরদেশে এই যুগে কণিষ্ক রাজা শকাব্দের আরম্ভ করেন,

এবং মালবদেশে এই যুগে সম্বৎ আরম্ভ হয়। বীরপ্রসবিনী রোমনগরী এই কালে বহুবীরসমাকীর্ণ ছিল। জুলিয়স সিজার, পম্পী, এণ্টনী, অগষ্টস সিজার প্রভৃতি যোদ্ধাগণ ইতিহাসে নাম রাখিয়া গিয়াছেন। সিসিরো বাক্‌পটুতায় অদ্বিতীয় এবং ভর্জিল ও হোরেস কাব্যে অদ্বিতীয়। এবং এই যুগে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে শান্তি প্রচার করিলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম অদ্য ইউরোপ ও আমেরিকার ধর্ম্ম।

৫। খৃষ্টের পর পাঁচ শত হইতে আট শত বৎসর পর্য্যন্ত যে যুগ তাহাকে আমরা উন্নতির পঞ্চম যুগ বলি। ভারতবর্ষে এটী কবি কালিদাস ও ভবভূতির যুগ। পারস্যদেশে মহাবলপরাক্রান্ত ও ন্যায়পরায়ণ সম্রাট নওসরবান্‌ এই যুগে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং রাজ্যবিস্তার ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধনামা জষ্টিনিয়ন এই যুগে রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্কলিত রোমক রাজনীতি অদ্যাপি অধীত হইতেছে। আরবদেশে এই যুগে ধর্ম্মাত্মা মহম্মদ যে ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, অচিরে তাহা সিন্ধুনদীর তীর হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিল। এই যুগের শেষভাগে বাগ্‌দাদে হারুন অল রসীদ, স্পেনে আব্দুর রহমান, এবং ফ্রান্সে শার্লমান নামক পরাক্রান্ত সম্রাটগণ সভ্যতা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার উন্নতিসাধন করিয়া আপনাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন।

৬। ইহার প্রায় সাত আট শত বৎসর পরে আর একটী উন্নতির যুগ আবির্ভূত হইল। ভারতবর্ষে তথন প্রসিদ্ধনামা আকবর শাসন করিতেন এবং চৈতন্য প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ইউরোপে লুথর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কার করিলেন, কলম্বস আমে-

রিকা আবিষ্কার করিলেন, কোপর্নিকাস ও গালিলিও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উন্নতিসাধন করিলেন, বেকন ও ডেকার্ট্ বিজ্ঞানালোচনা করিলেন, ইংলণ্ডের কবিশ্রেষ্ঠ শেক্ষপীয়র প্রাদুর্ভূত হইলেন। এবং মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হেতু জনসমাজে জ্ঞানবিস্তারের অনেক সুবিধা ঘটিল।

৭। তাহার তিন চারি শত বৎসর পর আর একটী উন্নতির যুগ আবির্ভূত হইয়াছে। এই যুগে বল্টেয়র ও রুসোর পুস্তকাবলী পাঠে ইউরোপীয় সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইল, ও ফরাসী বিপ্লবে জগৎ বিপর্য্যস্ত হইল। ওয়াসিংটন আমেরিকা স্বাধীন করিলেন, নেপোলিয়ন যুদ্ধবিদ্যায় অমানুষিক শক্তি প্রদর্শনে ইউরোপকে স্তম্ভিত করিলেন। বিজ্ঞানালোচনায় নিউটন, লাপ্লাস, কিউবিয়ে ও ডারউইন; সাহিত্যে গেটে, শিলর, বাইরণ ও ভিক্টর হিউগো, এবং দর্শনে হিউম, কাণ্ট ও হেগেল প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। গ্রীকগণ স্বাধীনতা লাভ করিলেন, গারিবল্ডী ইতালি স্বাধীন করিলেন, বিস্‌মার্ক জর্ম্মণিকে একীভূত করিলেন, সমস্ত জগতে মানব-স্বাধীনতার মহামন্ত্র প্রচারিত হইতে লাগিল।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, যিনি এই যুগ কয়েকটীর বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন তিনি মনুষ্যের প্রকৃত ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন; কেবল যুদ্ধবর্ণনা ও সম্রাটদিগের নামাবলী প্রকৃত ইতিহাস নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, বৎসরের পর বৎসর মনুষ্যসমাজ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে; এবং ক্রমশঃ যে উন্নতি লাভ করা যায় তাহা এক একটী বিশেষ যুগে যেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছে। পথভ্রমণের সময় যেরূপ মধ্যে মধ্যে মাইল-প্রস্তর দৃষ্টে কতদূর ভ্রমণ করা হইল তাহা জানা যায়, সেই-রূপ প্রত্যেক পাঁচ কি ছয় কি আট শতাব্দীর পর এক একটী

বিশেষ উন্নতির যুগে মনুষ্যসমাজের উন্নতি বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এবং সেইগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে মনুষ্য-সমাজের উন্নতির সমস্ত ইতিহাস বুঝিতে পারা যায়।

যে সাতটী যুগের উল্লেখ করা গেল, হিন্দুগণ তাহার এক একটী হিন্দু নাম দিতে পারেন। প্রথম যুগটী বৈদিক যুগ; দ্বিতীয়টী মহাভারতীয় যুগ; তৃতীয়টী গৌতম বুদ্ধের যুগ; চতুর্থটী কণিষ্ক রাজার যুগ; পঞ্চমটী কবি কালিদাসের যুগ; ষষ্ঠ চৈতন্য ও নাণকের যুগ; সপ্তম রাজা রামমোহন রায়ের যুগ। প্রতি যুগে ভারতবর্ষে যে মহাত্মা ধর্ম্মোপদেষ্টা ও কবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষের সনাতন গৌরবের এবং ভবিষ্যৎ আশার হেতুস্থল।

প্রকৃতির অভিব্যক্তি।

প্রকৃতির অভিব্যক্তি কথাটাই সাংখ্যের কথা। সাংখ্য-দর্শনই অভিব্যক্তিবাদের আদিগুরু। এ বিষয়ে কাহারো যদি কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে, তবে সাংখ্যকারিকার গোড়ার একটি সূত্র দেখিলেই তাঁহার সে সন্দেহ ভাঙিয়া যাইবে। সে সূত্র এই;—

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্ বিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ।

দেখ—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুইটি শব্দ জুড়িয়া ব্যক্তাব্যক্ত এই একটি শব্দ রচনা করা হইয়াছে, এবং প্রকৃতি-শব্দের পরিবর্ত্তে ঐ যমক-শব্দটি বসাইয়া প্রকৃতির অর্থ খুলিয়া দেওয়া হই-

য়াছে ;—ইসারায় বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ব্যক্তাব্যক্তের উপরেই দণ্ডায়মান।

প্রকৃতির অভিব্যক্তির প্রবর্ত্তক কে? এবং তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? এ দুই প্রশ্ন যদিচ প্রথমেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে সহসা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহার মীমাংসা করিতে হইলে প্রকৃতি হইতে কোন্ কোন্ সামগ্রী অভিব্যক্ত হয় এবং তাহা কিরূপ প্রণালীতে অভিব্যক্ত হয় তাহার প্রতি সর্ব্বাগ্রে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গোড়ার কথা দুইটি ;—মূল উপাদানের অবিনশ্বরতা এবং মূল-ক্রিয়ার চিরস্থিতি। অবিনশ্বরতা এবং চিরস্থিতি এ দুই শব্দের ভাবার্থ একই। কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি কথা জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক—যদিচ আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রে সে কথাটি এখনো পর্য্যন্ত রীতিমত আমল পায় নাই। সে কথাটি কি শব্দে ব্যক্ত করিলে ঠিক্ হয় তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আপাততঃ তাহাকে বলা যাক্ মনোবীজ বা অন্তঃকরণ-বীজ। আদিম জীবপঙ্ক যদিচ জড়-পিণ্ড মাত্র কিন্তু তাহারও ভিতরে মনোবীজ জাগিতেছে ; সে মনোবীজ সুদূর ভবিষ্যতে এক না এক সময়ে অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত পুষ্পিত এবং ফলিত হইয়া উঠিবে—তাহা যখন হইবে তখন তাহাকে মনোবীজ না বলিয়া বলিব—মন বা অন্তঃকরণ।

উপাদানের অনশ্বরতা এবং শক্তিক্রিয়ার চিরস্থায়ীত্ব এই দুইটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি "মনোবীজের আবহমানতা" এই তত্ত্বটি জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রকৃতির মূল অবয়ব তিনটি—মূল উপাদান, মূলশক্তি এবং মনোবীজ।

প্রকৃতির এই তিনটি মূল অবয়ব সাংখ্য-দর্শনে তম, রজ এবং সত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ইহা ভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে, তবে কি না মোটামুটি রকমে। ইহার সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত এইরূপ ;—

আমাদের দেশের পণ্ডিত-সম্প্রদায় সত্বরজস্তমোগুণকে প্রকৃতির পরাকাষ্ঠা মূল অবয়ব বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন—ভালই, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা এরূপ করেন কেন—সত্বরজস্তমোগুণের গোড়ার বৃত্তান্ত কেহ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা এরূপ ভাবেন কেন যে, "বৃক্ষের মূল শিকড়, এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, শিকড়ের মূল কি একথা পাগলের কথা!" তাঁহাদের জানা উচিত যে, "শিকড়ের মূল অজিজ্ঞাস্য" একথা এক হিসাবে সত্য হইলেও আর এক হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিকড়েরও মূল আছে; শিকড়ের মূল—বীজ। অতঃপর আমরা দেখাইতেছি যে, শিকড়ের মূল যেমন বীজ—সত্বরজস্তমোগুণের গোড়ার বৃত্তান্ত তেমনি প্রকৃতির ব্যক্তাব্যক্ত ভাব।

যদি জিজ্ঞাসা কর যে, দৃশ্যমান বস্তু সকলের অব্যক্তভাব ঘটাইবার কর্ত্তা কে? তবে তাহার উত্তর, অন্ধকার—তমঃ। ব্যক্তভাব ঘটাইবার কর্ত্তা কে? আলোক।

আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী কে? রঞ্জন—রঙ—রজ। গেটের রঞ্জনতত্বের গোড়ার সিদ্ধান্ত এই যে,—colour arises through the reciprocal action of light and darkness আলো অন্ধকারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে রঙ উৎপন্ন হয়। পুরাণ তন্ত্রাদিতে রূপকচ্ছলে সত্বগুণে সাদা রঙ, তমোগুণে কালো রঙ এবং রজোগুণে লাল রঙ আরোপিত হইয়া থাকে। লাল রঙই রঙ; সাদা কালো আলো-অন্ধকারেরই সামিল; এদুটাকে কেবল বলপূর্ব্বক রঙের কোটায় স্থান দেওয়া হইয়া

থাকে। লোকের সহজ বুদ্ধিও তাহাই বলে; তার সাক্ষী—রাঙা এবং রঙ দুয়ের মূল-অর্থ একই;

যথা; ভঞ্জন—ভঙ্গ—ভাঙা।

রঞ্জন—রঙ্গ—রাঙা = রঙ।

মানিলাম, তমঃ = অন্ধকার,

রজঃ = রঙ।

কিন্তু সত্ত্ব-শব্দের তো ওরূপ কোনো চাক্ষুষ অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! এমন কথা বলিও না! খুঁজিলে না পাওয়া যায় এমন বস্তুই নাই। অন্ধকার একপ্রকার অসত্তা এটা স্থির; যথা:—

অন্ধকার দেখা = কিছুই না দেখা।

অতএব অন্ধকার = কিছুই না = অসত্তা।

তবেই হইতেছে যে,

{অন্ধকারের বিপরীত = অসত্তার বিপরীত
অন্ধকারের বিপরীত = আলো
অসত্তার বিপরীত = সত্তা

এই হিসাবে

আলো = সত্তা = সত্ত্ব (যেমন প্রভুতা = প্রভুত্ব)।

সত্ত্বশব্দ হইতে আলো-অর্থ আমি যে বলপূর্ব্বক নিঙ্ড়াইয়া বাহির করিতেছি (যেমন সশার বীচি হইতে কোনো কোনো মহাপুরুষ সূর্য্যরশ্মি বাহির করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন) এমন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না; সাংখ্যকারিকায় স্পষ্টই রহিয়াছে যে, "প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাং"—সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্ম্মী, রজোগুণ প্রবৃত্তি-ধর্ম্মী, তমোগুণ নিয়ম-ধর্ম্মী অর্থাৎ বন্ধন-ধর্ম্মী; (নিয়ম-

শব্দে এখানে প্রতিরোধকারিতা—resistance)। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে,

অভিব্যক্তির মূল—আলো,
অনভিব্যক্তির মূল অন্ধকার,

এবং অনভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তিতে উপসংক্রমণ লাল রঙ—(প্রত্যূষে যেমন দেখা যায় অন্ধকার হইতে আলোকে উপ-সংক্রমণ করিবার সোপান পূর্ব্ব-দিকের রক্তিম রাগ)।

এই তিনের ভাব সত্ত্বরজস্তমোগুণের ললাটে স্পষ্টাকারে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে।

রূপকচ্ছলেই বলা যাইতে পারে যে, সত্ত্বরজস্তমোগুণ=আলো, রঙ, অন্ধকার। কিন্তু আসল কথা এই যে, তমোগুণ=নিশ্চেষ্ট জড় (matter with its inertia); রজোগুণ=চেষ্টা (activity); এবং সত্ত্বগুণ=মন।

প্রকৃতি জড় হইতে মনের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে—ইহা সকলেরই জানা কথা। আগে জীব—পরে জড় নহে, কিন্তু আগে জড় পরে জীব, প্রকৃতির বীজমন্ত্র।

প্রকৃতি জড় হইতে মনের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, এই কথাটিকে রূপকের পরিচ্ছদে সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রকৃতি অন্ধকার হইতে আলোকে ক্রমশই পদনিক্ষেপ করিতেছে। আর, জড় হইতে জীবে পৌঁছিবার যে চেষ্টা সেইটি লাল রঙ—(রাত্রি হইতে দিবালোকে পৌঁছিবার চেষ্টা যেমন পূর্ব্বদিকের রক্তিম রাগ)।

অতঃপর রূপক বাদ দিয়া সত্ত্বরজস্তমোগুণের মুখ্য ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যা'ক্।

(১) প্রকৃতির চেষ্টা অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার দিকে।

(২) যে কোনো চেষ্টা হউক্ না কেন, যতক্ষণ তাহা চেষ্টা-মাত্র থাকে ততক্ষণ তাহা দুঃখেরই নামান্তর—চেষ্টা ফলবতী হইলেই তাহা সুখে পরিণত হয়।

(৩) প্রকৃতির চেষ্টা যেহেতু ব্যক্ত হইবার দিকে এই জন্য ব্যক্ত হইতে পারিলেই তাহার চেষ্টা ফলবতী হয়—চেষ্টা ফল-বতী হইলেই সুখের উৎপত্তি হয়। এই জন্য সত্ত্বগুণ প্রকা-শাত্মক এবং সুখাত্মক উভয়-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ঐরূপ কারণে তমোগুণ অন্ধকার নিশ্চেষ্টতা এবং বিষাদের মূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির ব্যক্তাব্যক্ত ভাবের উপরেই সত্ত্বরজস্তমোগুণের মূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রকাশ সত্ত্বগুণ, অপ্রকাশ তমোগুণ, এবং প্রকাশ-চেষ্টা রজোগুণ।

আবার, অপ্রকাশের সহিত অসত্তার যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, প্রকাশের সহিত সত্তার সেইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; এইজন্য প্রকাশ-গুণ এবং সত্ত্বগুণ দুয়ের ভাবার্থ একই।

সাংখ্যের মতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিসম্ভূত জগৎ দুয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোনো প্রভেদ নাই; কাজেই প্রকৃতি-সম্ভূত জগৎ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহে—ভিন্ন যখন নহে তখন তাহাও (অর্থাৎ প্রকৃতিসম্ভূত পদার্থসকলও) প্রকৃতি-শব্দের বাচ্য। ব্যক্ত প্রকৃ-তিও প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রকৃতিও প্রকৃতি, এবং উভয়ই সত্ত্বরজ-স্তমোগুণের সম্মিশ্র; প্রভেদ কেবল এই যে, অব্যক্ত প্রকৃতি অথবা মূল প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা, ব্যক্ত প্রকৃতি (যাহার আর এক নাম বিকৃতি) তাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের বৈষম্যাবস্থা। আমরা সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছি যে, জগতের মূল

উপাদান (Matter) মূলশক্তি (Force) এবং মনোবীজ অভিব্যক্তি-রাজ্যের অন্তঃপাতী নহে—কেননা তাহারা জগতের গোড়ার বস্তু—দৃশ্যমান জগতের কোনো পরিবর্ত্তনেই তাহাদের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু জগতের মূলস্থানে ঐ তিনটি বস্তু (উপাদান, শক্তি এবং মনোবীজ) তিন নহে, কিন্তু এক। মনে কর যেন একই জ্যোতির্ম্মণ্ডল হইতে তিনটি রশ্মিধারা বিনির্গত হইয়াছে যথা—
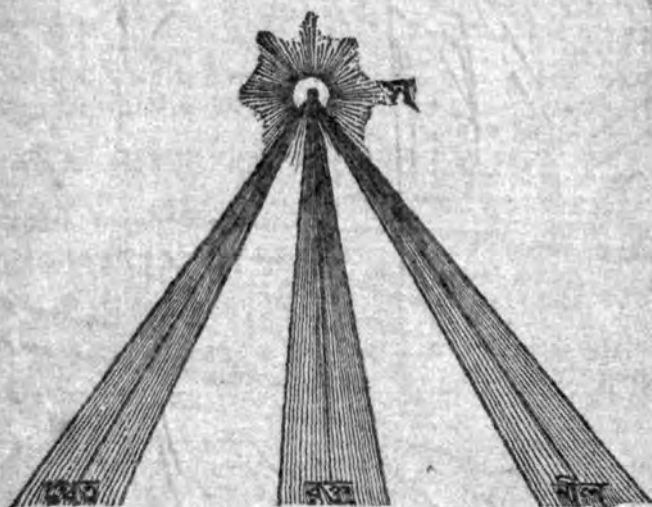
স চিহ্নিত স্থানে ঐ তিনটি রশ্মিধারা সাম্যাবস্থায় পরিণত হইয়াছে—অর্থাৎ তিনের মধ্যে কোনো প্রভেদই লক্ষিত হইতেছে না। এ একটা মোটামুটি দৃষ্টান্ত মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃতির অভিব্যক্তির গোড়ায় জগতের মূল উপাদান, মূল ক্রিয়া এবং মনোবীজ, তিনই অভেদ-ভাবে একীভূত-ভাবে সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। এবং প্রকৃতির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে—ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পর্য্যবসিত হইতেছে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে উপাদান

এবং শক্তি উভয়ে গোড়ায় এক—আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তির প্রতি-দ্বন্দ্বিতা। আমরা বলিতেছি, উপাদান, শক্তি এবং মনোবীজ তিনই গোড়ায় এক—অব্যক্ত প্রকৃতি। ত্রিগুণ-সম্বন্ধে আরো গোটা দুই কথা বলিবার আছে তাহা পরে বলিব।

পঁহু।

পঁহু শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যাউক। পদরত্নাবলী নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—"চৈতন্যদেব জন্মিবার বহুপূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু অপূর্ণভাবে। কেন না তখন সে ধর্ম্ম কেবল রাধাকৃষ্ণের যৌনসম্বন্ধের উপর সংস্থাপিত। জয়দেব তাহাই গীত করিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। যে সকল মহাজন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী; জয়দেবাদির অনেক পরে। চৈতন্য যে সকল মহাজনের গ্রন্থ আলোচনা করিতেন, তন্মধ্যে তাঁহাদের স্থান ছিল না।

"এমন বলিতেছি না যে, চৈতন্যের পূর্ব্বেকার বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল মধুররসসর্ব্বস্ব—শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্যাদির তখন নামগন্ধ ছিল না। আমার তর্ক এই যে, মধুর রসের তখন এত বাড়াবাড়ি যে, অন্য রসের ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল না। অন্য রসের যে প্রয়োজন তাহাও তত অনুভূত হয় নাই। আমরা বলিয়াছি গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ কেবল মধুর রসের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন

এবং তাহাই তাঁহারা গীত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহারা অন্য রসের বড় আলোচনা করেন নাই।"

সুতরাং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে অর্থে পঁহু শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস তাহা হইতে কিছু ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতে পারেন। এইজন্য আমার নিবেদন—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বঁধু অর্থে এবং গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসাদি প্রভু অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে দাস্যভাব অপেক্ষা সখ্যভাবের প্রাধান্য অধিক। এজন্য গোবিন্দদাসের রচনায় যেখানে পঁহু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানেও প্রভু বা Lord অর্থের কঠোরতা সখ্যভাবে কিছু কোমল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের Lord সম্বোধন অপেক্ষা বৈষ্ণবধর্ম্মের পঁহু সম্বোধনে মধুর ভাব অধিক প্রকাশ পায়।

আর একটী কথা। বিদ্যাপতি কোথায়ও আপনার ভণিতায় শ্রীকৃষ্ণকে পঁহু শব্দে সম্বোধন করেন নাই। চৈতন্যের পরবর্ত্তী কবিগণ আপনারা শ্রীকৃষ্ণকে পঁহু শব্দে সম্বোধন কখন কখন করিয়াছেন—সেখানে দাস্যভাবে প্রভু সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে বা সখ্যভাবে বঁধু সম্বোধন হইয়া থাকিবে। চৈতন্যের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবিগণ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আপনাদিগকে দাস শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এজন্য প্রভু অর্থে পঁহুশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে অনুমান করা তত অসঙ্গত হয় না। কিন্তু বিদ্যাপতি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সম্বোধনে রাধার বা রাধার সখীর মুখে ঐ শব্দটী আরোপ করিয়াছেন। হিন্দু স্ত্রীর পতিভক্তিতে দাস্যভাব থাকিলেও মধুররসসর্ব্বস্ব পরকীয়াপ্রেমে দাস্যভাব অসংযুক্ত। রাধাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা নিঃস্বার্থ মধুরভাবে। রাধা কৃষ্ণকে "প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করিবেন বোধ হয় না। বিশেষতঃ শ্রীশ বাবু

দেখাইয়াছেন, গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ কেবল মধুর রসের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে যেখানে যেখানে পঁহু শব্দ পাওয়া যায়—এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। দেখিবেন—বিদ্যাপতি নিজে কখন শ্রীকৃষ্ণকে পঁহু শব্দে সম্বোধন করেন নাই। এবং যেখানে যেখানে পঁহু শব্দের প্রয়োগ আছে সেখানে বঁধু শব্দ ব্যবহার করিলে অর্থের ব্যত্যয় হয় না।

"চরকি চরকি পড়ু লোচন লোর
কত রূপে মিনতি করল পঁহু মোর
লাগল কুদিন করলু হাম মান
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ"
"নিজ পঁহু পরিহরি আইলি কমলমুখী"
"নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে
সির লেলি ঘোঘট সারী
লগলগ পঁহুকে চলইতি সজনি গে
সকুচল অঙ্গম নারী"
"সুন্দরি চললিহি পঁহু ঘরনা
চহুদিশি সখি সভ কর ধরি না"
"কহিঅ ন পারিঅ পঁহু মুখ ভাষা
সমুখ নিহারি দুহু মন হাসা"
"গুণ অবগুণ পঁহু একো ন বুঝলহি
রাহু গরাসল চন্দা"
"জে কিছু পঁহু দেল আঁচর ঝাঁপি লেলি
সখি সভ কর উপহাসে"
"সুমরি সমাগম সুপঁহুক পাসা"

"বোলব বোল স্থপঁহু নিরবাহে"
"পঁহু উঠি পরদেশ গেল"
"হসি পঁহু উতর ন দেলরে"
"করব মৈঁ পঁহুক উদেসরে"
"এহি অবসর পঁহু মিলন জেহন সুখ"
"অপন অপন পঁহু সবহু জেমাওলি"
"মন দৈ রুসি রহল পঁহু সোই"
"জোঁ হম জনিতহুঁ এ হন নিঠুর পঁহু"
ইত্যাদি।

এ সকল উক্তি রাধার বা রাধার সখীর, এবং সর্ব্বত্র পহুঁস্থানে বঁধু ব্যবহার করা যাইতে পারে, "পুনঃ" বা "ভণে" ব্যবহার করিতে হয় না, প্রভু শব্দও প্রযোজ্য নহে। এখন দেখা যাউক দীনেন্দ্র বাবু ও আপনি যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন সেখানে বঁধু বা প্রভু অর্থ হইতে পারে কি না।

গোরা পঁহু বিরলে বসিয়া=বঁধু
পরশিতে বিহসি ঠেলই পঁহু পাণি=বঁধুর
ধরি পঁহু হাসি আলিঙ্গন দেল=বঁধু
দাস অনন্ত পঁহু না পাওল ওর=বঁধু বা প্রভু
বৈছন চতুর শঠের পঁহু=বঁধু
পঁহু মোর শ্রীনিবাস=প্রভু
কহ রাধামোহন পঁহুক বলিহারী=বঁধুর
পঁহুক প্রতাপ মত্ত কব্ধ যাগে=বঁধুর
পঁহুক চরণ যুগ সারণী করবি=প্রভুর
গোবিন্দদাস পঁহু নটবর শেখর=বঁধু
গোবিন্দদাস পঁহু জগ মনমোহন=বঁধু

রাধামোহন পঁহু রসিক সুনাহ—বঁধু
নরোত্তম দাস পঁহু নাগর কান—বঁধু

নটবর, মনমোহন, রসিকনাথ ও নাগর কানুকে প্রভু অপেক্ষা বঁধু বলাই ভাল।

রাধামোহন পঁহু দুঁহু অতি নিরূপম—বঁধু
রাধামোহন পঁহু তুয়া পায়ে নিবেদয়ে—প্রভু

হে প্রভু! রাধামোহন তোমার পায়ে নিবেদন করিতেছে।

গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্নে বেলি অবসান ভৈগেলি—বঁধু

হে গোবিন্দদাসের বঁধু বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল।

সব কয়টী পদে পঁহুস্থানে প্রভু বা বঁধু বসান যাইতে পারে। কষ্টকল্পনার আবশ্যক হয় না। ভণে বা পুনঃ অর্থ কোথায়ও আবশ্যক হয় না। রাধামোহন হইতে বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবি-গণ অনেক দূরে। সখ্যভাব অপেক্ষা দাস্যভাবসাধন সহজতর। সাধনার দুরূহত্ব হেতু ও তান্ত্রিকদিগের সংসর্গবশতঃ ক্রমে দাস্য-ভাব বৈষ্ণবসমাজে অধিক হইয়া পড়িয়াছে। এবং মধুর ভাব অন্তর্হিত হইতেছে।

এখন দেখা যাউক শব্দশাস্ত্র হইতে পঁহুশব্দের কোন ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় কি না। গতবারে আমি বলিয়াছিলাম বঁধু শব্দ হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এটী আমার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছিল। বন্ধুশব্দের "ব" বর্গীয় "ব"। বর্গীয় "ব" "প"য়ে অপভ্রংশ হয় না। মাননীয় গ্রিয়ার্সন সাহেব আমার এ ভ্রমটী দেখাইয়া দিয়াছেন। বার্ত্তা হইতে পাতা এবং বর্ত্তিকা হইতে পলিতা হইয়াছে আমি গতবারে দেখাইয়াছিলাম। সে দুইটী অন্তঃস্থ "ব"। যদি সংস্কৃত কোন শব্দ হইতে পঁহু শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে প্রভু হইতে হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ

হয় ইহা তৎসম বা তদ্ভব সংস্কৃত শব্দ নহে। ইহা একটী দেশজ শব্দ এবং এই শব্দের রূপান্তর পাঁহোন শব্দ অদ্যাপি কুটুম্ব বা আত্মীয় অর্থে বিহারে প্রচলিত রহিয়াছে।

পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনায় আমি দেখিয়াছি ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং ও'র বাঙ্গালায় চন্দ্রবিন্দুর আকারে পরিণত হয় এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়।

অঙ্গ বস্ত্র=অাঁগোস্তর, আঁগোছা; অগ্রণী=আঁগোরী, অঙ্গুরী=আঁগুরী, অঙ্গেঠী, আঁগটী; অঙ্গার=আঁগার, আঙার; শ্রাবণ=স্রাঙন, অন্তর=আঁতর, কাঞ্চন=কাঁচর, কাচল; কণ্ঠ=কাঁঠ, কান্তি=কাঁতি, স্কন্ধ=কাঁধ, কম্প=কাঁপ, অগ্র=আঁগ, কুণ্ড=কুঁড়, কুঞ্জ=কুঁজ, কুঞ্জী=কুঁজি, পুঞ্জী=পুঁজি, কুন্দ=কুঁদ, খণ্ড=খাঁড়া, চন্দ্র=চাঁদ, নিদ্রা=নীন্দ, নীঁদ; বক্র=বঙ্ক, বাঁকা; আম্র=আঁব, অক্ষি=আঁখ, অঙ্গুল=আঁগুল, অঙ্কুর=আঁকুর, অঙ্গন=আঁগন, হংস=হাঁস, বেত্র=বেঁত, মহিষ=ভৈঁস, অন্ধকার=আঁধিয়ার, সিংহ=সীঁ, অঙ্ক=আঁক, আঁকা; অশ্রু=আঁশু, আঁস; ছন্দ=ছাঁদ, গ্রাম=গাঁব, ভ্রমর=ভঁঅর, পঞ্চ=পাঁচ, অগ্নি=আঁগ, মুদ্রা=মুঁদনা, অক্ষর=আঁখর, অঙ্কস=আঁকসী, কঙ্ক=কাঁক, পক্ষ=পাঁখ, পঙ্ক=পাঁক, কুণ্ঠী=কুঁড়ী, কর্কট=কাঁকড়া, কঙ্কর=কাঁকর, আঁকরা; বংশ=বাঁশ, তন্তু=তাঁত, যন্ত্র=জাঁতা, ফন্দ=ফাঁদ, দন্ত=দাঁত অঞ্চল=আঁচল, আঁচলা, আঁচরা; বণ্টন=বাঁটা, পঞ্জর=পাঁজর, অঞ্জলি=আঁজুরী, কুমার=কুঁঅর, উজ্জ্বল=উঁজারা, ইজোরা; আত্মীয়=আঁত্মীর, মঞ্জন=মাঁজন, অস্থি=আঁছিয়া, আচ্ছা; আচমন=আঁচান, আকর্ষ=আঁচর, আঁচড়।

নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি "হ" য়ে পরিণত হয় দেখিতে পাইয়াছি। ক, খ, জ, ঝ, ত, থ, ধ, প, ব, ভ, ম, য, শ, ষ, স, ক্ষ। যথা—

কোকিল=কোহিল, কোক=কোহ, মুখ=মুহ, সখী=সহী, নখ=নহ, রেখা=রেহা, রজনী=রহনী, মুগ্ধ=মোহ, ভ্রাতৃ=ভাহি, চত=চহ, নাথ=নাহ, পাথর=পাহন, দধি=দহি, পরিধান=পহিরণ, বধির=বহির, বিধি=বিহি, গোধী=

গোহী, গোপ=গোহ, বাপে=বাহে, ধাব=ধাহে, শোভন=শোহন, গভীর=গহীর, সুভাবন=সোহায়ন, ছায়=ছাহ, কেশরী=কেহরী, দশ=দহ, পুষ্প=পুহপ, মাস=মাহ, দোসর=দোহর, দক্ষিণ=দহিন, সাক্ষ=সাহ।

প্রত্যুত্তর।

পঁহু শব্দ বন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ইহা আপনি স্বীকার করেন, তথাপি উক্ত শব্দ যে প্রভুশব্দমূলক তাহা আপনার সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু পঁহু যে তৎসম বা তদ্‌ভব সংস্কৃত শব্দ নহে পরন্তু দেশজ শব্দ আপনার এরূপ অনুমানের পক্ষে কোন উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কেবল আপনি বলিয়াছেন—"মধুররসসর্ব্বস্ব পরকীয়াপ্রেমে দাস্যভাব অসংযুক্ত।" কিন্তু এই একমাত্র যুক্তি আমার নিকট যথেষ্ট প্রবল বোধ হয় না, কারণ, বৈষ্ণবপদাবলীর অনেক স্থানেই রাধিকা আপনাকে কৃষ্ণের দাসী ও কৃষ্ণ আপনাকে রাধিকার দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, পদাবলীতে স্থানে স্থানে "পঁহু" শব্দ প্রভু অথবা বঁধু ছাড়াও অন্য অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি।

রাধামোহন দাস রাধিকার বিরহবর্ণনা করিতেছেন ;—

> প্রেমগজ দলন সহই না পারই জীবইতে করই ধিকার।
> অন্তরগত তুহুঁ নিরগত করইতে কত কত করত সঞ্চার।
> অথির নয়ন শরঘাতে বিষম জ্বর ছটপট জলজ শয়ান।
> রাধামোহন পঁহু কহই অপরূপ নহ যাহে লাগয়ে পাঁচবাণ।

অর্থাৎ শ্যামকে সম্বোধন করিয়া দূতী কহিতেছে—প্রেম-

গজের দলন সহিতে না পারিয়া রাধিকা বাঁচিয়া থাকা ধিক্কারযোগ্য জ্ঞান করিতেছেন এবং অন্তর্গত তোমাকে নির্গত করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। তোমার অস্থির নয়নশরঘাতে বিষম জরাতুর হইয়া বিরহিনী পদ্মশয়ন অবলম্বন করিয়াছেন। রাধা-মোহন কহিতেছেন যাহাকে পঞ্চবাণ লাগে তাহার পক্ষে এরূপ আচরণ কিছুই অপরূপ নহে।

এস্থলে পঁহুশব্দের কি অর্থ হইতেছে? "রাধামোহনের প্রভু বলিতেছেন" এরূপ অর্থ অসংগত। কারণ, কৃষ্ণের মুখে এরূপ উত্তর নিতান্ত রসভঙ্গজনক। "রাধামোহন কহিতেছেন হে প্রভু" এরূপ অর্থও এস্থলে ঠিক খাটে না, কারণ, সেরূপ অর্থ হইলে পঁহু শব্দ পরে বসিত—তাহা হইলে কবি সম্ভবতঃ "রাধামোহন কহে অপরূপ নহে পঁহু" এইরূপ শব্দবিন্যাস ব্যবহার করিতেন।

যুগলমূর্ত্তি বর্ণনায় গোবিন্দদাস কহিতেছেন।

ও নব পদ্মিনী সাজ,
ইহ মত্ত মধুকর রাজ।
ও মুখ চন্দ উজোর,
ইহ দিঠি লুবধ চকোর।
গোবিন্দদাস পহু ধন্দ,
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।

এখানে ভণিতার অর্থ "অরুণের নিকট চাঁদ দেখিয়া গোবিন্দ-দাসের ধাঁদা লাগিয়াছে।" গোবিন্দদাসের প্রভুর ধাঁদা লাগি-য়াছে একথা বলা যায় না, কারণ, তিনিই বর্ণনার বিষয়। এখানে "পঁহু" সম্বোধন পদ নহে তাহা পড়িলেই বুঝা যায়।

শ্যামের সেবা সমাপনান্তে রাধিকা সখীসহ গৃহে ফিরিতেছেন—

সখীগণ মেলি করল জয়কার।
শ্যামক অঙ্গে দেয়ল ফুলহার।

নিজ মন্দিরে ধনী করল প্রয়ান।
ঘন বনে রহল সুনাগর কান।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী।
মণিময় ভূষণে অঙ্গ উজোরি।
শঙ্খ শব্দ ঘন জয়জয়কার।
সুন্দর বদনে কবরী কেশভার।
হেরি মদন কত পরাভব পায়
গোবিন্দদাস পহুঁ এহ রস গায়।

এখানেও পঁহু অর্থে প্রভু অথবা বঁধু অসঙ্গত।

সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ।
গোধন গরজত বড়ই গভীর
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর।
গোরস ধীর বিরাজিত অঙ্গ
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ
মুটকি মুটকি ভরি রাখত চারি।
গোবিন্দদাস পঁহু করত নেহারি।

এখানে "গোবিন্দদাসের প্রভু নিরীক্ষণ করিতেছেন" এরূপ অর্থ হয় না, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি দোহনে নিযুক্ত।

বনি বনমালা আজানুলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী,
গায়ত গোবিন্দদাস পহুঁ॥

এখানে গোবিন্দদাসের প্রভু গান গাহিতেছেন ঠিক হয় না, কারণ, তাঁহার মুখে মোহন মুরলী।

নিজ মন্দির যাই বৈঠল রসবতী
গুরুজন নিরখি আনন্দ॥

শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
ঢর ঢর ও মুখচন্দ।

* * * * *

গৃহ নিজ কাজ সমাপল সখীজন
গুরুজন সেবন কেলি।
গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ণ
বেলি অবসান ভৈ গেলি।

এই পদে কেবল রাধিকার গৃহের কথা হইতেছে; তিনি ক্রমে ক্রমে গৃহকার্য্য এবং ভোজনাদি সমাধা করিলেন এবং সন্ধ্যা হইল—কবি ইহাই দর্শন এবং বর্ণনা করিতেছেন, এখানে শ্যাম কোথায় যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন যে, "হে গোবিন্দ-দাসের বঁধু বেলা গেল সন্ধ্যা হল।"

আমি কেবল নির্দ্দেশ করিতে চাহি যে, গোবিন্দদাসের এবং দুই একস্থলে রাধামোহন দাসের পদাবলীতে পঁহু, পহুঁ বা পহু, প্রভু ও বঁধু অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কি অর্থে হয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

কিন্তু প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে বিদ্যাপতির নোটে অক্ষয় বাবু এক স্থলে "পহু" অর্থে "পুনঃ" লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই অর্থ নিতান্ত অনুমানমূলক না মনে করিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি এবং দেখিয়াছি স্থানে স্থানে পহুঁ শব্দের পুনঃ অর্থ সঙ্গত হয়। কিন্তু তথাপি স্থানে স্থানে "ভণে" অর্থ না করিয়া "পুনঃ" অর্থ করিলে ভাব অসম্পূর্ণ থাকে। যেমন "গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ণ" ইত্যাদি।—

এই কারণে আমরা কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়িয়া আছি। ভণহুঁ এবং পুনহুঁ এই দুই শব্দ হইতেই যদি "পঁহু"'র উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে স্থানভেদে এই দুই অর্থই স্বীকার করিয়া লওয়া

যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, গোবিন্দদাস (এবং কদাচিৎ রাধামোহন) ছাড়া আর কোন বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে "পহুঁ" শব্দ প্রয়োগের এরূপ গোলযোগ নাই। অতএব ইহার বিরুদ্ধে যদি অন্য কোন দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ না থাকে তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই শব্দ ব্যবহারে গোবিন্দদাসের বিশেষ একটু শৈথিল্য ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করি; আপনি মিথিলা-প্রচলিত বিদ্যাপতির পদ হইতে যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পহু শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। এই চন্দ্রবিন্দু কি আপনি কোন পুঁথিতে পাইয়াছেন? গ্রিয়ার্সন-প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও "পঁহু" দেখি নাই, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে যে হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম তাহাতে পহু ব্যতীত কুত্রাপি পহুঁ দেখি নাই।

"ভারতবর্ষে।"*

দুই বৎসর হইল শেভ্রিয়োঁ নামক একজন ফরাসিস্ পর্যাটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান ও তথাকার অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, রীতিনীতি

*Dans L' Inde—Par Andrè Chevrillon.

পরিদর্শন করিয়া তাঁহার মনে যখন যে ভাব উপস্থিত হইয়াছে তাহা অতি সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ধরণ অতীব মনোরম। তাঁহার বর্ণনাশক্তি চমৎকার। তাহাতে চিত্রকরের নিপুণতা লক্ষিত হয়। দুই একটা সামান্য আঁচড় দিয়া এক একটা ছবি কেমন জলন্তরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনা কবিত্বরসে পরিপূর্ণ। তাঁহার আর একটি প্রধান গুণ এই, বিদেশীয় আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতির সমালোচনায় তাঁহার লেখায় কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায় না। তিনি যতদুর পারিয়াছেন, ভিতর পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া সহৃদয়ভাবে ও উদারভাবে সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এরূপ উদারতা বোধ হয় ফরাসীদিগের জাতীয় ধর্ম্ম। ইংরাজ পর্য্যটকদিগের লেখায় এরূপ ভাব সচরাচর দেখা যায় না।

দার্জ্জিলিঙ্গের ইংরাজ সমাজের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—"এই 'অ্যাসেম্ব্লি-রুম্‌স্'-এ সন্ধ্যাকালে নৃত্য হয়—সেই সময়ে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে রসালাপ চলে এবং সেই রসালাপ পরিণামে বিবাহে পর্য্যবসিত হয়। ... ... এই দেখ সৈনিকের দল—রাঙ্গা-মুখ, ব্যায়াম-গঠিত সবল শরীর, চুল পমেটমলিপ্ত, উহারা বারিকে জেণ্টল-ম্যানের মত বাস করে—ছড়ি হাতে, অবৈতনিকের ভাবে, বিজেতৃভাবে সদর্পে পায়চালি করে। এই দেখ ভদ্র 'বোর্ডিং হাউস্'। দিনান্ত ভোজনের উপলক্ষ্যে সবাই কাল কোর্ত্তা পরিয়াছে। বাড়ির কর্ত্রী ভোজনের আরম্ভে দস্তরমত প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেছেন এবং মাংসের পাৎলা পাৎলা চাক্‌লা কাটিয়া ও চাপ্-চাপ্ 'পুডিং'-এর টুক্‌রা সকলের পাতে শিষ্টতা সহকারে চালান করিতেছেন। গৃহস্বামী, যাঁহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত বলি-

সেই হয় অথচ যাঁহার না থাকাটাও ভাল দেখায় না—তিনি গৃহের সম্ভ্রম মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই যেন অধিষ্ঠিত। ভোজন-কালে শান্তভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল—সে কথাবার্ত্তা সুশিক্ষিত, শান্ত ও সামাজিক লোকদিগেরই উপযুক্ত। আহারের পর বৈঠকখানায় যাওয়া গেল। একটি যুবতী মহিলা পিয়ানো বাজাইতে বসিলেন। কতকগুলি প্রেমের গান ও স্বদেশের গৌরব-সূচক গান বাজান হইল। পরদিনে কোথায় ভ্রমণ করা যাইবে স্থির করিয়া মজ্‌লিস্ ভঙ্গ হইল। ইহার সহিত টন্‌কিন ও ট্যুনিস্ প্রভৃতি ফরাসী উপনিবেশের তুলনা করিয়া দেখ। ফরাসী ঔপনিবেশিকেরা প্রায়ই অবিবাহিত। তাহাদের যেন সময় কাটে না—প্রবাসের কষ্ট তাহারা কি তীব্ররূপেই অনুভব করে। এখানে ইংরাজেরা যেন ইংলণ্ডেই রহিয়াছে। শুধু যে তাহাদের অনুষ্ঠান, তাহাদের অভ্যাস, তাহাদের জাতীয় সংস্কার এখানে আনয়ন করিয়াছে তাহা নহে, নিজ জন্মস্থানের বহি-র্দৃশ্য ও সাজসজ্জা পর্য্যন্ত যেন এখানে উঠাইয়া আনিয়াছে। ভিন্ন দেশের সংস্পর্শে তাহাদের স্বভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। আসল কথা, ইংরাজেরা যেরূপ দুর্নম্য এমন কোন জাতিই নহে—নূতন অবস্থার সহিত আপনাদিগকে উপযোগী করিয়া লইতে উহারা নিতান্ত অক্ষম। আপনাদের যে ছাঁচ, যে ব্যক্তিগত ভাব তাহা কিছুতেই তাহারা ছাড়িতে পারে না। ইহা হইতেই তাহাদের এত নৈতিক বল। কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় সংস্কার থাকাতেই তাহাদের ইচ্ছার এত বল, কিন্তু আবার এই কারণেই তাহাদের সহানুভূতি ও বুদ্ধির বিকাশ সীমাবদ্ধ। ইহারা এদে-শীয় লোকদিগকে একেবারেই বুঝে না এবং বুঝিতে চেষ্টাও করে না। নিজ সভ্যতার উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এদে-

শীয় লোকদিগকে অৰ্দ্ধ-অসভ্য 'পৌত্তলিক' বলিয়া নিরীক্ষণ করে। এই 'পৌত্তলিক' শব্দটি কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি পার্সী সকলের প্রতি নির্ব্বিশেষে উহারা প্রয়োগ করিয়া থাকে। ...... এদেশীয় লোকের মধ্যে উহারা কেবল কুলি কিম্বা খানসামার মূর্ত্তিই দেখিতে পায়—উহারা মনে করে এদেশীয় লোকেরা মোট বহিতে, জুতা সাফ করিবার পক্ষেই ভাল। দেশের সম্বন্ধেও উহাদের এই ভাব। উহারা এই দেশকেও কেবল ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান—কৃষিক্ষেত্ররূপেই দর্শন করে।"

কলিকাতা দেখিয়া তাঁহার প্রথম সংস্কার কিরূপ হইয়াছিল তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।—"কলিকাতায় তিনদিন। লোকের জনতায় হতবুদ্ধি ও গ্রীষ্মের তাপে প্রপীড়িত হইয়া কিছুই দেখি নাই। কেবল একটা সাদা রং-এর অনুভব মনের উপর ভাসিতেছিল। আলো সাদা, বাড়িসকল সাদা, সাদা কাপড়-পরা লোকের স্রোত রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। ....দোকান, আফিস, ব্যাঙ্ক, গাড়ি-ঘোড়া, দেয়ালেমারা বিজ্ঞাপনের সংখ্যা দেখিয়া মনে হয় যেন হঠাৎ লণ্ডন কিম্বা প্যারিসনগরের একস্‌চেঞ্জের নিকটে আছি। প্রভেদ এই, বড় বড় কাল কোর্ত্তা-পরা, নলাকার টুপিপরা য়ুরোপীয়ের বদলে সাদা ধুতি-পরা, ক্ষুদ্র, শীর্ণ, সুকুমার স্ত্রীসুলভ মুখশ্রীসম্পন্ন বাঙ্গালীদিগের কলরব। ইহারা সিংহলবাসীদিগের মত অলস ও নিদ্রালু নহে, পরন্তু কর্ম্মশীল, চটুল, দ্রুতগামী ও জীবন-উদ্যমে পরিপূর্ণ। পেন্‌সিলবিক্রেতা 'হকার' হইতে ফিটেনে ঠেসান-দেওয়া স্থূলদেহ বাবু পর্য্যন্ত সবাই অর্থের চেষ্টায় ফিরিতেছে। দেখিয়া বেশ অনুভব হয়, কলিকাতা নগর একটি প্রধান বাণিজ্যের স্থান—পৃথিবীর একটি মহা বিপণি।

আসিয়া ও লণ্ডনের এই সংমিশ্রন বড়ই অদ্ভুত। এক এক সময়ে মনে হয় যেন লণ্ডনের ওয়েষ্টএণ্ডে হাইড্‌পার্কের নিকটে আছি। সেইরকম বড় বড় সোজা রাস্তা, সেইরকম উত্তুঙ্গ প্রাসাদ, সেইরকম গ্রীসীয় স্তম্ভযুক্ত গাড়িবারাণ্ডা, সেইরকম বিস্তৃত পদচারণ-পথ, সেইরকম রেল-ঘেরা চৌকোণা নগরাঙ্গন—রাস্তার কোণে কোণে প্রতিষ্ঠিত সেইরকম ইংরাজি প্রস্তরমূর্ত্তি।”

গ্রন্থকার এক স্থানে ইংরাজের সহিত হিন্দুর তুলনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ—“ইংরাজেরা এরূপ দুর্ণম্য ও কঠিন যে, বিশ কোটি হিন্দুদিগের মধ্যে হারাইয়া গিয়াও উহাদের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই ; পক্ষান্তরে হিন্দুরা লক্ষ ইংরাজের সংস্পর্শেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতায় দেশীয় লোকেরা ইংরাজিতে গ্রন্থ লিখিতেছে, সংবাদপত্র চালাইতেছে দেখিলাম ; শুধু যে তাহাদের ইংরাজি চমৎকার তাহা নহে—তাহাতে ইংরাজি ধরণ-ধারণ ভাব-ভঙ্গি, ইংরাজি ধরণের ভাবনা, ইংরাজি ধরণের অনুভব সমস্তই বজায় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মনে হয় যেন লণ্ডনের কোন উৎকৃষ্ট সমালোচনী পত্রিকার সম্পাদক কোন পাদ্রির লেখনী হইতে নিঃসৃত। এরূপ কতকগুলি ছাঁচ-গ্রাহী আর্টিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা নিজত্বসম্পন্ন কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহিত কিছুকাল কথা কহিয়াই, তাহার ধরণ-ধারণ হাব-ভাব কেতার অবিকল নকল তুলিতে পারে। কারলাইল ইঙ্গ-স্তাক্সন জাতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—উহারা ‘পাষাণ-গঠিত জাতি’। পাষাণ-গঠিত জাতিই বটে ; হিন্দুর কর্দ্দম-ছাঁচে স্বকীয় পাষাণ-মূর্ত্তির ছাপ বসাইয়া উহারা নিজে অবিকৃত রহিয়াছে অথচ আপনাদিগের প্রত্যেক খোঁচ্‌-খাঁচ সেই হিন্দুর সুনম্য ছাঁচে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে।”

ভারতবর্ষের কতিপয় প্রধান নগরের স্বরূপ-লক্ষণ গ্রন্থকার কেমন বেশ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"কলিকাতা ইংরাজের ভারতবর্ষ; বারাণসী ব্রাহ্মণের ভারতবর্ষ; আগ্রা মোগলদিগের ভারতবর্ষ, আর জয়পুর রাজাদিগের ভারতবর্ষ—উপন্যাসের ভারতবর্ষ।"

ইলোরা-গুহায় মহাদেবের মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়া গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন;—"সংহার-শক্তি ও সৃজন-শক্তি ব্রাহ্মণদিগের মতে একই শক্তির বিভিন্ন আকারমাত্র; তাঁহাদের সংহারের ও সৃজনের দেবতা পৃথক্ নহে, একই। ইহাই ব্রাহ্মণদের মহা নূতনত্ব। অন্যান্য জাতি মনুষ্যভাবে দেবতাকে দেখিতে গিয়া—ভালমন্দ, সুন্দর কুৎসিত এইরূপ বিভিন্ন পৃথক পৃথক্ আপেক্ষিক লক্ষণে আপনাদিগের দেবতাদিগকে লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা অসীমের দিক দিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট দেবও নাই দানবও নাই পরন্তু এক নিরপেক্ষ অসীম শক্তি বর্ত্তমান—তিনিই সৃজন করেন, তিনিই সংহার করেন—তিনি একমাত্র 'তৎসৎ'। আরও যথাযথ রূপে বলিতে গেলে, হিন্দুদিগের নিকট মৃত্যু একটি পরিবর্ত্তন মাত্র;—যে পরিবর্ত্তনের সমগ্র শ্রেণীপরম্পরাই জীবন। তাঁহারা যাহা বলেন আধুনিক বিজ্ঞানও তাহাই বলে। জীবন-বিশিষ্ট জীব-বিশেষ এক একটি আকারমাত্র—উপাদান-পুঞ্জীকরণের বিভিন্ন প্রণালীমাত্র। আমাদের দেহের কোষাণু লইয়াই আমাদের সমগ্র দেহ—সেই কোষাণু-সমূহ ক্ষণে ক্ষণে মরিতেছে—তাহাতেই আমরা জীবিত আছি।..................সমস্ত জগৎ মহাসাগরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাহাতে অসংখ্য তর-

ঙ্গের হিল্লোল বহিতেছে; এই প্রত্যেক তরঙ্গ যাহা উঠিতেছে ও পড়িতেছে উহা এক একটি জীবনস্বরূপ, যাহার আরম্ভ ও শেষ আমরা দেখিতে পাই। তরঙ্গসকল যেমন ফেণোচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অমনি এক দুর্দ্দম্য শক্তি আসিয়া উহাদিগকে পুনর্ব্বার আলোকের দিকে উর্দ্ধে উঠাইতেছে। কিন্তু কে না দেখিতে পায়, এই নৃত্যশীল তরঙ্গসকল এক একটি আকার মাত্র, কারণ, প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহাদের উপাদান ভিন্ন হইয়া যাইতেছে—তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক আর কিছুই নহে—তাহাদের মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় সাধারণ শক্তি আছে তাহাই কেবল বাস্তবিক—তাহাই সমস্ত সাগরকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। কোন জীববিশেষ এই মহাশক্তির ক্ষণিক বিকাশমাত্র। সে জীব পরিবর্ত্তিত হউক, বিকৃত হউক, মৃত্যুমুখে পতিত হউক—সেই শক্তির তাহাতে কিছুমাত্র আইসে যায় না। সেই একই শিবশক্তি যাহা জগতের আদিম নৈহারিক অবস্থায় কাজ করিয়াছিল তাহা আজও সূর্য্যে গ্রহনক্ষত্রে বিকাশিত হইয়া আমাদের ভূলোকে মহাদেশরূপে, সমুদ্ররূপে, পর্ব্বতরূপে, জীবরূপে, মনুষ্যরূপে, সমাজরূপে, নগররূপে বিকীর্ণ হইতেছে। সেই একই শিবশক্তি, দৃশ্যমান গতিকে আণবিক গতিতে পরিণত করিয়া কালসহকারে গ্রহের উপর গ্রহের পতন সংঘটন করিয়া, পরিণামে আপনার সেই অনির্দ্দেশ্য আদিম শক্তিতে ফিরিয়া যাইতেছে—যাহা হইতে সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্র, সমুদ্র, মহাদেশ, উদ্ভিজ্জ, সমস্ত জীবপুঞ্জ পুনর্ব্বার নিঃসৃত হইতে পারে। কে বলিতে পারে, এক সৌরজগৎ ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে আর এক সৌরজগতের উপর পড়িয়া কালে সমস্ত সৃষ্টিই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। হিন্দুর প্রজ্ঞা-চক্ষু এই সম্ভাবনীয় নিয়মের একটু আভাস

পাইয়াছে—কারণ, তাঁহারা বলেন, কত অসংখ্য যুগে ব্রহ্মার এক-দিন হয়। সেই কালের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হইয়া, বিক-শিত হইয়া, জীব সৃষ্টি করিয়া, সচেতন হইয়া, পুনর্ব্বার আপনাকে সংকুচিত করিয়া আনিয়া নির্গুণ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই শক্তির রূপক হিন্দুরা আর কিরূপে কল্পনা করিতে পারে—তাই তাহারা শিবকে 'সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রলয়কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করে।"

গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাশ্রয়ী ও সর্ব্বসহিষ্ণু উদারভাব ও উহার গঠনপ্রণালী ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। তিনি এক স্থানে এইরূপ বলেনঃ—"কলিকাতায় একজন ইংরাজ আমার নিকট আক্ষেপ করিতেছিলেন, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে তেমন সফলতা হইতেছে না।...... ব্রাহ্মণেরা ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কৌতূহলসহকারে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক-দিগের কথা শ্রবণ করে। উহাদের ধর্ম্ম এরূপ বহুভাবাত্মক ও বহুমতাত্মক যে উহাকে একটি পদার্থ মনে করিয়া ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না। ইংরাজ মিশনরিরা মুসলমানদিগকে ধর্ম্মের তর্কে যেরূপ পরাস্ত করিতে পারে বলিয়া অভিমান করে হিন্দুদিগকে সেরূপ পরাস্ত করা অসম্ভব। খৃষ্টীয় প্রচারকেরা যতই কেন প্রতি-বন্ধক আনয়ন করুন না, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের গতিরোধ হওয়া দূরে থাক্, হিন্দুধর্ম্মের জীবনীশক্তি ও উপযোগিনী শক্তি এত বলবতী যে, সেইসকল প্রতিবন্ধককে অনায়াসে আত্মসাৎ ও পরিপাক করিয়া সে আপনার কায়া বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এমন কি, ব্রাহ্মণেরা বলেন, তাঁহারা তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে খৃষ্টকেও প্রবিষ্ট করাইতে পারেন যদি খৃষ্টানেরা এই কথাটি মাত্র স্বীকার করেন যে, য়ুরোপীয়দিগের জন্য বিষ্ণু খৃষ্টের আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইপ্রকারে, কলিকাতায় আধুনিক ব্রাহ্মসম্প্রদায় স্বাধীন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখকদিগের নৈতিক একেশ্বরবাদ

অবলম্বন করিয়াছেন। সৃষ্টি হইতে বিভিন্ন ঈশ্বরের অনন্ত অসীম ব্যক্তিগত অস্তিত্ব, জগতের পিতৃবৎ শাসনপ্রণালী, আত্মা ও দেহের ভিন্নতা, পরকালের দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতি সাধারণ দার্শনিক তত্ত্বসকল যাহা আজকাল ইংলণ্ডে প্রচলিত তাহা ঐ সম্প্রদায় আত্মস্থ করিয়াছে। পূর্ব্বকালেও হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মকে একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া পরন্তু উহার সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের উপকরণগুলি আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র উহার সার রসটুকু লইয়া আপনার দেহ পরিপুষ্ট রাখিয়াছে। মাধুর্য্য, বিশ্বজনীন দয়াদাক্ষিণ্য, যাহা ইতরজীব পর্য্যন্ত প্রসারিত—সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা মনে হয় শাক্যসিংহের আত্মা এখনও ভারতভূমিতে বিরাজ করিতেছে। এইপ্রকারে ভারতের ধর্ম্ম বাঁচিয়া আছে ও বৃদ্ধি লাভ করিতেছে—এই ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা সুনম্য ও অবস্থানুগামী এবং ইহা এত জটিল, এত অসংলগ্ন ও পরিবর্ত্তনশীল উপকরণে গঠিত, উহার আকার গমনাভিমুখ, এত অনিশ্চিত যে উহাকে একটি ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না। এক হিসাবে, উহাকে এক ধর্ম্ম বলিয়াও বলা যাইতে পারে, যেমন বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জলবায়ুবিশিষ্ট এই বিচিত্র ভৌগোলিক সমাবেশকে বলিতেছি কিম্বা এই বিচিত্র জাতির ও বর্ণের সম্মিলনকে আমরা হিন্দুজাতি বলিতেছি। এ বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঐক্যস্থল আছে। ভারতীয় ধর্ম্মের সূত্রস্থানে অদ্বৈতবাদ প্রথমে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়—তাহার পর ত্রিশ শতাব্দী কাল ধরিয়া, জিত, ও বিজেতাদের ধর্ম্মমত মিশ্রিত হইয়া গিয়া সেই অদ্বৈতবাদ একটু তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছে—আজিকার দিনে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নৈতিক ও দার্শনিক মতের জাল হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া এরূপ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে

যে, উহার শৃঙ্খল আর খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এইপ্রকার ভারতের বিস্তীর্ণ কর্দ্দমময় গঙ্গানদীও বিভিন্ন স্রোতস্বিনীর চির-প্রবাহী স্রোত ধরিয়া পরিপুষ্ট হইয়া রাশি রাশি উদ্ভিজ্জাবশেষের ভারে আক্রান্ত হইয়া বন, জঙ্গল, পুরাতন জনপদ, আধুনিক ইংরাজ নগর প্রভৃতির মধ্য দিয়া অনিশ্চিত গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে এবং বিস্তৃত ভূমি প্লাবিত করিয়া, উর্ব্বরা করিয়া, নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া সাগরে মিলাইয়া গিয়াছে।" পাঠককে মূলগ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি—তাহাতে যে তিনি আমোদ ও উপদেশ একাধারে প্রাপ্ত হইবেন ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

প্রসঙ্গ-কথা।

(তিনখানি পত্র)।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অনারেব্‌ল্ জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পৌষমাসের সাধনায় প্রকাশিত "শিক্ষার হের-ফের" নামক প্রবন্ধের লেখক উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে পত্র পাই-য়াছেন তাহা আমরা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি—প্রার্থনা করি তাঁহারা আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, "পৌষমাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতিছত্রে

আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"—কিন্তু কেন যে তাঁহার "ক্ষীণস্বর" কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হোসের মহতী সভা "অসংখ্য বালক বলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে" কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিম বাবুর ক্ষীণস্বর যদি বা কোন কর্ণ ভেদ করিতে না পারে তাঁহার তীক্ষ্ণবাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

গুরুদাস বাবু লিখিয়াছেন—"আপনার 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা (যথা, ইয়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা, এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কএকজন সভ্য বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই (Calc. University minutes for 1891–92, pp. 56-58)। * * *

কি উপায়ে যে এই উপকার সাধন হইতে পারে তাহা বলা বড় সহজ নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় দুইদিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, বঙ্গভাষায় এমন সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে

রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার যতদূর উৎসাহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক স্থলে সভা সমিতির কার্য্য ও বক্তৃতা ইংরাজিতে হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু এমনও অনেক স্থল আছে যেখানে তাহা বঙ্গভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায়; এবং সেই সকল স্থলেই স্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও অনেকটা উপকার হইতে পারে।”

আনন্দমোহন বাবু লিখিয়াছেন—“পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত ‘শিক্ষার হেরফের’ নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব্ব হইতে আমারও সেই মত; সুতরাং সেই মত এমন অতি সুন্দর ভাবে এবং দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই। প্রবন্ধটি যেমন গুরুতর বিষয়সম্বন্ধীয়, ভাবগুণে এবং ভাষালালিত্যে আবার তেমনি মধুর ও উপাদেয় হইয়াছে।

এখন আলোচ্য প্রদর্শিত অনিষ্টের প্রতিকারের উপায় কি? বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা এবং নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্ত্তন করিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পাব্লিক্ ওপিনিয়ান অনেকটা পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে

আনিব মনে করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তন সাধিত না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি। আশা করি, এই পরিবর্ত্তন সংসাধন পক্ষে আপনার সুন্দর প্রবন্ধটি বিশেষ সাহায্য করিবে এবং এই উদ্দেশে এই প্রবন্ধের বহুলরূপে প্রচার প্রার্থনীয়।”

উক্ত তিন পত্র হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ বাঙ্গালীর শিক্ষায় বাঙ্গলার কোন উপযোগিতা স্বীকার করেন না, এবং আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই প্রধানতঃ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

অবশ্য, আমাদের স্বদেশীয়েরা যে এ সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। যদি না করিতেন তবে আমাদের দেশের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? কিন্তু কিছু আশ্চর্য্যও আছে। আমরা কখনও কিছুতে আপত্তি করি নাই বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি; দেশের উপর যখন যে কোন অমঙ্গলস্রোত আসিয়া পড়িয়াছে আমরা বিনা আপত্তিতে তাহার নিকট মস্তক নত করিয়া দিয়াছি; স্বদেশের কথা, ভবিষ্যতের কথা একমুহূর্ত্তের জন্য ভাবিও নাই। আজ আমরা ইংরাজের কল্যাণে যদি বা আপত্তি করিতে শিখিলাম, অভাগার অদৃষ্ট এমনি, অনেক সময় দেশের মঙ্গল প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বসি।

বোধ হয়, আপত্তি করিতেই একটা সুখ আছে। নতুবা, স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না একথা কে না বোঝে?

কিন্তু দুর্দ্দৈবক্রমে সহজ কথা না বুঝিলে তাঁহার মত কঠিন কথা আর নাই। কারণ, কঠিন কথা না বুঝিলে সহজ কথার সাহায্যে বুঝাইতে হয়, কিন্তু সহজ কথা না বুঝিলে আর উপায় দেখা যায় না।

দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোন গতি নাই এ কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

রাজা কত আসিতেছে কত যাইতেছে; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরাজ আসিল, আবার কালক্রমে ইংরাজও যাইবে—কিন্তু ভাষা সেই বাঙ্গলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গলাই চলিবে; যাহা কিছু বাঙ্গলায় থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরাজ যদি কাল চলিয়া যায়, তবে পরশ্ব ঐ বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বড় বড় সৌধবুদ্বুদের মত প্রতীয়মান হইবে।

ভালরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলাকে বুদ্বুদ বলিয়া বুঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোক-প্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্পস্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোন মূল নাই। তীরে বসিয়া ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এইরূপ ধবলাকার, একটু অন্তরে অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই স্নিগ্ধ শীতল চিরকালের নীলাম্বুধারা।

শিক্ষা যদি সেই তলদেশে প্রবেশ না করে, জীবন্ত মাতৃ-

ভাষার মধ্যে বিগলিত হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।

এ সব কথা ইতিহাসে অনেকবার আলোচিত হইয়া গেছে, এবং অনেক ইংরাজ লেখকও এ কথা লিখিয়াছেন। জর্ম্মণীতে যত দিন না মাতৃভাষার আদর হইয়াছিল তত দিন তাহার যথার্থ আত্মাদর এবং আত্মোন্নতি হয় নাই। শিক্ষা-সভার যে সভ্যগণ মাতৃভাষার প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেন তাঁহারা এ সমস্ত উদাহরণ অবগত আছেন, সেইজন্যই কথাটা তাঁহাদের বুঝানো আরো কঠিন, কারণ, বুঝাইবার কিছু নাই।

আর একটা যুক্তি আছে। এতদিনকার ইংরাজি শিক্ষাতেও শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রকৃত মানসিক বিকাশ দেখা যায় না। তাঁহারা এমন একটা কিছু করেন নাই যাহাকে পৃথিবীর একটা নূতন উপার্জ্জন বলা যাইতে পারে, যাহাতে মনুষ্যজাতির একটা নূতন গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ কেহ ভাল ইংরাজি বলেন, কেহ কেহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করেন, কিন্তু ধাত্রীর অঞ্চল ছাড়িয়া কেহ এক পা হাঁটিতে পারেন না।

তাহার প্রধান কারণ, বিদেশী ভাষার ভার বড় গুরুতর। একজনের খোলস আর একজনের স্কন্ধে চাপাইলে সে কখনই তাহা লইয়া বেশ স্বাধীন সহজভাবে চলিতে পারে না। আমাদের ভাবকে বিদেশী ভাষার বোঝা কাঁধে লইয়া চলিতে হয়,

প্রতিপদে পদস্খলনের ভয়ে তাহাকে বড় সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়, কোন মতে মান বাঁচাইয়া বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিতে পারিলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু ততটুকু করাই এত কঠিন যে, সেইটুকু সুসম্পন্ন করিলেই পরম একটা গৌরব অনুভব করা যায়—সেটাকে খু একটা মহৎ ফললাভ বলিয়া ভ্রম হয়। অন্য দেশে একটা বড় কাজের যতটা মূল্য, আমাদের দেশে একটা অবিকল নকলের মূল্য তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। এতটা করিয়া যাহা হইল তাহা যে কিছুই নহে এ কথা লোককে বোঝানো বড় শক্ত। এই-জন্য মুখুয্যের ছেলেকে গড়গড় শব্দে ইংরাজি বক্তৃতা করিতে শুনিলে বাঁড়ুয্যের ছেলেকেও সেই চূড়ান্ত গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে তাহার বাপের প্রবৃত্তি হয় না। তখন যদি তাহাকে বুঝাইতে বসা যায় যে, বার্ক্, ব্রাইট্, গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের ভাষার সহিত প্রচুর পরিমাণে পানা পুকুরের জল মিশাইয়া একটি বঙ্গশাবক যে বহুকষ্টে অথবা অল্পায়াসে গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর কথা বলিয়া গেল উহাতে কোন কাজই হইল না, উহা না আমাদের দেশের অন্তঃকরণে স্থায়ী হইল, না বিলাতী সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিল—কেবল নিষ্ফল শিলাবৃষ্টির ন্যায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী চট্‌পট্ শব্দের করতালি আকর্ষণ করিয়া শস্যবীজহীন পথকর্দ্দমের সহিত মিশাইয়া গেল; উহা অপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টারও সহস্রগুণ সফলতা আছে; তবে এ সব কথা বাঁড়ুয্যের কর্ণে স্থান লাভ করে না; মুখুয্যের ছেলের ইংরাজি ফাঁকা আওয়াজের কাছে স্বদেশের সমস্ত দাবী তাহার নিকট এতই ক্ষীণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়!

বুঝাইবার পক্ষে আর একটা বড় বাধা আছে। অনেকে এমন কথা মনে করেন, আমরাও ত আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি—কই, আমাদের মানসিক ঔৎকর্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে ত কখন তিলমাত্র সংশয় উপস্থিত হয় না। বুঝিতে পড়িতে কহিতে বলিতে আমরা ত বড় কম নহি।

সে কথা অস্বীকার করিয়া কাজ নাই। তাঁহাদিগকে বলা যাক্ আপনারা কিছুতেই ন্যূন নহেন। কিন্তু আরও ঢের বেশী হইতে পারিতেন। এখনি যদি আপিসের কাজ সুশৃঙ্খলমত নির্ব্বাহ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেছেন, বিদেশী ভাষার বাধা অতিক্রম করিতে না হইলে না জানি কি হইতেন এবং কি করিতেন! তাঁহাদিগকে আরো বলা যাইতে পারে যে, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র। আপনারা যে এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এত বড় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আপনাদেরই বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে, শিক্ষাপ্রণালীর নহে। কিন্তু দেশের সকলেই ত আপনাদের মত হইতে পারে না!

শিক্ষায় স্বদেশী ভাষা অবলম্বন করিলে কেন যে মনের বিশেষ উন্নতি হয় সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে সৌভাগ্যবান সভ্যজাতিরা দেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করে তাহারা প্রথম হইতেই ধারণা করিবার, চিন্তা করিবার অবসর পায়। আরম্ভ হইতেই তাহাদের ভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে। কেবল যে কতকগুলা মুখস্থ জ্ঞান অর্জ্জন হয় তাহা নহে, মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।

এক জন এণ্ট্রেন্স-ক্লাসের ছোকরা কতটুকুই বা বুঝিতে পারে

কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারে। সে দশ বারো বৎসর কাল খেলাধূলো ভুলিয়া প্রাণপণ করিয়া অতি যৎসামান্য ইংরাজি শিখে, তাহাতে তাহার মানসিক দৈন্য কিছুই দূর হয় না। নিজে কিছু বুঝিয়া উঠা, কিছু ভাবিয়া বলা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কারণ, সকলি অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কথার মানে দেখিতে দেখিতে, "কী" মুখস্থ করিতে করিতে হতভাগ্য হয়রান্ হইয়া গিয়াছে; এপর্য্যন্ত মনের মধ্যে একটি ভাব রীতিমত ধারণা করিবার অবকাশ তাহার হয় নাই।

কেবল তাহাই নহে। যেমন আহার করিয়া বলসঞ্চয়পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া পুনশ্চ তাহা কিয়দংশ ব্যয় না করিলে ক্ষুধা হয় না, পরিপাক হয় না, সে আহার সম্যক্‌রূপ কাজে লাগে না—তেমনি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে, আলোচনা করিতে না পারিলে সে শিক্ষা অপরিপক্ক অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, তাহার অধিকাংশই মনের সহিত মেশে না। য়ুরোপে ছাত্রেরা যেটুকু যখন শেখে সেটুকু তখনি প্রকাশ করিতে পারে। লেখায় না হোক্, কথায়। কিন্তু আমরা বহুকাল পর্য্যন্ত মূক। বলিবার কোন বিষয়ও পাই না, বলিবার একটা ভাষাও নাই। কথার মানে বুঝিতে এত কাল লাগে যে, ভাব বুঝিতে অনেক বিলম্ব হয়, কেবল ভাষা রচনা করিতে এতদিন কাটিয়া যায় যে, ভাব প্রকাশ করিতে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হয়।

কোন কোন ইংরাজ অধ্যাপক আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু কচুর আবাদ করিয়া, কলার কাঁধি

পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া পরিতাপ করা শোভা পায় না। ঢেঁকির কাষ্ঠ নিয়মিত পদাঘাত দ্বারা চালিত হইয়া অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া সুচারুরূপে ধান ভানিতে পারে, কিন্তু তাহাতে পাতা গজায় না, ফল ফলে না। এজন্য অন্য যে খুসি আক্ষেপ করুক্, কিন্তু যে ছুতার সজীব গাছ কাটিয়া এই নির্জ্জীব ঢেঁকি বানাইয়াছে সে কেন বিস্মিত হয়? মানুষের মনকে যদি মনরূপে বাড়িতে দিতে তবেইত মধ্যে মধ্যে ওরিজিন্যালিটি বিকাশ লাভ করিত, কিন্তু শিশুকাল হইতে তাহাকে যদি যন্ত্ররূপে পরিণত করিলে তবে সে নিরুপায় হইয়া কেবল শেখা-কথা আওড়াইতে এবং অভ্যস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করি, জর্ম্মণি যখন ফরাসী শিখিত, তখন কি সে ফরাসী ভাষায় ওরিজিন্যালিটি দেখাইয়াছিল? জর্ম্মণ-রচিত কোন্ ফরাসী গ্রন্থ ফরাসী সাহিত্যে স্থায়ী সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে? ফ্রেঞ্চ এবং জর্ম্মণদের ভাষা, ভাব, দেশের প্রকৃতি, ইতিহাস ও ধর্ম্মকর্ম্মের যতটা ঐক্য আছে আমাদের সহিত ইংরাজের কি তাহার শতাংশ আছে? আমরা সেই ইংরাজি শিখিয়া সেই ইংরাজি ভাষায় ইংরাজ অধ্যাপকের নিকট ওরিজিন্যালিটি দেখাইব? নিজের পা খোয়াইয়া কাঠের পা পরিয়া চলিতে পারি এই পরম সৌভাগ্য, নৃত্য করিতে পারিনা বলিয়া ধিক্কার দাও কেন?

সে যাই হোক্, কথাটা সত্য যে, আমাদের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির স্ফূর্ত্তি হয় না—এবং তাহার প্রধান কারণ সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই।

অবশ্য, ওরিজিন্যালিটি না থাকিলেও কাজ চলিয়া যায়, কৃত্রিম

উহা বাড়ার ভাগ মাত্র। কিন্তু একটা কাজ সমাধা করিতে ঠিক যতটা শক্তির আবশ্যক তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হাতে রাখিতেই হয়। কুড়িশ জনকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিলে ন্যূনপক্ষে আড়াইশ জনের মত আয়োজন করিতে হয়। সমাজের সকল বিভাগে যখন এই বাড়্তি ভাগ, এই ওরিজিন্যালিটি, এই প্রতিভা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায়, সমাজের সমস্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে। অতএব ওরিজিন্যালিটি সমাজের সচ্ছলতা ও জীবনীশক্তির একটা লক্ষণ।

পরন্তু আমাদের শিক্ষায় আমাদের অত্যাবশ্যকটুকুই ভাল করিয়া চলেনা ওরিজিন্যালিটির অভাবই তাহার প্রধান প্রমাণ। যেখানে বড়লোক আছে সেখানে ছোট কাজ রীতিমত চলিতেছে। যতক্ষণ অপর্য্যাপ্ত না হয় ততক্ষণ সমাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না।

দেশী ভাষায় যদি আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারিতাম তবে সে শিক্ষা আমাদের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হইত। আমরা তাহার মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ সঞ্চরণ করিতে পারিতাম, তাহার মধ্যে বাস করিতে পারিতাম এবং ক্রীড়া করিতেও পারিতাম। তাহার মধ্যে কাজও পাইতাম অবকাশও পাইতাম, সেও আমাকে গঠন করিত আমিও তাহাকে গঠন করিতাম। শিক্ষা এবং মনের মধ্যে খুব একটা স্বাভাবিক চলাচল থাকিত।

এখন কথা হইতে পারে বাঙ্গালায় এত বই কোথায়? তবে সেই কথাই হোক্। বাঙ্গালায় যাহাতে পাঠ্য বই হয় সেই চেষ্টা

করা যাক্। সিণ্ডিকেট-সভা যদি প্রসন্ন হন, যদি অনুমতি করেন তবে দরিদ্র বাঙ্গালী একাজে এখনি নিযুক্ত হয়। ম্যাক্‌মিলান্ সাহেবকে অনেককাল অন্ন যোগাইয়াছি, এখন ঘরের অন্ন ঘরের উপবাসী ছেলেদের মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উঠিলে দেখিয়াও চক্ষু সার্থক হইবে।

ওরিজিন্যাল কেতাব না পাওয়া যায় ত তর্জ্জমা করিতে দোষ নাই। জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানকারই হৌক্, ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারে পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতাভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি। যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মত সহজে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, কেবল সঙ্কীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।

কিন্তু বোধ করি প্রধান আপত্তি এই যে, শিশুকাল হইতে সমস্ত শিক্ষা ইংরাজি ভাষায় নির্ব্বাহ না হইলে বাঙ্গালীর ছেলে ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিতে পারিবে না।

চোর মনে করে যত অধিক পরিমাণে লইব তত শীঘ্র শীঘ্র চুরি শেষ হইবে। থলির মুখ সঙ্কীর্ণ; তাহার মধ্যে দুই হাত প্রবেশ করাইয়া দেয়; বহুলোভে দুই মুঠা ভরিয়া যখন হাত বাহির করিতে চায় তখন হাত বাহির হয় না, অবশেষে মুঠা হইতে অধিকাংশ চৌর্য্য সামগ্রী যখন পড়িয়া যায় তখন হাত বাহির হইয়া আসে।

আমাদের শিক্ষা-খনির প্রবেশপথও বড় সঙ্কীর্ণ, কারণ, সে গুলি বিদেশী ভাষা। তাহার মধ্যে দুই মুঠা ভরিয়া আমরা লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু যখন হাত টানিয়া লই তাহাতে কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? বোঝা ভারি করা সহজ, বহন করাই শক্ত।

সরল হইতে ক্রমে দুরূহে অধিরোহণ করাই শিক্ষার অভিক্রম। শিক্ষার পদ্ধতিটি আয়ত্ত করাই শিক্ষার একটি প্রধান বাধা, সেই ছাঁচটি একবার গড়িয়া লইতে পারিলে অনেক কঠিন শিক্ষা সহজ হইয়া আসে। ব্যাকরণশিক্ষা ভাষাশিক্ষার একটি প্রণালী। কিন্তু যে ভাষার কিছুই জানি না সেই ভাষার ব্যাকরণ হইতেই যদি প্রথম ব্যাকরণ শিক্ষা হয়, তবে শিশুদের মস্তিষ্কের প্রতি কি অন্যায় উৎপীড়ন করা হয়! কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতি অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট্‌ শব্দগুলি ছেলেদের পক্ষে কত কঠিন সকলেই জানেন; উপর্য্যু-পরি সহজ উদাহরণের দ্বারা ব্যাকরণের কঠিন সূত্রগুলি কথঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। কিন্তু ভাষা এবং ব্যাকরণ দুই যখন বিদেশী তখন কাহার সাহায্যে কাহাকে বুঝিবে? তখন সূত্রও অপরিচিত, উদাহরণও অপরিচিত। যে ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত সেই ভাষার সাহায্যে ব্যাকরণজ্ঞান লাভ করাই প্রশস্ত নিয়ম, অব-শেষে একবার ব্যাকরণজ্ঞান জন্মিলে সেই ব্যাকরণের সাহায্যে অপরিচিত ভাষা শিক্ষা সহজ হইয়া আসে।

অতএব, শিখিবার প্রণালীটি যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পরি-পক্ক হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক পীড়ন, কঠিন চেষ্টা ও শরীর

মনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কত অল্পসময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

বাল্যকাল হইতেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক্ কিন্তু বাঙ্গলার আনুষঙ্গিক রূপে অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাঙ্গলা শিক্ষা ইংরাজি শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাঙ্গালায় শিখাইয়া ইংরাজিকে কেবল ভাষাশিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরাজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়। বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া লিখিবার যথার্থ অবসর থাকে।

সকলেই জানেন আজকাল আমাদের ছাত্রেরা যে পরিমাণে অনেক বিষয় শেখে সেই পরিমাণে ইংরাজি অল্প শেখে। তাহার প্রধান কারণ, আগাগোড়া মুখস্থ করিতে গিয়া ইংরাজি বুঝিবার এবং রচনা করিবার সময় পায় না। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাঙ্গলায় পাইতাম তবে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা যে কত সহজসাধ্য হইত তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি এখনকার অপেক্ষা গভীরতর এবং ইংরাজি ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা এখনকার অপেক্ষা অনায়াসে দুরূহতর করা যাইতে পারিত।

বঙ্কিম বাবুর ক্ষীণস্বর যাঁহাদের শ্রুতিগম্য হয় নাই, আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না, হইলেও কোন ফলের প্রত্যাশা করি না। কিন্তু যে পাঠকগণ অনুগ্রহ অথবা অনুরাগবশতঃ আমাদের বাঙ্গলা কাগজ পড়িয়া থাকেন তাঁহা-দের প্রতি কিঞ্চিৎ ভরসা রাখি। তাঁহারা যদি দেশের মঙ্গলের

জন্য কথাটা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন, এবং ঘরে ঘরে আপন আপন সন্তানকে মাতৃস্তন্যের ন্যায় মাতৃভাষার দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট ও পরিণত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তবে কালক্রমে দেশের যে শ্রী ও উন্নতি হইবে সভাসমিতিতে সহস্র বৎসর ইংরাজি বক্তৃতা করিয়াও সেরূপ হইবে না। কেবল ভয় হয় এই জন্য যে, বাঙ্গালী স্থায়ী গৌরব অপেক্ষা ক্ষণিক অহঙ্কার-তৃপ্তি অধিক ভালবাসে, ভবিষ্যৎ কার্য্যসিদ্ধির অপেক্ষা উপস্থিত করতালির জন্য অধিক লালায়িত এবং দেশের বৃহৎ কল্যাণ অপেক্ষা আশু ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভন গুরুতর; তাহা ছাড়া মুখে যেমনই গর্ব্ব করি, আত্মশক্তি, আত্মভাষা এবং কোন আপনার জিনিষের প্রতিই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস নাই; মনে স্থির করিয়া বসিয়া আছি যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সমস্ত উন্নতি সাধন করিয়া দিবে, আমরা কেবল দরখাস্ত করিব, ইংরাজিভাষা-তেই আমাদের সমস্ত জাতীয় শিক্ষা সাধন করিবে, আমরা কেবল অভিধান ধরিয়া মুখস্থ করিয়া গেলেই হইবে।

"সাহিত্য"-পাঠকদের প্রতি।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে "হিং টিং ছট্‌" নামক একটি কবিতা সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত কবিতা যে চন্দ্রনাথ বাবুকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় "সাহিত্য" পত্রের কোন লেখক পাঠকদের মনে এইরূপ সংশয় জন্মাইয়া দেন। আমি তাহার প্রতিবাদ "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিই,

তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদের অন্যায় সন্দেহ মোচন করা কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। এই কারণে, সাধনা পত্রিকা আশ্রয় করিয়া আমি পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, উক্ত কবিতা চন্দ্রনাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে এবং কোন সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

এতৎ প্রসঙ্গে এইস্থলে জানাইতেছি, যে, চন্দ্রনাথ বাবুর উদারতা ও অমায়িক স্বভাবের আমি এত পরিচয় পাইয়াছি যে, নিতান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান না করিলে ও তাঁহাকে বর্ত্তমান কালের একটি বৃহৎসম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলিয়া না জানিলে তাঁহার কোন প্রবন্ধের কঠিন সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তিমাত্র হইত না। চন্দ্রনাথ বাবুকে বন্ধুভাবে পাওয়া আমার পক্ষে গৌরব ও একান্ত আনন্দের বিষয় জানিয়াও আমি লেখকের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাধনা।

উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র।

ভূগর্ভের নিম্নস্তরে যেমন বহিরুপদ্রব হইতে নিরালায় বহু পূর্ব্বতন যুগের কঙ্কালাবশেষ পাষাণ হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মবিপ্লব সেইরূপ বহিঃশত্রুর নিরন্তর আক্রমণ হইতে দূরে উড়িষ্যার উপকূলে পাষাণখোদিত হইয়া কথঞ্চিৎ রহিয়া গিয়াছে। সিন্ধুপার হইতে মুসলমান আক্রমণের বন্যা এত দূর-প্রান্ত অবধি আসিয়া প্রায় পঁহুছিত না, এবং কাঠজুড়ি ও মহা-নদীর তীর হইতে মুসলমান-সেনাকে দুই চারিবার এমন বিফল-মনোরথ হইয়াও ফিরিতে হইয়াছে। অবশেষে উড়িষ্যা যদিও মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তথাপি এই নদী-পাহাড়-বন-জঙ্গলসমাকীর্ণ ভূখণ্ডের সর্ব্বত্র তাহার স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মন্দিরে মন্দিরে দেবতাগণ মধ্যে মধ্যে লাঞ্ছিত হইয়া-ছেন এবং প্রাচীন কীর্ত্তিও দু'একটা বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত দেবমন্দিরের পাষাণে মস্‌জিদের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই।

সেইজন্যই উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে, আপনার উন্নত মহিমা প্রচার করিতে অভ্রভেদী পাষাণ-শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় পঞ্চবিংশতি শতাব্দী ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবন-গৌরব রক্ষা

করিতেছে। পুরীতে জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরে শিব, যাজপুরে পার্ব্বতী, বিণায়কে গণেশ, কণারকে দেবতাহীন সূর্য্যমন্দির, খণ্ডগিরিতে পরিত্যক্ত বৌদ্ধ গুম্ফাবলী; নদীতীরে, গিরিশিখরে, সাগরবেলায়, যেখানে প্রকৃতি দেবী আপন সৌন্দর্য্য ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, সেইখানেই নীল দিগন্তের গায়ে হয় দেবালয়, নয় অনুশাসন-স্তম্ভ, নয় প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সমস্ত উৎকলদেশ যেন দেবতার বিহারভূমি এবং মানবের তীর্থক্ষেত্র।

ভারতবর্ষের বহুদূরপ্রান্ত হইতে বহুসহস্র যাত্রী—বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়—এই সকল প্রাচীন মন্দিরের দ্বারে আসিয়া নিত্য পুণ্য অর্জ্জন করিয়া যায়। বৈতরণী পার হইয়াই তাহারা মনে মনে যেন কোন্ পুণ্যলোকে উপনীত হয়—এখানে ব্রাহ্মণ নাই শূদ্র নাই, উচ্চ নাই নীচ নাই, ক্ষুদ্র জাতি, ক্ষুদ্র মান, ক্ষুদ্র গর্ব্ব এ রাজ্যের নহে।

সম্মুখে আম্রমুকুলিত ছায়াময় প্রাচীন পথ, কাঠজুড়ির বালুগহ্বর হইতে উঠিয়া পুরুষোত্তমের দ্বার অবধি প্রসারিত। এই পথ বাহিয়া চিরন্তন মানবপ্রবাহ নিশ্চল দেবতার দ্বারে আপন বেদনা জানাইতে আসে। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণাঙ্গী বাসন্তী নগনদী পথের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদুপ্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। দূরে মেঘের মত নীল শৈলশ্রেণী কখনও ছায়াসুপ্ত কখনও রবিকিরণে উদ্ভাসিত।

বালুহস্তা হইতে অদূরে দেখা যায়, বিজন ধাউলির পাহাড়, শিরোদেশে প্রাচীন দেবমন্দিরের শ্যাম মুকুট। দেবতাহীন ব্রাহ্মণহীন মন্দিরে যাত্রী আর কেহ যায় না। পুরাতত্বান্বেষী শুধু এই গিরিপাদমূলে দাঁড়াইয়া রাজা অশোকের পালি অনুশাসন পাঠ করিয়া আসেন, এবং প্রাচীনা দয়া নদী নিভৃত কল্লোলে

সেই পুরাতন দিনের কাহিনী কহিয়া যায়—যখন এই একাদশ অনুশাসন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত জন-সমাজে জীবে অহিংসা এবং সর্ব্বভূতে দয়া প্রচার করিত।

আরও কিছুদূর গিয়া প্রাচীন শিল্পের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ভুবনেশ্বর—আম্রকাননের মধ্য হইতে সমুচ্চ চূড়া উঠিয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত শৈব মতের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ভুবনেশ্বর তাহারই সাক্ষীস্বরূপে দাঁড়াইয়া। কেশরী বংশ তখন উড়িষ্যার অধিপতি। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গুরু এবং শিব তাঁহাদের দেবতা। রাজা ললাটেন্দু কেশরী বৌদ্ধধর্ম্মকে আড়াল করিয়া খণ্ডগিরির সম্মুখ-প্রদেশে ভুবনেশ্বরের দেবধানী স্থাপন করিলেন। সহস্র নাগবালা প্রস্তরস্তম্ভের বেষ্টনে শতপাকে চির-আবদ্ধ হইল—আবক্ষ নারীদেহের শিরোভাগে যেন মন্ত্রবলে অযুত ফণা পাষাণ হইয়া রহিল। শত দেব, শত দেবী, নবগ্রহ, নব রস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, যৌবনবিলাসকলা পাষাণে চির-মুদ্রিত হইয়া নিশ্চল শিল্পসৌন্দর্য্যে দেশদেশান্তরের বিস্মিত নয়ন আকর্ষণ করিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খণ্ডগিরির শিখরদেশ হইতে প্রতিদিন চাহিয়া দেখিতেন, এক একখানি করিয়া পাষাণের পর পাষাণ উঠিয়া তাঁহাদের প্রতিদিবসকে নিষ্ফল করিতেছে। একটির পর একটি এমনি করিয়া সাত সহস্র মন্দির শির উত্তোলন করিয়া উঠিল। নিরাশহৃদয়ে সন্ন্যাসীর দল খণ্ড-গিরি পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

আরও যোজনপথ অতিক্রম করিলে, সত্যবাদীতে বসিয়া নিরীহ সাক্ষীগোপাল পুরুষোত্তমযাত্রীর সংখ্যা গণিয়া দিনাতি-পাত করিতেছেন। জগন্নাথদেবের প্রাপ্য অংশ হইতে তিনিও যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করেন।

পুরীর পথপার্শ্বে দূরে নিকটে এমনি মন্দিরের পর মন্দির। সারা পথ জুড়িয়া পাণ্ডার দল শিখা এবং উপবীত আস্ফালন করিয়া ফিরিতেছে এবং দূরাগত যাত্রীগণ মধ্যে দুই হস্তে সুলভ আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়া দুর্লভ তাম্ররজত সঞ্চয় করিতেছে। যাত্রীরও অন্ত নাই। শকটের পর শকটপ্রবাহ—আবরণের ছিদ্র-পথ দিয়া শত পশ্চিম-কুলরমণীর কুবলয়নেত্র, বঙ্গগৃহিণীর উজ্জ্বল স্নেহদৃষ্টি পথক্লিষ্ট পথিকজনের অন্তরে গৃহকাতর বেদনা জন্মাইয়া দেয়।

পুরুষোত্তমে আসিয়া এই দীর্ঘ যাত্রার অবসান। যাত্রীহৃদয়ের বহুদিনের বহুযত্নপোষিত আশার প্রথম সফলতা। মন্দিরের মহা অন্ধকার মধ্যে ক্ষীণ দীপালোকে নিষদেহ জগন্নাথ ভগিনী সুভদ্রা ও ভ্রাতা বলরামের সহিত সিংহাসনে বসিয়া। দিবালোক সেখানে পঁহুছে না, সংসার রুদ্ধদ্বার; শুধু ভক্তি এবং স্তুতি, বেদনা এবং আবেদন, নিরাশহৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন এবং দুঃখগাথা সেখানে দেবতার সিংহাসনতলে নিত্য স্তূপাকার হয়। ব্রাহ্মণ নৈবেদ্য নিবেদন করেন, দেবতা প্রসাদ করিয়া দেন; সেই মহাপ্রসাদ বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, রাজা প্রজায়, স্ত্রীপুরুষে মিথ্যা উচ্চনীচ-ভেদ ঘুচাইয়া দেয় এবং হৃদয়ে হৃদয়ে পুণ্য প্রীতি সঞ্চারিত করে।

এই জগন্নাথের মাহাত্ম্য বৃহৎ ভারতভূমিতে অদ্বিতীয়। তিনি শুধু ব্রাহ্মণের দেবতা নহেন, আচণ্ডাল সকলেরই তাঁহাতে সমান অধিকার। তিনি বিষ্ণুর অবতার, পতিতের পাবন, পরম অহিংসক; তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সর্ব্বদেশ সর্ব্বলোক একাকার। জাতিভেদময় ভারতবর্ষে জাতিভেদের এমন গুরুতর প্রতিবাদ আর কোথাও দেখা যায় না। এবং এই জাতিবিহীন মহাতীর্থে

আসিয়া নাণকী, কবীরী, প্রাচীনপন্থী, নব্যপন্থী নানা মতের নানা মুনি সেই একই জগন্নাথদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়েন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের দেবতা অবধি জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে স্থানলাভ করিয়াছেন এবং সেই বিমলা দেবীর দেবভোগ সম্বন্ধেও ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নাই।

জগন্নাথের মাহাত্ম্যের কারণ ইহাই বটে। ইহার মধ্যে যে সর্ব্বগ্রাসী সামঞ্জস্যশক্তি আছে তাহাতেই সকল সম্প্রদায় এখানে আসিয়া মিলিত হয়। জগন্নাথ বৈষ্ণব বলিয়াই সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু তাঁহার মন্দিরে অনেক তন্ত্রাচারের বৈষ্ণবীকরণ হইয়াছে শুনা যায়। এবং যবা-জল ও মাসকলাই ভোগের ব্যবস্থা নাকি তান্ত্রিক কারণসলিল ও আমিষাংশেরই বৈষ্ণব বিধান।

জগন্নাথদেবকে যাঁহারা উত্তমরূপে জানেন, তাঁহারা একবাক্যে জগন্নাথদেবের পরকে আপন করিবার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কেমন দ্বিধাশূন্য মনে তিনি সুভদ্রা ও বলরামকে লইয়া বৌদ্ধ সংঘ-ধর্ম্ম-বুদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। অধিক দিনের কথা নয়, চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনও বুদ্ধের দন্ত রথারোহণে মন্দির হইতে বাটিকান্তরে গিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহন করিয়া আসিত; জগন্নাথ অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনাকে বুদ্ধের দন্তমর্য্যাদার স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তিনি সাধারণের দেবতা—এবং উড়িষ্যার জনসাধারণের সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জয় পরাজয়ে, পলায়নে প্রত্যাগমনে, সকলের সহিত তিনিও চিরদিন আপন গুরু দেব-অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। লোকরঞ্জনার্থে ভিন্ন মতের বিধি বিধান দুই চারিটা আত্মসাৎ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন কিসের?

কিন্তু শুধু জগন্নাথ বলিয়া নহে—উৎকলভূখণ্ডের সর্ব্বত্র মত-বিরোধের মধ্যে একটা নির্ব্বিবাদ ঐক্যস্থাপনচেষ্টা দেখা যায়। বৈষ্ণবের পক্ষে শিবের মন্দির নির্ম্মাণ উড়িষ্যায় একটা মহা পুণ্য-কার্য্য বলিয়া গণ্য। অথচ ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে বৈষ্ণবে শৈবে অনেক সময় মুখ-দেখাদেখি নাই। কাশীর সম্মুখ দিয়া যাইতে হইলে অনেক ধনী বৈষ্ণব নৌকার সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দেন পাছে দৈবক্রমে বিশ্বেশ্বরের মহিমা নেত্রপথে পতিত হয়, এবং রাধাকৃষ্ণের নামমাত্র কর্ণগোচর হইলে অনেক ভক্ত শৈব আহত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন!

উড়িষ্যায় জগন্নাথের মন্দিরে শৈব দেবতা, শিবের মন্দিরে বৈষ্ণব নৃসিংহ। ভুবনেশ্বরে দোলযাত্রা সম্পাদিত হয়—তাহার প্রধান অনুষ্ঠান হরিহর-মূর্ত্তির দোলন। জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে শিবের পাণ্ডারা শ্রীকৃষ্ণের পূজাও করিয়া থাকে, এবং ভুবনেশ্বর শিব আপন মন্দিরে বিষ্ণু-অবতারের পূজা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন না। কিম্বদন্তী শুনা যায় যে, বিষ্ণুর আদেশা-নুসারেই শিব ভুবনেশ্বরে বাস করেন; এবং এই কিম্বদন্তী স্মরণ রাখিয়া ভুবনেশ্বর-যাত্রীরা বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া প্রথমেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুদেবকে প্রণাম করিয়া আসে।

দেবতায় দেবতায় এইরূপ সদ্ভাব থাকায় বিভিন্ন মন্দিরের বিচিত্র অনুষ্ঠানসকলের মধ্যেও আদানপ্রদান চলে। প্রাবর্ণোৎ-সবে ভুবনেশ্বর গ্রীষ্মবস্ত্র ত্যাগ করিয়া শীতবস্ত্র পরিধান করেন, পুরু-ষোত্তমে ইহারই অনুরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া জগন্নাথদেবের দেহে শীতবস্ত্র উঠে; ভুবনেশ্বরের পুষ্যাযাত্রা, জগন্নাথদেবের অভিষেক; ভুবনেশ্বরে শয়ন-চতুর্দ্দশী, জগন্নাথে শয়ন-একাদশী; ভুবনেশ্বর এবং জগন্নাথ উভয়েরই সেই চন্দন-যাত্রা, সেই মকরসংক্রান্তি,

ভৈমী-একাদশী এবং গুণ্ডিচাশ্রম গমন ও মন্দিরে প্রত্যাগমন বিধি।

কণারকের সূর্য্যমন্দিরেও এই রথযাত্রার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কপিল-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, অর্কক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রথযাত্রা দর্শন করিলে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শনলাভ হয়। আরও, এখানে সকল দেবতার উপাসনাবিধি আছে এবং যে ব্যক্তি যে লোকে যাইতে চায় তাহারও বাধা নাই—কেবল দিন-ক্ষণ দেখিয়া দেবতাবিশেষকে ডাকিলেই হইল। অমুক দিন মহোদধিতে স্নান করিয়া যে রামেশ্বরকে পূজা করে, রামচন্দ্র তাহার অভীষ্টসাধনে সহায়তা করেন; মহেশ্বরের চরণে ভক্তিপূর্ব্বক নৈবেদ্য নিবেদন করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়; বিখ্যাত অর্কবটমূলে বসিয়া যে ভক্ত বিষ্ণুমন্ত্র জপ করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি সদ্য প্রসন্ন হয়েন।

পৌরাণিক বর্ণনানুসারে, এই অর্কক্ষেত্রে বিষ্ণুর পদ্ম পড়িয়াছিল; সেইজন্য ইহার আর এক নাম পদ্মক্ষেত্র। পুরাণ-রচয়িতা উড়িষ্যার চারিক্ষেত্রে বিষ্ণুর চারিটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন:—কণারকে পদ্ম, পুরীতে শঙ্খ, ভুবনেশ্বরে চক্র এবং যাজপুরে গদা। বিষ্ণুদেব গয়াসুরকে বধ করিয়া গয়ায় স্বীয় পদচিহ্ন এবং উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আপন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রাখিয়া যান। তন্মধ্যে চক্রক্ষেত্র ও গদাক্ষেত্র হরপার্ব্বতীর এলাকা। কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোনও গোল উঠে নাই।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সন্দেহ হয় যে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের একটু বিশেষ প্রভাব হইয়াছিল এবং হয়ত তাহারই ফলে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরদিগের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হইয়া কালক্রমে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। এক হইতে

পারে, বৌদ্ধ মতের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত বিরোধ ত্যাগ করিয়া এক হইয়াছিল; আর এক হইতে পারে, সকল সম্প্রদায়ই যেখানে যতটুকু আবশ্যক বোধ করিয়াছে বৌদ্ধ মত ও অনুষ্ঠান হরণ করিয়া লইয়া আপন আপন দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, এব এইরূপে স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সংযত হইয়া আসিয়াছে।

যেমন করিয়াই হউক্, হয় বৌদ্ধধর্ম্মের ব্রাহ্মণীকরণে, নয় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বৌদ্ধীকরণে, কিম্বা উভয়েরই সংযোগে, উড়িষ্যায় যে হিন্দুধর্ম্ম একটা নূতন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং পদ্মার প্লাবনে যেমন সমস্ত আল ভাঙ্গিয়া গিয়া ভিন্ন ভিন্ন জমীর সীমানা মিশাইয়া যায়, এই ধর্ম্মবিপ্লবে সেইরূপ উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন দেবতার এলাকার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া গিয়া একসা হইয়া গিয়াছে—কতটুকু কাহার অধিকার নির্ণয় করা সুকঠিন।

মন্দিরে মন্দিরে পাষাণে খোদিত সহস্র আধা-মঙ্গোলীয় ছাঁচের বৌদ্ধ মূর্ত্তি। কোন কোন স্থলে হিন্দু দেবদেবীও যেন বৌদ্ধ ছাঁচে ঢালাই হইয়া বাহির হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। জগন্নাথের মূর্ত্তি, চক্র, রথযাত্রা, জাতিভেদবিহীনতা যখন বৌদ্ধ প্রভাবেরই অবশেষ, তখন মন্দিরের স্থাপত্যে কিম্বা ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি? যোগাসীন শিব যখন বৌদ্ধ রথযাত্রা-উৎসবে বিচলিত হইয়া গুণ্ডিচাশ্রমে অবস্থিতির লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তখন ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য বৌদ্ধ দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে ইহাতেই বা বিস্মিত হইবার কি আছে?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শুষ্ক নীতিধর্ম্মের মধ্য হইতে এমন বিলাসকলা স্ফূর্ত্তি পাইল কিরূপে? উড়িষ্যার মন্দিরে যে সমস্ত চিত্র খোদিত হইয়াছে তাহা বিলাসভাবময় ত বটেই, এবং অনেকস্থলে বিলাস শ্লীলতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপন নগ্ন শৃঙ্গার-সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে নাই।

বৌদ্ধ স্থাপত্যে এই বিলাসপরায়ণতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই যাহা চোখে পড়ে তাহা এই যে, যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তখন তাহার আদিম বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়া চতুর্দ্দিকের পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং গ্রীকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতায় কল্পনাকে পাষাণে বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষাও সম্ভবতঃ তখন সমধিক উদ্দীপিত হইয়াছিল। বাস্তবিক, ভুবনেশ্বরের দেয়ালে কতকগুলি উন্নত-গ্রীবা দীর্ঘাবয়বা নারীমূর্ত্তি দেখিলে এমনি য়ুরোপীয় ছাঁচে ঢালা বোধ হয় এবং কোন কোনটির ভঙ্গী এমনি য়ুরোপীয় যে, গ্রীক প্রভাব অস্বীকার করিতে বিস্তর চেষ্টার আবশ্যক করে। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বতীমূর্ত্তির সন্নিহিত নিভৃত কোণে কলানিপুণা রমণীগণমধ্যে সহসা গ্রীসীয় লায়র-যন্ত্রহস্তা নারীমূর্ত্তি দেখা যায় তখন চমকিয়া উঠিতে হয়—এ কি গ্রীস না ভারতবর্ষ!

ভারতবর্ষে যে তখন গ্রীকদিগের গতিবিধি ছিল তাহার স্বপক্ষে বিস্তর প্রমাণ আছে। রাজা অশোকের পালি প্রস্তর-লিপিতে গ্রীক অন্তিয়োকসের নাম পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় গ্রীকেরা অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নূতন ধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচার করিতেও বাহির হইয়াছিলেন ইতিহাসে এরূপ

বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং একদিকে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিকী কল্পনা এবং অন্যদিকে গ্রীক সৌন্দর্য্যচর্চ্চা মিলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে যে তাহার শুষ্ক নীতি-সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে সাধারণের মনোরম করিয়া তুলিয়াছে ইহাতে সংশয়ের বিশেষ কিছুই নাই। এবং এইরূপে সাধারণের মনে মুদ্রিত হইয়াই যে তাহা কালক্রমে রূপান্তরিত আকারে সর্ব্বশরণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে ইহাও নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না।

এমনি করিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম হইতে পরিপুষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে আবার পরিপুষ্ট করিয়াছে। আপনাকে সর্ব্বসাধারণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পৌরাণিকতার সহায়তা গ্রহণ তাহার আবশ্যক হইয়াছিল, আবার আপনি যখন দেশান্তরিত হইল প্রাচীন পৌরাণিকতাকে আরও পৌরাণিক করিয়া দিয়া গেল। এখন খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন কোন্ অবধি ব্রাহ্মণ্য এবং কোন্ অবধি বৌদ্ধ সীমা।

হিন্দুধর্ম্ম এমনি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এখনও ইহার গঠনকার্য্য শেষ হয় নাই। উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রে যেন ইহার আদিম অনুষ্ঠান হইতে চরম অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত গায়ে গায়ে মিশিয়া পুঁটুলি পাকাইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া যেন কতকটা বুঝা যায়, নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, কর্ম্মফল, জ্ঞানমোক্ষ, ভক্তিমুক্তি, দর্শন এবং কাব্য চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া কেমন করিয়া মিশিয়াছে, এবং বুদ্ধি যাহার মধ্য দিয়া বাঁধা পথ বাহির করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে, আমাদের নিরক্ষর সাধারণের হৃদয়ে সেইসকল বিরোধী মতের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

সম্পাদক।

আমার স্ত্রী বর্ত্তমানে, প্রভা সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম। তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া তাহার আধ আধ কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভাল লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লাভ করিতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে একথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর-মৃত্যু হইলে এক দিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্ত্তব্য এটা আমি বেশী চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা তাহার কর্ত্তব্য এইটে সে বেশী অনুভব করিয়াছিল আমি ঠিক বুঝিতে পারিনা; কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিন্নিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল, ঐটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম, যতই আমি অকর্ম্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভাল; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মত এত বড় পুতুল সে ইতিপূর্ব্বে কখনো পায়

নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড় আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথম ভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক—আমার এত টাকা কোথায়? মেয়েকে ত সাধ্যমত লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কি দশা হইবে?

উপার্জ্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোন কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভাল। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোন কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভাল বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভাল বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারিনা। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম। প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহ-সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, নাইতে যাবে না?" আমি হুঙ্কার দিয়া উঠিলাম "এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিস্‌নে!" বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুৎকারে নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন্ সে অভিমান-বিস্ফারিত

হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই। দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক সুর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে কোন কোন নিরীহ পান্থ জানলার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাদিগকে জাহান্নম নামক অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। হায়, কেহই বুঝিত না আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি।

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না। এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম।

দিনকতক এম্‌নি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মত দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পার্শ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্ব্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মুচ্‌লেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ব্ববর্ত্তী খুনী লাঠিয়ালদের

স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল,পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি। এই সময়টা ছিলাম ভাল। বেশ মোটা-সোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহির-গ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটা মর্ম্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম আর সমস্ত আহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মত বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড় আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোন কথা ঢাকিয়া বলিত না। এম্নি উৎসাহের সহিত অবি-মিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্য্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এইজন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত। কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশতঃ এম্নি মজা করিয়া এত কূট-কৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্ম্মটা কি।

তাহার ফল হইল এই, জিৎ হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভাল জিনিষকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে বিদ্রূপ করিয়া কখন তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর প্রকাশ করেন না। সভাস্থলেও আমার কোন সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন কি, আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্য্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোন সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভাল সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিৎ কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হোক, ভাষার বাহাদুরী আছে। অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশ জনের কাছে ঐ এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মত ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত পীড়িত চিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতে-

ছিলাম। পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম পাখীদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলি ভাবিতেছি কি উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বুঝিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেইরকম ভাবের একটা মুখের মত জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না।

এমন সময় সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম, এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্বেজিত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়াছিল "বাবা!", কোন উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায়

শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমীলিত; দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মত পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শির দপ্ দপ্ করিতেছে।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ, পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোন কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোন জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সুখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

ধান্য।

(কৃষিকথা।)

আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য চাউল—বাঙ্গালীর অন্নগত প্রাণ। এজন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে ধান্যচাষের বিষয় লিখিব। ধান্যের আবাদ অতিশয় কঠিন এবং পরিশ্রমসাপেক্ষ, এই শস্য উৎপন্ন

করিতে অনেক সময় লাগে। প্রায় বারো মাস ইহার চাষের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

প্রথমতঃ, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে জমীসকল উত্তমরূপে চষিতে হয়। চাষারা বলে "চাষেই শাঁস", অর্থাৎ চাষ যত গভীর হইবে, জমীর মৃত্তিকায় যত বেশী ফাঁপ হইবে, ফসল ততই বেশী উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। চাষ সম্বন্ধে চাষাদিগের যে উপদেশ-বাক্য আছে,তাহা স্মরণ রাখার উপযুক্ত। তাহারা বলে—"শত চাষে 'তুলা', তার অর্দ্ধেক 'মূলা,' তার অর্দ্ধেক 'ধান,' বিনা চাষে 'পাণ'।" এই বচন দ্বারা যে কোনও ফসলের কোনও নির্দ্দিষ্ট বার চাষ দিতে হইবে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। কোন্ ফসলে কত অধিক চাষ দিতে হয় ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা যাইতেছে। সচরাচর ধান্যের জমী চারি পাঁচ বার চষিলেই বীজ বপন বা রোপণের উপযুক্ত হয়। এই কার্য্য পূর্ব্ব সনের মাঘ ফাল্গুন হইতে আরম্ভ করিয়া পর সনের জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে সমাপ্ত করিতে পারিলেই ভাল হয়। মাঘ ফাল্গুন মাসে জমী চষিতে পারিলে বিশেষ উপকার লাভ হইয়া থাকে,—চষা অবস্থায় জমীর অভ্যন্তরে বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপ প্রবেশ করে। ঐ বায়ু ও উত্তাপ যত অধিক কাল প্রবেশ করে, জমীর উর্ব্বরাশক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। মাঘ মাসে জমী চষিতে পারিলে আষাঢ় পর্য্যন্ত প্রায় ছয় মাস উহার অভ্যন্তরে বায়ু ও উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে। এইজন্য চাষারা বলে, "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে জমী চষিলে আর একটি উপকার হইয়া থাকে। এই সময়ে জমী চষিয়া দিলে রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে মৃত্তিকার সমুদয় ঘাসের গোড়া জলিয়া যায়, তাহাতে বর্ষাকালে জমীসকল পরিষ্কার হইয়া ঝক্‌ঝক্ করিতে থাকে।

সকল ফসলের পক্ষেই ঘাস অতিশয় আপদ। বিশেষ ধানের জমীর ঘাস নষ্ট না হইলে কিছুমাত্র ফসল পাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু কেবল জমী চষিলেই বেশী ফসল উৎপন্ন হয় না। চষিবার পূর্ব্বে জমীতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দিতে হয়। বর্ষার পূর্ব্বে এই কার্য্য শেষ করিতে হয়। সাধারণতঃ আমাদের দেশের কৃষকেরা ধান্যের জমীতে দুই প্রকারের সার দিয়া থাকে ; এক পুরাতন পুষ্করিণীর পাঁক,দ্বিতীয়,গোহাল পরিষ্কার করিয়া যে সকল গোবর ও খড়ের অংশ একত্রে স্তূপাকারে রক্ষিত হয় তাহা। এই সার যথেষ্ট পরিমাণে জমীতে দেওয়া না হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসল পাওয়া যায় না। অনেক চাষা ইহা দেয় না বলিয়াই অল্প ফসল পাইয়া ক্ষুণ্ণ থাকে, আর অদৃষ্ট, দেবতা প্রভৃতির উপর দোষারোপ করে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, গোবর ধান্যের জমীর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। চাষারা যে ইহা না জানে তাহা নহে। কিন্তু অনেক স্থানে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাবে গোবরের ঘসি প্রস্তুত করিয়া উহার অভাব পূর্ণ করে। এই সকল লোকদিগের পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া গোবর সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। পাথুরিয়া কয়লার মূল্য অধিক নহে, আর অল্পতেই রন্ধন হয়। পল্লীগ্রামে ইহার ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। রেড়ির খইল গোবরের তুল্য সার। কিন্তু উহার মূল্য অধিক বলিয়া চাষারা ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয়। তাহারা ইহা বুঝে না যে, চোক কান বুজিয়া কিনিয়া এই সার জমীতে দিলে, মায় সুদ টাকাটা উঠিয়া যায়। পশ্চিমাঞ্চল হইতে সময়ে সময়ে ভেড়াওয়ালারা যে সকল ভেড়া কলিকাতায় লইয়া আসে, ঐ সকল ভেড়া রাত্রিকালে জমীতে রাখিলে উহাদের মল-

মূত্রের দ্বারা জমীর উর্ব্বরাশক্তি খুব বৃদ্ধি পায়। গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ হইতে কৃষি সম্বন্ধীয় যে বার্ষিক রিপোর্ট বাহির হয়, তৎপাঠে জানা যায় যে, অস্থিচূর্ণও ধান্যের জমীর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সার পুষ্করিণীর পাঁক। কিন্তু ইহাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জমীতে দিলে উত্তম ধান্য হইয়া থাকে। ইহা বিনা মূল্যে সহজে পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালী দিন দিন এরূপ অলস হইয়া পড়িতেছে যে, এই সুলভ দ্রব্যও তাহারা জমীতে দিয়া জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পক্ষে উপযুক্ত চেষ্টা করে না। সাধে কি ঘরে ভাত থাকে না!

ধান্য কয়েক শ্রেণীর আছে; তন্মধ্যে "আশু" "আমন" "বোরো" ও "জলী" এই কয়টি প্রধান। আশু ধান্য আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা;—"ঝাঁটি"(ঝটি = শীঘ্র) ও "নেয়ালি"(নয়ালি = নূতন)। আমন ধান্যও কয়েক প্রকারের আছে, তন্মধ্যে এই কয় শ্রেণী প্রধান; "নবানে" বা "নবান্নে", সাধারণ আমন ও "কনকচূর"। নবানে দুই প্রকারের। এক প্রকারের নবানে ধান্য কার্ত্তিক মাসে পাকে; উহাকে কার্ত্তিক শাল বলে, অপর প্রকারের নবানে অগ্রহায়ণ মাসে পাকে, ইহাকে সচরাচর নবানেই বলে। এই সকল ধান্যের নানা নাম আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি নাম আমরা এই স্থলে লিখিলাম। আশু ধান্যের এই কয়টি নাম প্রচলিত আছে যথা;— "চাঁপাকুশি" "দুধকটকি" "কেলে" "কাঁকড়ি" "লেবুরস" "সূর্য্যামণি" "আগুনমান" "মোল" ইত্যাদি। আমন ধান্যের মধ্যে মোটা ধান্যের এই কয়টি নাম প্রচলিত—"লোণা" "বনবোঁটা" "লতামল" (সাদা ও লাল) "দুধকলমা" "কাঁটিকলমা" "কালি-কলমা" "জটাকলমা" "ডহন নাগরা" "বাঁশনাগরা" "রামশাল" "ঘিশাল" "ভবানীশাল" "ঝিঙ্গেশাল" "খেজুরকান্দী" "ময়ূর-

পাখা” “লক্ষ্মীবিলাস”। “খেজুরকান্দী” ধান ঠিক খেজুরের কান্দীর মত। “ময়ূরপাখা” ধান্যের দুইটি আগরা পাখারূপে বিরাজ করে, মধ্যে ধান থাকে। নবানে ধান সাধারণ আমন ধান অপেক্ষা সরু। নবানে ধান্যের মধ্যে এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ যথা ;—“দাদখানি” “বেণাফুল” “গোপালভোগ” “লঘু” “পদ্মকিশোর” “ভাসামাণিক”। ইহা ছাড়া এক শ্রেণীর খাটি সরু আছে ইহার অনেক নাম। তন্মধ্যে এই কয়টি প্রধান, “বাঁশমতি” “আমীরভোগ” “কুমেদ” “শাহ আলম” “বালাম” “খয়ের মউরি” “দিরসাপাতি” “রাঁধুনিপাগল” ইত্যাদি।

যেরূপ আমন ধান্যের আবাদ, আশু ধান্যের আবাদও তদ্রূপ। আমরা আমন ধান্যের কিরূপে আবাদ করিতে হয় তাহা বিস্তারিতরূপে বলিব। বোধ হয় সকলেই জানেন যে, ধান্য দুইপ্রকারে আবাদ হয়; এক বপন দ্বারা, দ্বিতীয় রোপণ দ্বারা। অগ্রে বপনের কথা বলি।

সচরাচর বৈশাখের শেষে আশু ধান্য ও জ্যৈষ্ঠের শেষে আমন ধান্যের বীজ বপন, অর্থাৎ চষা জমীতে ছড়াইয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রায়ই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা ধান্যের চারাসকল পরিপুষ্টি লাভ করে। আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে বর্ষা আরম্ভ হইলে জমীসকল জলপূর্ণ হয়, তখন এই সকল বোনা জমী লাঙ্গল দিয়া চষিয়া দিতে হয়। এই কার্য্যকে বর্দ্ধমান জেলায় কাড়াইয়া দেওয়া কহে। দুইবার এইরূপ কাড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু উপর্য্যুপরি দুইবার নহে; একবার চষার অন্ততঃ পনের দিন পরে দ্বিতীয় বার চষিতে হয়। এই কার্য্য বর্ষার প্রথমে উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ চারাগাছগুলি একটু বড় হইলেই, সম্পন্ন করা আবশ্যক, নতুবা বোনা জমীর ধান ভাল হয় না।

প্রত্যেক বার চষার পর মই দ্বারা জমীটা সমান করিয়া দিতে হয়। বোনা জমী চষার প্রয়োজন এই যে, ধান গাছের গোড়াগুলি উপড়াইয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয় এবং অতিশয় ঘন চারাগুলিকে ফাঁক ফাঁক করিয়া দিতে হয়। মই দ্বারা আবার সেই সকল উপড়ান গাছগুলি পুনরায় বসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তখন উহারা বর্দ্ধিততেজে ঝাড় বাঁধিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে একটি একটি করিয়া ঘাস নিড়াইয়া অর্থাৎ উপড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। যিনি এই কার্য্যে অবহেলা করেন, তাঁহাকে নিশ্চয় ঠকিতে হয়।

আষাঢ় মাসের প্রথমেই সকল বৎসর বর্ষা আরম্ভ হয় না। কোন বার প্রথমে, কোন বার মাঝামাঝি সময়ে, কখনও বা শেষে বর্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। যে বৎসর আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে বর্ষা আরম্ভ হয়, সে বৎসর চাষাদের আনন্দের সীমা থাকে না। বর্ষা আরম্ভের পূর্ব্বে চাষারা অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে নিয়ত আকাশের দিকে তাকাইয়া কালযাপন করে। উদ্বিগ্ন হইবার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু "মন্‌সুন" নামক বায়ুর বৃত্তান্ত বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত থাকিলে তাহাদিগকে অত উদ্বিগ্ন হইতে হইত না। বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই বায়ু পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে বহিতে থাকে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দুই তিন দিন ঐ কোণ হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিলে, নিশ্চয় বৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ সময়ে পশ্চিম দিকে মেঘ করিলে, বা জোরে পশ্চিম দিক হইতে বায়ু বহিলেও প্রচুর বৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সময়ে পূর্ব্ব দিক হইতে বায়ু বহিলে ধান্য আবাদের আশা খুব কম জানিতে হইবে। কারণ, ওরূপ হইলে অতি অল্প পরিমাণেই বৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে, তাহাতে ভালরূপ চাষ করিতে পারা যায় না।

এই সময়ে পূর্ব্বদিকের বায়ু যে চাষের পক্ষে ইষ্টকর নহে, চাষারাও তাহা জ্ঞাত আছে, তাই তাহারা বলে—"আষাঢ় শ্রাবণ পূবে বায়, হাল ছেড়ে বাণিজ্যে যায়।" তেমনি আবার ভাদ্র আশ্বিন মাসে পূর্ব্বদিকের বাতাস না থাকিলে প্রচুর বৃষ্টি হয় না। তাহাতেই চাষারা বলে, "ভাদ্র আশ্বিন পূবে বা, গাছের আগায় মাছের ছা।" বর্ষাকালে ঈশান কোণের বায়ুও বৃষ্টি আনয়ন করে, সেই জন্য চাষারা বলে—"যদি বহে ঈশানে, লাঙ্গল কাঁধে নাচে কৃষাণে", অথবা "যদি বহে ঈশ্‌নে, ঘায়ে ঢেলা দিস্‌নে।" অর্থাৎ জমীর আল বাঁধিতে হইবে না, কেন না, প্রচুর বৃষ্টি হইবে, তাহাতে নিয়ত ভূমি-ভরা জল থাকিবে। ফলতঃ বাঙ্গালা দেশে দুই প্রকারের "মন্‌সুন্‌" বায়ু বহিয়া থাকে, একটির নাম "বেঙ্গল করেণ্ট", অপরের নাম "বোম্বাই করেণ্ট।" আরব্য উপসাগর হইতে বহিয়া আসিয়া যে বায়ু আমাদের দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম বা পশ্চিম দিক হইতে বহে, তাহাকে "বোম্বাই করেণ্ট" বলে। ইহার দ্বারা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টি আনীত হয়। আর যে বায়ু বঙ্গোপসাগর হইতে আসিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব বা পূর্ব্বদিক হইতে বহে, তাহাকে "বেঙ্গল করেণ্ট" বলে। তাহা ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে প্রচুর জল আনয়ন করে। এই সকল কথা ভাল করিয়া জানা থাকিলে চাষ সম্বন্ধে অনেক সুবিধা করিতে পারা যায়।

প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ষা আরম্ভ না হইলে ধান্য রোপণ কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে না। কিন্তু বর্ষার পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান্য বপনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে বীজ বপন করিয়া রাখিতে হয়। বর্দ্ধমান জেলায় এককাটা ভূমিতে পাকী চারি সের বীজ ছড়াইয়া রাখে। ঐ সকল বীজধান্য বড় হইলে উহাদের

চারাগুলি উপড়াইয়া অন্য জমীতে রোপণ করিতে হয়। যে জমীতে ঐরূপ বীজ বপন করা হয়, তাহাকে "বীজতলা" বলে। যিনি ভাল করিয়া চাষ করিতে চাহেন, তিনি যেন বীজতলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। বৎসর বৎসর বীজতলায় খুব বেশী পরিমাণে গোবর, চোণা বা অন্য কোনপ্রকারের সার দেওয়া আবশ্যক এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ঐ সকল ভূমিখণ্ড উত্তমরূপ চষিয়া ঘাসশূন্য করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই উত্তম বীজ জন্মিবে। বীজ যত উত্তম হইবে, শস্য ততই ভাল হইবে। বরং ক্ষেত অনুর্ব্বর হইলেও চলে, কিন্তু বীজতলা অনুর্ব্বর হইলে চলে না।

"জল লাগিলে", অর্থাৎ বর্ষা আরম্ভ হইলে, যে সকল ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করিতে হইবে ঐ সকল ক্ষেত্র উত্তমরূপ চষিতে হয়। এক একখানি জমী দুই তিন বার চষিয়া অন্ততঃ তিন দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। সেই সময় মধ্যে ঘাসগুলা পচিয়া যায় ও মাটিটা পচিয়া উঠে, তখন আর দুইটা চাষ দিয়া মই দ্বারা ঘাঁটিয়া কাদা করিতে হয়। এই সময়ে জমীতে বেশী জল রাখিতে নাই, ভূমি-ভরা জল থাকিলে চষা ভাল হয় না। কারণ, কোন্ স্থান চষা হইল, কোন্ স্থান হইল না, বেশী জল থাকিলে তাহা লক্ষ্য করা সুকঠিন। জমী কাদা করা হইলে বীজতলা হইতে বীজ উপড়াইয়া আনিয়া ঐ স্থানে রোপণ করিতে হয়। বীজ রোপণের এক সপ্তাহ পরে উহা শ্যামল মূর্ত্তি ধারণ করে এবং একমাস মধ্যে ঝাড় বাঁধিয়া থাকে। তখন বায়ুহিল্লোলে মৃদুমন্দ দুলিয়া কৃষকের মনপ্রাণ শীতল করে।

প্রায় বোনা জমীর সঙ্গে সঙ্গেই রোয়া জমী নিড়াইয়া দিতে হয়। এই কার্য্য অতিশয় কষ্টকর ও ইহাতে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতার

আবশ্যক। সকল কৃষকে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। কেবল ঘাস উপড়াইয়া দিলেই যদি নিড়ান শেষ হইত, তাহা হইলে তত গোল ছিল না। একপ্রকার ধানের গাছ আছে, তাহাকে "ঝোড়া" বলে, নিড়াইবার সময় এইসকল ঝোড়া ধানও উপড়াইয়া ফেলিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে ক্ষেত্র হইতে ধান্যসকল বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় কতকগুলি ধান পড়িয়া থাকে, সেইসকল ধান সহজে বিনষ্ট হয় না। এক বৎসর পরে যখন আবার জমী চষিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া হয়, তখন ঐ সকল ধান্য জল পাইয়া অঙ্কুরিত হয় এবং নূতন বপনকরা ধান্যের চারার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া অবশেষে চাষাকে বিষম ঠকাইয়া থাকে। রোয়া জমীতে প্রায় ঝোড়া থাকিতে পায় না, যদি থাকে আর কৃষক অবহেলা করিয়া তাহা নষ্ট না করে, তবে পরিণামে তাহাকে পরিতাপ করিতে হয়। এই ধানগাছ প্রকৃত ধানের গাছের ন্যায় শেষ পর্য্যন্ত বেশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া শস্য ধারণ করে। কিন্তু সে শস্য কৃষকের ভোগে লাগে না। যেমন পাকে অমনি ঝরিয়া পড়ে। এই জন্য ইহার নাম "ঝোড়া" বা "ঝড়া"। এই ঝোড়া অতিশয় ভ্রম-উৎপাদক, প্রায়ই আসল ধান ও ঝোড়া চেনা যায় না। চিনিতে পারিলেও অতিশয় অধ্যবসায় সহকারে একটি একটি করিয়া উপড়াইয়া ফেলিতে হয়। অনেকে মায়া করিয়া, কেহ বা তাচ্ছল্য করিয়া উপড়ায় না। কেহ বা যাহা আসল ধান তাহা ঝোড়া মনে করিয়া উপড়াইয়া ফেলে, আর ঝোড়াকে ধান মনে করিয়া রাখিয়া দেয়। সকল অবস্থাতেই লোকসান অনিবার্য্য। ঝোড়া চিনিবার সহজ উপায় কিছু নাই। তবে কোন কোন ধান্যের অগ্রভাগে একটা কাল দাগ থাকে, ঝোড়ার

ঐরূপ দাগ থাকে না। একখণ্ড জমীর মধ্যে ক্ষীণ নির্জীব ধানের ভিতর যে ঝাড়টা খুব তেজাল দেখিবে, নিশ্চয় জানিবে সেটা ঝোড়া। ইহা অবশ্য সাধারণ নিয়ম নহে। ঝোড়ার আকৃতি সাধারণ ধান্য অপেক্ষা বিভিন্ন। অভিজ্ঞতা দ্বারা ঐ বিভিন্নতা লক্ষিত হইতে পারে।

ভদ্রলোকের ছেলেরা যেন এই নিড়ান বা ঘাস-তোলা কার্য্যে বেতনভোগী কৃষাণদিগকে বিশ্বাস না করেন। ঘাস তোলা অতিশয় কষ্টকর ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং কৃষাণেরা প্রায়ই ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। বর্দ্ধমান জেলার কোন কোন অঞ্চলে চাষারা বলে, "বামুন বৈদ্যের চাষ, ভিতে তকতক্ মাঝে ঘাস।" অর্থাৎ ভদ্র লোকেরা প্রায়ই আসিয়া জমীর ভিতায়, অর্থাৎ কিনারায়, ঘাস আছে কি না, জমীখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া দেখিয়া থাকেন। মধ্যে ঘাস আছে কি না, তাহা জমীতে নামিয়া দেখেন না; সুতরাং মাঝের ঘাস দুষ্টবুদ্ধি অলস মুনিষেরা তোলে না। তাহাতে বিষম ক্ষতি হইয়া থাকে। যাঁহার অবস্থা ভাল, তিনি যেন অপর লোক দ্বারা জমীর মধ্যস্থল পরীক্ষা করান। আর যাঁহার সেরূপ অবস্থা নহে, তাঁহার স্বয়ং জমীতে নামিয়া দেখাই উচিত।

ঘাস নানা প্রকার আছে; তন্মধ্যে এই কয়টি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—"চেঁচড়া" "পাতি" "শ্যামা" "মলঞ্চা" "দূর্ব্বা" "বাবুই" "শ্যামনা" "কেঁচুড়ে"। এই সকল ঘাসের মধ্যে চেঁচড়া, পাতি ও বাবুই অতিশয় কঠিন গোড়াবিশিষ্ট ও অনিষ্টকর, সহজে উহাদিগকে উপড়ান যায় না। সেইজন্য পরিশ্রমকাতর মুনিষেরা এই সকল ঘাসের মাথা ছিঁড়িয়া ভূমি পরিষ্কার করে। কিন্তু যে দিন ইহারা ঐরূপ নিড়াইয়া

যায়, তাহার পর দিনই আবার ঐ সকল ঘাস বাড়িয়া উঠে। সুতরাং যাহাতে গোড়া উপড়ান হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ক্ষেত্র নিড়ান হইয়া গেলেই প্রায় প্রধান পাট শেষ হইয়া গেল। ইহার পর রোয়া জমীতে আর কোন পাট নাই। কিন্তু বোনা জমীতে আর একটি পাট বাকী থাকে। বর্দ্ধমান জেলায় তাহাকে "গাছান" কহে। পূর্ব্বে যে "কাড়ান," অর্থাৎ বোনা জমী লাঙ্গল দিয়া চষার কথা বলিয়াছি, ঐ কার্য্য করিবার সময় কোন কোন স্থান অতিরিক্ত ফাঁক হইয়া যায়। বিশেষতঃ বীজ বপনের সময় সমান ভাবে ক্ষেত্রের সকল স্থানে বীজ পতিত হয় না, তজ্জন্য কোন কোন স্থান ফাঁক থাকিয়া যায়। সেই সকল ফাঁক এক্ষণে ক্ষেত্রের অপর স্থান হইতে কোদালে করিয়া ধান্যের ঝাড় কাটিয়া আনিয়া বুজাইয়া দিতে হয়, এই কার্য্যের নাম "গাছান" অর্থাৎ গাছ দিয়া সাজান।

নিড়ান, গাছান প্রভৃতি শেষ করিতে করিতে ভাদ্র মাস শেষ হইয়া যায়। এই ভাদ্র মাসে সচরাচর জমীতে খইল ও গোবর দিতে হয়। তৎপূর্ব্বে দিতে পারিলে ক্ষতি নাই কিন্তু প্রায়ই সময়াভাবে দেওয়া ঘটে না। বিশেষ এই সময়ে কোন্ জমীতে ভাল ফসল হইবে, আর কোন্ জমীতে হইবে না, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহা বুঝিবার একটি সহজ উপায় আছে। যে ক্ষেত্রে নামিবা মাত্র তাহার জল ঘোলা হইয়া কাল বর্ণ ধারণ করে এবং মৃত্তিকায় পা বসিয়া যায়, জানিতে হইবে উহার মৃত্তিকা খুব পচিয়াছে, উহাতে নিশ্চয়ই ভাল ফসল হইবে, আর যে ক্ষেত্রের জলের রঙ স্বচ্ছ থাকে এবং যার মৃত্তিকায় পা বসে না, তাহাতে উত্তম ফসলের আশা নাই—অবিলম্বে তাহাতে

হয় গোবর, না হয় রেড়ির খইল, ছড়াইয়া দিবে। গোবর অপেক্ষাও রেড়ির খইলে শীঘ্র ফল হইয়া থাকে।

এক্ষণে কি পরিমাণে গোবর বা খইল জমীতে দিতে হয় তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। প্রত্যেক বিঘা জমীতে রেড়ির খইল দুই মন অভাবে এক মন দিলেই বেশ ভাল ফসল হয়। আর গোবর প্রত্যেক বিঘায় চল্লিশ কি পঞ্চাশ ঝুড়ী দিলেই যথেষ্ট। বর্দ্ধমান সহরে গবর্ণমেণ্টের যে কৃষিবিভাগ আছে, উহার রিপোর্টে সার দেওয়া সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, তদনুসারে ও আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা করিলাম। এই স্থলে আমরা অপরাপর সারের পরিমাণও উল্লেখ করিতেছি। খড়কুটা গোবরের কুচি প্রভৃতি গোহালের আবর্জ্জনা দ্বারা যে সার প্রস্তুত হয়, সেই সার প্রত্যেক বিঘায় পাঁচ গাড়ি (গোরুর গাড়ি) করিয়া দেওয়া উচিত এবং পাঁক মাটি প্রত্যেক বিঘায় দশ গাড়ি করিয়া দিতে হয়। মোট কথা জমীখণ্ডের প্রত্যেক স্থানে কিছু কিছু সার পড়া আবশ্যক।

যেমন একটি ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে, তাহাকে নানা-প্রকার রোগের হস্ত হইতে সময়ে সময়ে মুক্ত করিতে হয়, সেইরূপ এই ধানগাছগুলিকে পালন করিতে হইলে, ইহাদের রোগের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কেননা, মানুষের ন্যায় সকল জীবিত পদার্থই সময়ে সময়ে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ধানের অনেক রোগ আছে, ভাদ্র মাসেই প্রায় সেই রোগগুলি দেখা যায়। যদি তুমি দেখিতে পাও যে, তোমার ক্ষেত্রের সবুজ বর্ণের ধানগাছগুলি হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিতেছে, তাহা হইলে জানিবে যে, ধানে লোণা ধরিয়াছে। অচিরাৎ তাহার প্রতিকার না করিলে কিছুই শস্য জন্মিবে না। দুই উপায়ে লোণা নষ্ট

হয়—এক জমীর জল কাটিয়া দিয়া জমীকে শুষ্ক করা, অপর, লোণা স্থানে খানিকটা ক্ষারী লবণ ছড়াইয়া দেওয়া। সেচা জমী ভিন্ন অপর জমীর জল কাটিয়া দিতে নাই। কারণ, ভাদ্র মাসে প্রায়ই খুব কম বৃষ্টি হইয়া থাকে, একবার ভূমি শুখাইয়া গেলে শীঘ্র যদি বৃষ্টি না হয় লোকসান অনিবার্য্য। লবণ ছিটাইয়া দিলে অতি অল্পদিন মধ্যেই ধানগাছের রঙ পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনর্ব্বার গাছসকল সতেজে পরিবর্দ্ধিত হয়। "ধ্বসা" ধানের একটি রোগ। এই রোগ হইলে একপ্রকার শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র কীটে গাছগুলি কাটিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেইজন্যই বোধ হয়, এই রোগের নাম ধ্বসা বা ধ্বংসা। অতিরিক্ত বাদল হইলেই কোন কোন জমীতে এই রোগ দেখা দেয়। জমীর জল কাটিয়া দিয়া জমীকে খুব রৌদ্র খাওয়াইতে পারিলে পোকাগুলা মরিয়া যায়। কিন্তু বর্ষার অবস্থা বুঝিয়া জল কাটা আবশ্যক। শেওলা একটা প্রধান রোগ। যে জমীতে শেওলা জন্মে, তাহার ধান ঝাড় বাঁধিতে পারে না। শেওলা জন্মিবামাত্র জল কাটিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আকন্দ গাছের পাতাশুদ্ধ ডাল জমীতে ফেলিয়া দিলেও ধ্বসা এবং শেওলা নিবারিত হয়। জমীতে "গোঁড়া" জন্মিলেও ধান হয় না। ইহা একপ্রকার ঘাস, ইহা একবার জন্মিলে আর সহজে বিনষ্ট হয় না। এবং প্রায়ই যে স্থানে জন্মে সে স্থানের ধানগাছ নষ্ট করিয়া ফেলে। জন্মিবামাত্র এই ঘাস উপড়াইয়া দিতে হয়, তাহাতেও একবারে সব যায় না। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগ আছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কিন্তু, যেরূপ একজন বলিষ্ঠ দেহ ব্যক্তির সহজে কোন পীড়া হয় না, হইলেও তাহাকে সহজে কাবু করিতে পারে না, সেইরূপ কোন উর্ব্বরা-শক্তিবিশিষ্ট জমীতে কোন রোগ জন্মিলেও সহজে তাহার ধান-

গাছের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, তাহার ধান আপন তেজেই সব রোগ কাটিয়া উঠে। অতএব জমীর উর্ব্বরা-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকে নিয়ত দৃষ্টি রাখিতে ভুলিবে না।

যদি সুবর্ষা হয়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসের প্রথমেই ধান্য চাষের সমুদায় কার্য্য শেষ হইয়া যায়। এই সময়ে ধানগাছগুলি বৃহৎ বৃহৎ ঝাড়ে পরিণত হয়। তখন সমুদায় যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইবার দিন অতি নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া কৃষকের হৃদয় আনন্দে স্ফীত হয়। যে চাষা কখনও গান করে না, গামছাখানি গায়ে দিয়া ক্ষেত্রের চারি আইল ঘুরিতে ঘুরিতে এই সময়ে আনন্দে সেও গুণগুণ্ করিয়া গান ধরে।

কিন্তু, সকল বৎসর চাষার অদৃষ্টে এ সুখ ঘটে না। আশ্বিন মাস মধ্যে খুব এক পস্‌লা বা দুই পস্‌লা বৃষ্টি না হইলেই বিষম বিভ্রাট। তৈয়ারি ফসল নষ্ট হইবার উপক্রম দেখিয়া চাষারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে। "দুনী" "সিম্‌নী" প্রভৃতি জল-সেচার যন্ত্র লইয়া দিবারাত্র সেচা-জমীগুলিতে জল দেয়। কিন্তু অসেচা জমীর ফসল রক্ষার কোনই উপায় হয় না। উহার ধান্য-সকল দাঁড়াইয়া মরে। এই সময়ে কোন পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলে স্ত্রীপুরুষের হা হুতাশ ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। যেখানে দুই জন একত্র হইয়াছে, সেইখানেই "কেমন করিয়া দিন যাইবে", "রাজা মহাজনকেই বা কি দেওয়া যাইবে", "পোড়া আকাশ পুড়ে গিয়েছে", এই সব কথা শুনা যাইবে! যিনি একটু রসিক তিনি দাশুরায়ের এই গানটি অথবা এই শ্রেণীর কোন গান গুণ্ গুণ্ করিয়া গাইয়া থাকেন—

"ছোট-মামুগো, ভেবে মলুগো, এবার দুনিয়া পোড়ে আল্লা।
মেঘে পানী নাই, মেঘ করে সদাই, ভুঁই ফেটে হ'ল চেল্লা বেল্লা।"

যিনি যত সতর্ক, যিনি যেরূপ অধ্যবসায়ী ও উদ্যোগী এই সময়ে তিনি সেইরূপ গুণের পরিচয় দিয়া থাকেন—অপরে এক বিঘা জমী সেচিয়া লইতে না লইতে, তিনি তিন বিঘা সেচিয়া লন। জমী শুখাইতেছে, ফাটিতেছে, তিনি কিন্তু সহজে হটিবার পাত্র নহেন। নদী হইতে বহুকষ্টে বহুপরিশ্রমে বহুব্যয়ে জল তুলিয়া হয়ত তিনি অনেক জমী বাঁচাইলেন এবং অনেকের অপেক্ষা তিনি বেশী ফসল পাইলেন। ব্যবসা বল, বাণিজ্য বল, চাষ বল, আর চাকরীই বল, যত্ন ও অধ্যবসায় ভিন্ন কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারা যায় না।

আশ্বিন মাসের শেষেই ধান্যের থোড় হয়। এই সময়ে ক্ষেত যাহাতে জলপূর্ণ থাকে সে দিকে দৃষ্টি থাকা চাই, কারণ, এ সময়ে ধান অনেক জল শোষে। কার্ত্তিক মাসের ১৪ই। ১৫ই ধান্যের শীষসকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে ঝড়ের বড় আশঙ্কা হইয়া থাকে। ঝড় হইলে ধানের ফুল ঝরিয়া যায়, তাহাতে আগরা জন্মিয়া থাকে। অল্প বাতাসে এই ফুল দুই তিন বার ঝরিলে তত আশঙ্কা নাই, কারণ,উহা অনেক বার জন্মে। ধান্যের সকল শীষে চাউল জন্মিয়া পাকিতে প্রায় এক মাস লাগে। সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসের ১৪ই।১৫ই মধ্যে প্রায় সকলপ্রকার আমন ধান্য পাকিয়া যায়। আশু ধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে পাকে। কোন কোন জেলায় এই ধান্য আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পাকে, কোন জেলায় ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাকিয়া থাকে। কনকচূর সকল ধান অপেক্ষা বিলম্বে পাকে। এই ধান্য সাধারণ মোটা আমন ধান্য অপেক্ষা মূল্যবান। ইহার চাউলের ব্যবহার কম, ধানে উৎকৃষ্ট খই হয়, সেই জন্য ময়রাগণ আদর করিয়া কেনে।

সচরাচর অগ্রহায়ণ মাসের ১৭ই।১৮ই হইতে আমন ধান্য

কাটিতে আরম্ভ করিতে হয় এবং পৌষ মাসের ৮ই।১০ই মধ্যে এই কার্য্য শেষ করিয়া ফেলা আবশ্যক। পাকা ধান্য কাটিতে যতই বিলম্ব করিবে ততই লোকসান হইবে—ধান্যসকল ঝরিয়া পড়িবে। এই সময়ে কেবল বেতনভোগী কৃষাণের উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে, অপর মুনিষ নিয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। ধান্য কাটা হইলেই উহা বাটীতে সত্বর আনা আবশ্যক, মাঠে পড়িয়া থাকিলে, হয় ইন্দুর, না হয় পক্ষীতে, নষ্ট করিবে।

মাঘ মাস মধ্যে ধান্যগুলি ঝাড়াই করিয়া গোলা বা মড়াইয়ে রাখিবে—তখন তুমি এই ফসলসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলে। পরে প্রয়োজনমত চাউল তৈয়ার করাইয়া মহাতৃপ্তির সহিত অন্ন ভোজন করিয়া মহাসুখ বোধ করিবে। অশেষ যত্নচেষ্টালব্ধ এই চাউলের অন্ন ভক্ষণ করিয়া তোমার যতটুকু আনন্দ বোধ হইবে, কেনা চাউলের অন্ন ভোজনে কখনই সেরূপ আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ হয় না।

যেরূপ আশু ও আমন ধান্যের চাষ, বোরো ও জলী ধান্যের চাষও প্রায় তদ্রূপ, একটু আধটু যা বিভিন্নতা আছে, তাহাতে বিস্তারিতরূপে লিখিবার কিছু নাই। সামান্য অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহা শিক্ষা হইতে পারে।

স্বরলিপি।

কেদারা—মধ্যমান।

কি সুধা ওই মদির নয়নে,
মন-ভৃঙ্গ আকুল লোভে, ধায় তাহারি পানে।

মরতে কি স্বরগে—কোথায় আছি জানিনে,
মৃদুল মোহের ঘোর লাগিল অবশ অলস পরাণে।

৪|০

০ ১
॥ র্সা -া না -া। ধপক্ষপা -ধনা -ক্ষধপা -মগা।
॥ কি — সু —। ধা — — —।

২ ॥ ৩
। ক্ষপা -ক্ষপা -ধা -ক্ষপা। মা -গা গা মা। মা -ধা ক্ষা -পা।
। ও — — ই। ম — দি র। ন — য় —।

। -গা -মা -ঋা সা। -া সঋা সা ঋা। -মগা গা পা পা।
। — — — নে। — মন ভৃ ঙ্গ। — আ কু ল।

। ক্ষা -া পা -া। ক্ষপা -ধনা -ক্ষধা -পা। র্সা না -ধা পধা।
। লো — তে —। ধা — — র। তা হা — রি।

৩
। ধনধা -পা -ক্ষধা পা॥ পা ধা পা পা। র্সা -না র্সা র্সা।
। পা — — নে॥ ম র তে, কি। স্ব — র গে।

। -া র্সা -র্ঋা -া। র্ঋা -র্সা -া র্ঋা। র্সা -া -া -া।
। — কো — —। থা — য়, আ। ছি — — —।

। -র্সা -ধা -পা -া। ক্ষা -পা -ধা পা। মা -া -গা -া।
। — — — —। জা — — নি। নে — — —।

। -1 গা মা -ধা। -ঋা পা -1 মা। -1 -গা মা -পা।
। — মৃ দু —। — ল — মো। — — হে —।

। মা রা -1 সা। সা সা সা -মা। -1 গা পা পা।
। র ঘো— র। লা গি ল —। — অ ব শ।

। ঋপা ঋপা ধনা -ঋধপা। র্সা নধা -পা -ধা।
। অ ল স —। প রা — —।

। -না -ধপা -ঋধা পা ॥ ॥
। — — — শে ॥ ॥

গান্ধারী তোড়ী—মধ্যমান।

কোয়েলিয়া মাতোয়ারা আনন্দে।
মন্দ মন্দ মলয় বহে অন্ধ ফুল-গন্ধে।
ভ্রমরা গুঞ্জরে, মুঞ্জরে কুঞ্জে চূত-মুঞ্জরী কি সুন্দর,
কোথা প্রিয়ে এ হেন বসন্তে।

৪।৩

০ ॥ ১
॥ নমা -মমা মা। -পদদা -পপদঞ্জা পা মঙ্গা।
॥ কোয়ে -লি য়া। — — মা তো।

২´ ৩
। মা পা -1 ঞদা। -দঞা পা -1 দা। পদা -দপা পা দা।
। য়া রা — আন। — ন্দে — ম। ন্দ,ম -ন্দ ম ল

। সা পা র্সা -া। পা মা -ঋা মপা। মা -ঋা -লসা -লা।
। য় ব হে —। অ ন্ধ — ফুল। গ — — —।

। সা ॥ । মমা ঞদা ঞা। র্সর্লা র্সা র্স র্সনা।
। ন্ধে ॥ ভ্রম রা গু। ঞ্জ রে, মু ঞ্জ।

। র্সর্না -া র্ঋর্ঋা -র্ঋর্লা। র্সা ঞর্সা ঞদা পপা।
। রে — কু —। ঞ্জে চূত মু ঞ্জরী।

। মঋা -লা সা সা। র্ঋা র্লা -র্লর্লা র্সা।
। কিশু — ন্দ র। কো থা -প্রি য়ে।

। ঞদা দপা মা দদপমা। ঋলসা ॥ ॥
। এ,হে ন ব স। ন্তে ॥ ॥

ব্যাখ্যা।

১। স্বরাক্ষরের উপর বিন্দু কম্পনের চিহ্ন। যথা, সা।

২। কোমল র=ল; কোমল গ=ঋ; কড়ি ম=হ্ম; কোমল ধ=দ; কোমল ন=ঞ।

৩। লমা—মমা=লমাঃ মা।

কোয়ে -লি=কোয়ে লি।

৪। যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন।

৫। স্বরাক্ষরের নীচে কসি, মীড়ের চিহ্ন। যথা মা-ঋা।

সমুদ্রের প্রতি।

(পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া।)

হে আদিজননি, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে'
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কি সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি' দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি' চলি' যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি' ফিরিয়া আসি' কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্ব্বসুখে
আর্দ্র করি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে। নিত্য বিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি,—আদি অন্ত তাহার কোথারে,
কোথা তার তল, কোথা কূল! বল কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তার সুগম্ভীর মৌন তার সমুচ্ছল কলকথা,

তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি !—কথনো বা আপনারে
রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে' এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি'
নির্দ্দয় আবেগে ; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি',
রুদ্ধশ্বাসে উর্দ্ধশ্বাসে চীৎকারি' উঠিতে চাহে কাঁদি',
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মত তারে বাঁধি'
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তিমাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধীপ্রায়
পড়ে' থাক তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিষণ্ণ নিশ্চল ;—ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে ; সন্ধ্যাসখী ভালবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপে চুপে
চলে' যায় তিমির-মন্দিরে ; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি'-ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে' ফুলে'।

আমি পৃথিবীর শিশু বসে' আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব ; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তার—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে,—লক্ষকোটি বর্ষ ধরে'
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে

মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবীপরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি'নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক্ হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি'
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা; প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া! দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্ব্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি'। প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি' যেত মহা-সন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদি জননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তর-স্মৃতিসম উদয় হতেছে বারম্বার।
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্ম্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে

আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি'
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি' জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পূরে'।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে ; তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাড়ীর টানে
আমার এ মর্ম্মখানি তোমার তরঙ্গমাঝখানে
কোলের শিশুর মত !

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা ? জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস,
নাহি জানে কি যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত ; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি'
সর্ব্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা,
বল তারে "শান্তি ! শান্তি !" বল তারে, "ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা !"

"ভারতবর্ষে।"

(২)

ফরাসী পর্য্যটক আন্দ্রে শেভ্রিয়ঁা সিংহলদ্বীপ প্রথম যখন জাহাজ হইতে দেখিলেন তখন তাঁহার কিরূপ মনে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। "গত কল্য 'কোইট্'-খেলা দুই বাজি হইল, তাহার মধ্যে একটি ছোট ইংরাজ বালিকা, মুখের রঙ ফ্যাকাসে ও স্বভাব একগুঁয়ে, কাপ্তেনের নিকট এই অঙ্গীকার করিল, যদি আজ সন্ধ্যার সময় আমরা কলম্বো নগরে পৌছিতে পারি তাহা হইলে সে তাঁহাকে তাহার একটি মুচ্কি হাসি দান করিবে। পাঁচটার সময় পূর্ব্বদিকে কুয়াশার ন্যায় অস্পষ্ট কতকগুলা কাল দাগ দেখা গেল। ছয়টার সময় আকাশে বেগ্‌নী রঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ-রাশি; সেই মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশের নীচে নারিকেলবৃক্ষসমাচ্ছন্ন একটি নিম্নভূমি দেখা দিল। যতই আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই উচ্চ, সরু বৃক্ষকাণ্ডসকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল। তাহারা একটু হেলিয়া সবেগে যেন আকাশ ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে এবং তালজাতীয় বৃক্ষের রীত্যনুসারে শিরোদেশে শাখাপত্র বিস্তার করিয়াছে। মনে হয় যেন, একটি বিস্তৃত অরণ্য সাগর-গর্ভ হইতে হঠাৎ সমুত্থিত হইয়াছে। এখনও উপকূল এক ক্রোশ দূরে, এখনও মাটি দেখা যায় না—কেবলই ঘোর হরিৎ বর্ণ-রাশি; তীরভূমির নিকটে গিয়াও আর কিছু দেখা যায় না। কেবলমাত্র বিষুবরেখাস্থিত প্রদেশ-সুলভ সেই উদ্দাম সরস উদ্ভিজ্জরাশি বর্ষা-সিঞ্চিত ভূমি

হইতে সতেজে উত্থিত হইয়া মুক্তবায়ুর আলিঙ্গনে স্বকীয় হরিৎ করতল প্রসারিত করিয়াছে।”

সেখানকার “ওরিএণ্টাল” নামক হোটেলে য়ুরোপীয় প্রভু ও দেশীয় ভৃত্যদিগের যেরূপ রকম-সকম গ্রন্থকার দেখিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। “ওরিএণ্টাল হোটেলের বাড়িটি প্রকাণ্ড ও বেশ সুখবাসযোগ্য। হোটেল-স্বামীর আদব্-কায়দা খুব দুরস্ত; ভৃত্যদের প্রতি তিনি অল্প কথায় আমাকে যথাস্থানে স্থাপিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন—তাঁহার সেই আজ্ঞা ভৃত্যেরা নীরবে নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া আমাকে একটি সৌধ-ধবল বড় কামরা দেখাইয়া দিল। বেশী আস্‌বাব নাই—কেবল একটিমাত্র মশারি-টাঙ্গানো লোহার খাট; আর, একটি বেতে ছাওয়ানো গভীর-তল আরাম-চৌকি; নিস্তব্ধ ও দুর্যাপ্য সময়ে সেই চৌকির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে বেশ। কামরার চাঁদোয়া-ছাদে একটি অদ্ভুত দাগ; প্রথম একটি, পরে দুই তিনটি অচল ক্ষুদ্র টিক্‌টিকি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। ঘরের আশ-পাশের দীর্ঘ ঢাকা বারাণ্ডায় ক্ষীণদেহ কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী ও সিংহলী ভৃত্যের পাল নিঃশব্দে ও ত্রস্তভাবে যাতায়াত করিতেছে। দীর্ঘকায়, গুরুভার-দেহ য়ুরোপীয়দিগের নিকট এবং যে সকল প্রশান্ত ও পেশীবহুল ইংরাজ সায়াহ্ণ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ঝক্‌ঝকে ক্রিল-দেওয়া সাদা কামিজ বুকের নিকট বাহির করিয়া, মানব অপেক্ষা যেন কোন উৎকৃষ্টতর দুরধিগম্য জীব এইরূপ ভাণ ও ভাবভঙ্গী সহকারে সেই বৃহৎ ভোজনশালায় প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগের নিকট ভৃত্যেরা অত্যন্ত বিনয়াবনত।”

কান্দিনগরে যাইবার সময়ে রেলগাড়িতে ইঙ্গ-বঙ্গের ন্যায়

একজন ইংরাজ-বেশধারী ইঙ্গ-সিংহলীর সহিত গ্রন্থকারের আলাপ হয়। তিনি বলেন,—"কান্দিতে যাইবার জন্য ট্রেণ ধরিলাম এবং গাড়ির মধ্যে একজন সিংহলী 'জেন্‌টল্‌ম্যানের' সহিত আলাপ হইল। এই 'জেন্‌টল্‌ম্যানটি' অতি সুসভ্য; তাঁহার 'টুয়িড্‌' কাপড়ের কতুয়ার পরিধানে কোন খুঁৎ নাই, এমন কি, একজন লণ্ডনের 'ম্যাশর্‌' তাহা পরিয়া গর্ব্বানুভব করিতে পারেন। তাঁহার বোতামের ছিদ্র জার্ডিনিয়া পুষ্পে ভূষিত; তাঁহার পদদ্বয় কেবল, সাদা সরু কষা পায়জামার মধ্যে আবদ্ধ। তাঁহার মুখশ্রী প্রায় য়ুরোপীয়। বরং একজন ইটালিয়ান তাঁহার অপেক্ষা অধিক ক্ষীণদেহ, কোমলাঙ্গ ও রৌদ্রদগ্ধ। তাঁহার মুখাবয়ব সকল বহির্ম্মুখ ও অস্থিময়। তাঁহার চক্‌চকে শক্ত কাল কোঁকড়া দাড়ি। সওয়া ঘণ্টা নীরবতার পর, য়ুরোপের রেলগাড়িতে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। তিনি আমাকে দেশালাই বাক্‌স দিবার জন্ত উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন, বড় গরম হইতেছে। ইংরাজের দেশে শীতোত্তাপের কথা পাড়িয়াই আলাপের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং দুই জনে আলাপ করিতে হইলে কথার আরম্ভে এই গৌরচন্দ্রিমা নিতান্তই আবশ্যক। এক্ষণে তিনি কতকগুলি সুস্পষ্ট কথায়, সিংহল দ্বীপের লোকসংখ্যা, শাসনপ্রণালী ও ধর্ম্ম আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমশঃ যতই তিনি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার কথাবার্ত্তায় আমার ধারণা হইল, ইংরাজি ছাঁচের ছাপ তাঁহাতে কতটা গভীর বসিয়াছে। তিনি আশ্চর্য্য বিশুদ্ধতার সহিত ইংরাজি ভাষায় কথা কহেন—তাহাতে কোনপ্রকার অযথা উচ্চারণের টান আছে বলিয়া অনুভব হয় না। ইনি খৃষ্টান্‌, কৌঁন্সুলি ও এখানকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। ইনি যেরূপ

ঘৃণামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষসহকারে সিংহলবাসী চাষাদিগের অজ্ঞতা ও পৌত্তলিকতার কথা বলিলেন, তাহা ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরই মুখে শোভা পায়। তবে, তিনি বলিলেন, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনেকটা পরিবর্ত্তন হইবে; ইতিমধ্যেই রেল-গাড়ি অনেকটা ভাল কাজ করিয়াছে; লৌহপথের সম্মুখ হইতে অসভ্য প্রদেশসকল যেন পিছু হটিয়া যাইতেছে। কলম্বোতে আমরা কলিকাতা, বোম্বাই ও বারাণসীর ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং কিছুকাল পরে যখন আমরা উপযুক্ত হইব, জাতীয় নির্ব্বাচন-মূলক পার্লামেন্ট সভা প্রবর্ত্তিত করিবারও আমাদের ইচ্ছা আছে। তাহা অবশ্য অল্পে অল্পে ক্রমশঃ হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহি না—কারণ, ইংলণ্ডের প্রসাদেই আমরা সভ্য-জগতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আরও এই কথা বলেন যে, তিনি 'আর্য্যজাতীয়' এবিষয়ে তাঁহার এতদূর ধ্রুব বিশ্বাস, যেমন আমার ধ্রুব বিশ্বাস আমি ফরাসিস্। সুতরাং, তিনি আপনাকে সকল য়ুরোপীয়দিগের সমকক্ষ এবং অনেক য়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। যাহাই হউক, ইনি বড় বেশী রকম ইংরেজ; প্রত্যক্ষ দেখা যায়, ইহাঁর নিকট, ইংরাজই যেন মানবজাতির উৎকৃষ্ট আদর্শস্থল। কিন্তু ইংরাজের এতটা অবিকল 'কাপি' বা অনুলিপি আসলে স্বাভাবিক নহে। তা' ছাড়া, তাঁহার পরিহিত সাদা পায়জামা এবং সেই আসিয়াবাসী-সুলভ মুখশ্রীর দুই এক পোঁচ যাহা তাঁহার মুখে জাজ্বল্যমান, তাহার সহিত এই সমস্ত য়ুরোপীয় বাহাড়ম্বর একটু বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। আসল কথা, একজন লম্বিতবেণী ও নীল রঙ্গের আলখাল্লা-পরা চীনেম্যানকে ভাল লাগে, তবু জ্যাকেট-

পরা ও বিলাতী টুপিপরা জাপানীকে ভাল লাগে না। এই সকল পীত ও কৃষ্ণচর্ম্মধারী লোকেরা যেরূপ আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত আমাদিগের অনুকরণ করে তাহাতে একটু সন্দেহ জন্মে ; মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, এই অনুকরণ শুধু উপরি-উপরি ভাসা-ভাসা, না, তাহা ছাড়াইয়া আরও কিছু দূর যায় ?—বাস্তবিক মূলে কি সেই মোগল কিম্বা কাফ্রির রহস্য প্রছন্ন নাই ? এই ব্যক্তি যেরূপে ঠাণ্ডাভাবে বাক্যোচ্চারণ করেন, ইহাঁর চাল্-চোল্ যেরূপ খট্খটে ও অনম্য—যেরূপ সবিলম্ব আগ্রহ-শূন্য তাচ্ছিল্যভাবের ভঙ্গী সহকারে সাদা ঝিনুকের বাক্স হইতে ইনি সিগারেট চুরোট বাহির করেন, তাহাতে আমি ইহাঁর প্রতি ধরণধারণে আশ্চর্য্য হইতেছি।"

গ্রন্থকার পণ্ডিচারিতে যখন পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার একজন সহযাত্রী ফরাসী গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। এই কর্ম্মচারীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পণ্ডিচারির দেশীয় ও য়ুরোপীয় তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হইয়াছিল। আমাদের দেশে গবর্ণর প্রভৃতিকে অভ্যর্থনা করিবার সময় যেরূপ সৈন্তশ্রেণী রাজপথে দাঁড় করাইয়া দিয়া, বিজয়-তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া মহাসমারোহে নানা অনুষ্ঠান করা হয়, এখানেও তৎসমস্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তবে, পণ্ডিচারিতে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের তিন শ' মাত্র সৈন্য। এই তিন শ' সৈন্য লইয়া অলীক যুদ্ধ প্রদর্শন করা নিতান্ত ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার বিদ্রূপের ভাবে বলেন যে, এই সমারোহের সময়ে ঐ সকল সৈনিকেরা বন্দুকের গুঁতার দ্বারা দেশীয় লোকদিগকে সরাইয়া দিতে ও য়ুরোপীয় দেখিলেই সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতে ত্রুটি করে নাই। সেই নবাগত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট পণ্ডিচারির বহু সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিদিগের দস্তুর-মত পরিচয় দান এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের সস্মিত বদনমণ্ডলের ভাব প্রভৃতি গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন। যখন সেই পরিচয়দানের অনুষ্ঠান হইতেছিল, মহা জাঁকজমক করিয়া এক-জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নবাগত কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়া মস্তক নত করিল। ইঁহার হস্তে একটি রৌপ্য-দণ্ড ছিল—পূর্ব্বকালের ইংরাজ-ফরাসীযুদ্ধে, ফরাসীদিগের যখন কামানের গোলা ফুরাইয়া যায়, তখন এই ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষেরা রাশি রাশি খনিজ স্বর্ণপিণ্ড গোলারূপে ব্যবহার করিবার জন্য ফরাসীদিগকে দান করিয়াছিল। তাই তাহার প্রতিদান স্বরূপ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্মানার্থ একটি রৌপ্য-দণ্ড বক্‌সিস্ করেন। ইহা নিঃস্বার্থ রাজভক্তির একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থকার এদেশীয় স্ত্রীলোকদের গঠন সম্বন্ধে এইরূপ বলেন। "এই সকল স্ত্রীলোক সাদাসিধা অথচ জমকাল পরিচ্ছদ পরিধান করে। ইহারা যখন চলা-ফেরা করে তখন যেমন চক্ষের তৃপ্তি হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। মাথায় পিতলের ঘড়া লইয়া, যেরূপ তাহারা পশ্চাতে একটু হেলিয়া সটান ভাবে দণ্ডায়মান হয়, তাহাতে তাহাদের সুন্দর গঠন-রেখাসকল প্রকাশ পায়। বিচিত্র রঙের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও, উহাদিগকে দেখিয়া পুরাকালের গ্রীক রমণীদিগকে মনে পড়ে। সেই একই প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দেহভঙ্গী, সেই একই অঙ্গভঙ্গীর প্রশান্তভাব—সেই একই মুক্তবায়ুতে জীবন-যাপন—সেই একই ছোট ছোট মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘরে বাস। এই সকল ঘর নিম্ন, ঠাণ্ডা, সাদা ধব্‌ধবে, চৌকোণা ও আসবাব-বিরহিত; এবং তাহাদের ছায়ায় বসিয়া রমণীগণ সুতাকাটা কার্য্যে নিযুক্ত।"

গ্রন্থকার পণ্ডিচারিতে ডুপ্লের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং

তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি এই কথা বলেন, "একজন ইংরাজ আমাকে বলেন, ডুপ্লে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি—তিনি আমাদের কিছু কষ্ট দিয়া গিয়াছেন। সীমান্ত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে শুল্ক আদায়ের আড্ডা স্থাপন করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি এবং আমাদের যত চোর সব পলাইয়া তোমাদের ওখানে বাস করে। এই উপনিবেশটি রাখিয়া তোমাদের কি লাভ? একজন ফরাসিস্, তাহার উত্তরে এই কথা বলেন, লাভ আর কিছুই নয়, ইহার অর্থ এই মাত্র, ভারতবর্ষে ডুপ্লের প্রস্তরমূর্ত্তি থাকা আবশ্যক এবং তাহা তাঁহার নিজালয়েই স্থাপিত হওয়া প্রার্থনীয়।"

স্বার্থ ও পরার্থ।

স্বার্থ ও পরার্থ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই দুইটা বিরোধ বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। অথবা যেদিন হইতে এই বিরোধের আরম্ভ, মনুষ্যের সমাজেরও আরম্ভ সেইদিনে। এই বিরোধের ধারাবাহিক প্রবাহকেই সমাজের জীবন বলিলে বলা চলে। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজগত জীবনে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যে সনাতন বিরোধ দেখা যায়, তাহাও মোটের উপর ইহাই। স্থূলতঃ, স্বার্থের অভিমুখে, প্রবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তাহার নাম অধর্ম্ম। পরার্থের অভিমুখে, নিবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তাহার নাম ধর্ম্ম। হয় ত ধর্ম্মাধর্ম্মের এইরূপ সংজ্ঞা সকল ক্ষেত্রে খাটিবে না; স্বার্থপ্রবৃত্তিমাত্রকে অধর্ম্ম পর্য্যায়ভুক্ত করিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তুমুল সমস্যা হইয়া পড়ে; আবার স্বার্থনিবৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ধার্ম্মিকের সংখ্যায়

বিরত হইতে হয়। তবে দুই চারিটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ হাতে রাখিয়া ধরিলে মোটামুটি বেশী ভুল না হইতে পারে। যুক্তির কথা ও বিচারের কথা ছাড়িয়া নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি যে সকলের ভিন্ন ভিন্ন সমাজে অভ্যুদয় হইয়াছে, তাদের দিকে চাহিলেও সেই কথাই সমর্থিত হয়। প্রবৃত্তির নাম অধর্ম্ম ও নিবৃত্তির নাম ধর্ম্ম, এইরূপ ব্যাখ্যা বড় নূতন নহে।

বলা বাহুল্য, স্বার্থ পরার্থের এই ঝগড়া মানুষ ভিন্ন অন্য জীবে বড় লক্ষিত হয় না। ইতরজীবের জীবন স্বার্থময়; পরার্থ-প্রবৃত্তি যদি কোথাও দেখা যায়, সেখানে পর অর্থে নিজের সন্তান, জোর সহচর বা সহচরী। ইতরজীবের মধ্যে যাহারা দল বাঁধিয়া বা সমাজ বাঁধিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে যে স্বার্থত্যাগের উদাহরণ দেখা যায়, নৈতিক কাব্যলেখকেরা যে সকল উদাহরণ দুঃশীল মানুষের সম্মুখে উৎসাহের সহিত স্থাপিত করেন, সে সমস্তই তাহাদের স্বাভাবিক সংস্কারজাত; মানুষের মত স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত নহে; তাই নীতিশাস্ত্রের বিচারে তাহাদের স্থান নাই। স্বাধীন ইচ্ছা কথাটা উচ্চারণ করিতে ভয় হয়, কেন না, এই কথাটা উৎকট তর্কসমরের ক্ষেত্র। এস্থলে সে তর্কে প্রবেশের কোন আবশ্যকতা নাই, এইপর্য্যন্ত বলা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইতরজীবে নাই, মনুষ্যসমাজে আছে; কেন না, জাতিবিশেষে ইতরজীব হয় সকলেই ধার্ম্মিক, নয় সকলেই অধার্ম্মিক। মানুষে কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক। ইতরজীবে যেমন স্বার্থে পরার্থে বিরোধ নাই, যে সব মানুষের অবস্থা এখনও ইতরজীবের সদৃশ, তাদের মধ্যেও তেমনি এই বিরোধের প্রখরতা দেখা যায় না। কেননা, এই বিরোধের সূত্রপাতেই সমাজের সৃষ্টি; এই বিরোধের স্থায়িত্বেই সমাজের

জীবন; এই বিরোধের বর্ণনাই সমাজের ইতিহাস। এবং সভ্যতা নামে যে সমাজবিশেষের একটা বিশেষণ শুনা যায়, তাহাও এই বিরোধের পরিণতি ও আনুষঙ্গিক ফল।

আর একটা কথা আছে। মানুষের জীবনের সমুদয় কার্য্য স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি এই দুইটি মাত্র পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। সূক্ষ্ম হিসাবে, স্বার্থপ্রবৃত্তি, স্বার্থনিবৃত্তি ও পরার্থ-প্রবৃত্তি এই তিনটা পর্য্যায় আনিতে হয়।

প্রথম, স্বার্থপ্রবৃত্তি;—যেমন ক্ষুধা পাইলে আহার করিও। বলা বাহুল্য, এই উপদেশ দিবার জন্য বিশেষ আড়ম্বরের দরকার নাই; ভোজনকালে বৃদ্ধের বচন সর্ব্বত্র অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয়, স্বার্থনিবৃত্তি; যেমন চুরি করিও না, মিছা কথা কহিও না। গুরু-পুরোহিতসম্প্রদায়, লোকশাসন ও রাজশাসন, পুলিশ ও আদালত এই শিক্ষাদানে নিযুক্ত। নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বেশীর ভাগই এই উপদেশ।

তৃতীয়, পরার্থপ্রবৃত্তি,—দুঃখীর প্রতি দয়া করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্র-মাত্রেই এরূপ বাক্য দুই চারিটা পাওয়া যায়। তবে মানুষের এখন যে অবস্থা, তাহাতে পরার্থপ্রবৃত্তির অপেক্ষা স্বার্থনিবৃত্তির দিকেই বেশী টান দেখা যায়।

এই তিনের সামঞ্জস্যসাধনের চেষ্টাতে জীবন। স্বার্থ কিছু বাহাল রাখিতে হইবে, প্রকৃতির নিয়ম এই—নতুবা জীবন টিঁকে না। পরার্থের জন্য স্বার্থ উৎসর্গ করিতে হইবে, নতুবা সমাজ চলিবে না, সমাজের মঙ্গল হইবে না। আর, সমাজের মঙ্গল না হইলে সমাজভুক্ত ব্যক্তিরও মঙ্গল নাই। একটি ব্যক্তি-জীবন রক্ষার উপযোগী, অন্যটি সমাজের জীবনের জন্য আব-শ্যক। মানুষ দুর্ব্বল জীব; সমাজে না থাকিলে উৎকট জীবন-

সংগ্রামে তাহার কল্যাণ নাই; তাই যেমন করিয়াই হউক, নিজের লোকসান স্বীকার করিয়াও সমাজের সমবেত বলের নিকট মাথা নোয়াইতে হইবে; নিজের মুখের গ্রাস পরের মুখে না দিলে চলিবে না। ব্যাখ্যাটা নিতান্ত ইউটিলিটি মতানুযায়ী হইল। কিন্তু অভিব্যক্তির প্রণালী সর্ব্বত্রই এইরূপ; ভালর মূলে মন্দ। তাহাতে পরিতাপ করিয়া বিশেষ ফল নাই।

সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা লইয়া জীবন; কিন্তু সামঞ্জস্যবিধান দুরূহ ব্যাপার; একেবারে ঘটে কিনা সন্দেহ। কতটুকু নিজের জন্য রাখিব, কতটুকু পরের জন্য রাখিব, মীমাংসা সহজ নহে। পাঁচ জনের পাঁচ মত। আবার মত অনুসারে কাজ হয় না। মতের সহিত কাজের মিল নাই। কাজ প্রধানতঃ প্রবৃত্তির অভি-মুখে; মত প্রধানতঃ নিবৃত্তির অভিমুখে। উপদেশদানে যিনি পরম সন্ন্যাসী, কাজের বেলায় তিনি ঘোর বিষয়ী। সংসারের এই একটা প্রধান রহস্য বা আমোদ।

নিবৃত্তিমার্গে প্রবর্ত্তনার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। সংখ্যাতীত নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। অনেক স্থলে বিবাদ বিসংবাদ, রক্তপাত পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থ বিসর্জ্জন কর, পরার্থে জীবন উৎসর্গ কর, এই গুরুগম্ভীর উপদেশের অপ্রতুল দেখা যায় না।

স্বার্থ বিসর্জ্জন করিব কেন, সহজেই এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। প্রশ্নটার সঙ্গত উত্তর না দিলে উপদেশ নিষ্ফল হয়। তাই ঘোরতর পরার্থবাদীরাও ইহার উত্তর দিয়াছেন, বা নানা-রূপে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তর দুইচারিটার একটু সমা-লোচনা করিলে শিক্ষা ত আছেই, আমোদও আছে।

প্রবৃত্তির নাম অধর্ম্ম, নিবৃত্তির নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আচরণ কর,

সুখে থাকিবে। ধর্ম্মের পথ কণ্টকাকীর্ণ; প্রথমে দুঃখ আছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুখ। সুখই যখন জীবনের উদ্দেশ্য, সুখলাভের ইচ্ছাই প্রবৃত্তি, তখন ভবিষ্যৎ সুখের জন্য আপাত-দুঃখে ভয় পাইও না। অর্থাৎ, তোমাকে নিবৃত্তি উপদেশ দিতেছি কেন,—না, শেষ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির অনুযায়ী ফল পাইবে বলিয়া। সংসারের বন্দোব· টা খারাপ; কষ্ট না করিলে সুখ হয় না; সেইজন্য কষ্ট ক .ত বলিতেছি। পরার্থসাধনে যে বিশেষ মাহাত্ম্য আছে এমন ; তবে সেটা নইলে স্বার্থসিদ্ধি ঘটে না। অন্যরূপ বন্দোবস্ত থাকিলে তোমাকে এ উপদেশ দিতাম না। উত্তরটা কতদূর ধর্ম্মস/ত বলা যায় না; তবে মানুষের মনের মত বটে। প্রলোভন দেখাইয়া যদি কাজ পাওয়া যায়, এ হিসাবে বুদ্ধিমানের উপযুক্তও বলা যা.। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রলোভনটা প্রলোভনমা.ই; ধর্ম্মপথে সুখলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কষ্ট পাওয়া. সার হয়, ফললাভ সর্ব্বদা হয় না। অধিক বলা আবশ্যক ন.ই; ধর্ম্মের জয় সংসারের অখণ্ড নিয়ম হইলে, উপদেশের এত বাড়াবাড়ি হইত না।

সুতরাং উত্তরটা নিখুঁৎ হইল না। কাজেই প্রলোভনের মাত্রাটা চড়াইয়া কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। আমরা কল্পনা বলিয়াই নিরস্ত হইলাম; দুষ্টলোকে বলে প্রতারণা। ইহলোকে সুখ দুর্ঘট বটে, কিন্তু পরলোকে সুখ অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্ম কর, পরকালে সুখে থাকিবে। পরকালের সুখ নানাবিধ;—স্বর্গ, নন্দনকানন, পারিজাত, অপ্সরা, ইন্দ্রত্ব। কেহ এতদূর নামিতে সাহস করেন না; তাঁহাদের মতে ঈশ্বরসামীপ্য, মুক্তি, নির্ব্বাণ। এক শ্রেণীর মতে সুখপ্রাপ্তি; অন্যের মতে দুঃখনিবৃত্তি মাত্র। আবার অন্য উপায়ও আছে। উপদেশমত কাজ কর ভালই,

নতুবা পরকালে ঠকিবে। রৌরব, কুম্ভীপাক, ডাঁশ, গন্ধকের আগুন; অগত্যা ন্যূনপক্ষে পুনর্জন্ম। কিন্তু হইলে কি হয়, দুরন্ত মানব ইহাতেও বশ হয় না। গুরুসমীপে উপদেশের যাথার্থ্য সকলেই মানিয়া লয়; কিন্তু কার্য্যকালে "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য" ন্যায় অবলম্বন করে। সুতরাং, উত্তরটা যেমনই যুক্তি-যুক্ত হউক, কাজে বড় সফলতা লাভ করে না। মানুষের স্বভাব এমনি দুর্দ্দম্য।

তৃতীয় উত্তর সেই একই কথা, আর একটু ঘুরাইয়া। ধর্ম্মের জয় সত্য; কিন্তু সঙ্কীর্ণ ভাবে গ্রহণ করিলে হইবে না। পরকালের ভরসায় প্রস্তুত নহ; ইহকালে সুখের দাবী করিলেও ঠিক্ থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মের জয় মিথ্যা নহে। সর্ব্বত্র না হইতে পারে, মোটের উপর; আজিকালি না হইতে পারে, শেষ পর্য্যন্ত, ধর্ম্মের জয় অব্যাহত। এইরূপে অর্থের পরিসর বাড়াইয়া ব্যাখ্যা করিলে আর আপত্তি বড় চলে না। ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম সমাজ লইয়া। যেখানে সমাজ নাই, যেখানে ব্যক্তিগত জীবন সমষ্টীকৃত হইয়া সমাজজীবনে পরিণত হয় নাই, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রয়োগ বা অস্তিত্ব নাই। যেখানে সমাজ বাঁধে নাই, সেখানে স্বতন্ত্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; পরতন্ত্রতার লেশ নাই। সমাজের আঁটাআঁটির সহিত পরতন্ত্রতা আসে, পরাধীনতা আসে, পরের জন্য স্বার্থসংহার আসে, ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়। আবার যাহা সমাজরক্ষার অনুকূল, স্থূলতঃ তাহারই নাম ধর্ম্ম; যাহা প্রতিকূল, স্থূলতঃ তাহাই অধর্ম্ম। আবার সমাজের অবস্থা-ভেদে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রকৃতিভেদ; সমাজের গতি ও অভিব্যক্তির সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অভিব্যক্তি। সুতরাং, যে সমাজে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, তাহারই গতি উর্দ্ধমুখে; সেখানে লাঞ্ছনা তাহার গতি রোধে;

সুখে। ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে পার; বস্তুতঃ প্রকৃতির নির্ব্বাচন-প্রণালী, যাহা জীবরাজ্যে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সমাজের পক্ষে তাহারই প্রয়োগমাত্র।

এক কথায় এই;—প্রবৃত্তি নিরোধ কর, তাহাতে ভাল হইবে; তোমার ভাল হইবে সাহস করিয়া বলিতে পারি না, আমাদের ভাল হইবে। আমাদের ভাল হইলে কতকাংশে তোমারও ভাল। সেই পর্য্যন্ত তোমার পক্ষে প্রলোভন। অন্য প্রলোভন তোমাকে যা' দিই, সেটা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সেটা আমাদের পলিসি। পরের মন্দ করিও না, করিলে শাস্তি দিব; পরের ভাল করিও, তোমাকে সুশীল বলিব।

এইরূপ উত্তরে যুক্তি আছে, সরলতা আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইউটিলিটি ও ক্ষতিলাভগণনাও আছে। আবার আত্মপক্ষে লাভাঙ্ক অপেক্ষা ক্ষতির অঙ্ক গুরু দেখায়; তাই এরূপ উত্তর ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তনায় সাহায্য করে না; কাজেই ধর্ম্মোপদেশের মধ্যে গণ্য হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার স্থান নাই।

চতুর্থ এক সম্প্রদায়ের একরকম উত্তর আছে; তাহার প্রকৃতি এ তিনের হইতে স্বতন্ত্র। ধর্ম্ম আচরণ কর, কেন না, ধর্ম্ম আচরণ কর্ত্তব্য। সুখের আশা করিও না, সুখ অনিশ্চিত। দুঃখ দেখিয়া ডরাইওনা; দুঃখ জীবনের সহচর। কর্ত্তব্য এইমাত্র বোধে ধর্ম্মাচরণ কর, ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। এমন কি, ইহকালে কি পরকালে, সুখপ্রাপ্তি তোমার যদি ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তোমাকে ধর্ম্মাচারী বলিব না। সমাজের লাভ হইবে কি না গণনা করিয়া, ইউটিলিটির হিসাব ধরিয়া, যদি তুমি ধর্ম্ম-কর্ম্মে প্রস্তুত হও, তোমাকে ধার্ম্মিকের পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহি না। কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, কর্ত্তব্যপালনই তোমার প্রকৃতিগত

হউক, কর্ত্তব্যপালন বিনা তোমার যেন শান্তি না জন্মে। কেন করিব, জিজ্ঞাসা করিও না, যুক্তিতর্ক অন্বেষণ করিও না, ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। ইহাই প্রকৃতির আদেশ। ইহাই প্রকৃতির নিয়মিত ধর্ম্মশাস্ত্র।

বলা বাহুল্য, সকল শাস্ত্র এই প্রাকৃতিক ধর্ম্মের উপদেশ দেয় না। যে শাস্ত্র দেয়, সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। কোন্ শাস্ত্রে এই উপদেশ দিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের অধিবাসীকে বলিতে হইবে না।

কাব্যগ্রন্থ মধ্যে রামায়ণের নায়কনায়িকার চরিত্র এই [illegible] দেয়। তাই রামায়ণ কাব্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হইতে পারে, এরূপ উপদেশে প্রলোভন নাই, প্রবোধ নাই, সান্ত্বনা নাই। কিন্তু আদর্শ মানুষ প্রবোধ খুঁজে না; কর্ত্তব্য পালন করে। সংসারে প্রবোধ ও সান্ত্বনার অস্তিত্ব নাই।

টরকোয়াটো টাসো এবং তাঁহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন।

(লিওপার্ডির ইতালীয় হইতে অনুবাদিত।)

বেতাল। আছ কেমন হে টরকোয়াটো?

টাসো। কারাগারে দুঃখযন্ত্রণায় আগ্রীব নিমজ্জিত হ'য়ে লোকে যে কি রকম আরামে থাকে তা'ত তোমার অবিদিত নেই।

বে। আঃ যাও, আহারান্তে এখন কি দুঃখ গাইবার সময়? মনে স্ফূর্ত্তি কর, এস দু'জনে মিলে ভাবনাচিন্তার কথা সব হাস্য-পরিহাসে উড়িয়ে দেওয়া যাক্।

টা। হাসিখেলা আমার তেমন সহজে আসে না। তা' যাই হোক্, তোমাকে দেখ্‌লে এবং তোমার কথাবার্ত্তা শুন্‌লে আমি অনেকটা সান্ত্বনা পাই। এস, আমার পাশে এইখানে ব'স।

বে। হুঁ, তুমি ত বল্লে, কিন্তু আমি বসি কি করে'? অশরীরি-দের পক্ষে ও কাজটা তেমন সহজসাধ্য নয়। আমি এই-খানেই রইলুম, ধরে' নাও যেন তোমার পাশেই বসেছি।

টা। হায়, আবার কখন কি লিওনোরার সঙ্গে আমার দেখা হবে! যখনই তার কথা মনে পড়ে তখনই প্রচণ্ড জ্বালার ন্যায় একরকম আনন্দ আমার দেহমন অধিকার করে' ফেলে, মাথার কেশাগ্র হ'তে পায়ের নখ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ দাহ কর্‌তে থাকে, শরীরের প্রতি শিরা, প্রতি স্নায়ুটি পর্য্যন্ত কেঁপে ওঠে। তখন, তার বিষয় ভাবতে ভাবতে স্মৃতিতে সেকালের সব আশা ভরসা, সব বাসনা, সব সুখের কল্পনা জেগে ওঠে—ক্ষণিকের জন্য ভুল হয়, যে, দুরদৃষ্ট ও মনুষ্যজাতির সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্ব্বে যেমন ছিলুম আজও বুঝি সেই টাসোই আছি। আর আজকাল? চোখের জলে শুধু মৃত্যুর আবাহন কচ্ছি। আমার বিশ্বাস যে, সমাজের সংশ্রবে ও জীবনের নানা কষ্টে আমাদের প্রকৃত ভিতরকার মানুষটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়—আমাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতর তার সমাধি হয়। কখন কখন সেটি দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য জাগ্রত হয়ে ওঠে, কিন্তু দিন যত যায় তার নিদ্রা-ভঙ্গও তত বিরল হ'য়ে আসে। সাধারণতঃ ক্রমে সেটি আমাদের মধ্যে গভীর হ'তে গভীরতম প্রদেশে অন্তর্হিত হয় এবং যত

সময় যায় তার নিদ্রাও তত গাঢ় হ'য়ে আসে। অবশেষে আমরা জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তেই তার মৃত্যু হয়। যাক্ ও কথা। আমার এই বড় আশ্চর্য্য মনে হয় যে, একটি রমণীর স্মৃতিমাত্রে এমন কি শক্তি নিহিত আছে যে, আমার হৃদয় মনকে আবার সজীব করে' তুল্‌তে পারে, আমার সমস্ত দুর্গতির কথা ভুলিয়ে দেয়। জানি যে তার সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কখনও দেখা হবার সম্ভাবনা নেই—নইলে ভাবতুম যে, আমার সুখী হবার ক্ষমতা এখনও একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায় নি।

বে। প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া এবং তার বিষয় চিন্তা করা, এ দু'য়ের মধ্যে তুমি কোন্‌টিকে বেশী মধুর মনে কর?

টা। বল্‌তে পারিনে। তবে এইটুকু ধ্রুব যে, সমক্ষে তাকে রমণী বলে' জানতুম—চোখের অন্তরালে সে আমার নিকট দেবী-রূপে প্রতীয়মান।

বে। এই দেবীদের কিন্তু মর্ত্ত্যবাসী পুরুষজাতির প্রতি এত করুণা যে, তোমাদের কেউ তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হ'লে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁরা নিজেদের দেবীত্ব লুকিয়ে ফেলেন, নিজেদের কিরণ আশপাশ হ'তে সংহার করে' নিয়েএসে, অঞ্চলের অন্তরালে চাপা দেন—পাছে তাঁদের দীপ্ত প্রভায় কারও চোখ ঝল্‌সে যায়।

টা। যা' বলছ তা' খুব ঠিক। কিন্তু তোমার কি এটা স্ত্রী-জাতির একটা মহা ত্রুটি বলে' মনে হয় না, যে, যাচিয়ে নিতে গেলেই ধরা পড়ে, যে, কল্পনায় আমরা তাদের যে রকম গড়ে' তুলি আসলে তারা তা' হ'তে কত বিভিন্ন।

বে। তারা সুধা দিয়ে গঠিত না হ'য়ে রক্তমাংসে গঠিত এতে তাদের যে কি অপরাধ তা' ত আমি ভাল বুঝতে পারিনে। আচ্ছা বল ত, তোমরা রমণীজাতিতে যে প্রকার চরম উৎকর্ষ

থাকা উচিত মনে কর, তার কণামাত্র কিম্বা আভাসমাত্র পৃথিবীর আর কোন পদার্থে কি লক্ষিত হয়? আমার বিশেষ অদ্ভুত এই মনে হয় যে, পুরুষজাতি যে শুধু মানুষ বই আর কিছুই নয়, অর্থাৎ, কিছু অতিরিক্তরূপ শ্রদ্ধা কিম্বা ভালবাসা উদ্রেক করবার মত জীব নয়, এটা তোমাদের কাছে মোটেই বিস্ময়কর নয়—কিন্তু রমণীরা প্রত্যেকে যে এক একটি সুরকন্যা হয়ে জন্মান নি, এইটেই তোমাদের নিকট একেবারে দুর্বোধ্য ব্যাপার।

টা। তা' যাই হ'ক্—আমি এখন একবারটি তাকে দেখবার জন্য, দুটো মুখের কথা তা'কে শোনাবার জন্য মরে' যাচ্ছি।

বে। আচ্ছা, আজ রাত্রে স্বপ্নে তোমার সম্মুখে তাকে উপস্থিত করব; সাক্ষাৎ যৌবনের মত সুন্দরী, এবং তোমার প্রতি এতটা অনুকূলা যে, তুমি সাহস করে' মন খুলে অনেক কথা তার সঙ্গে কইতে পারবে যা' জীবনে এর পূর্ব্বে তোমার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নি। অবশেষে আমি তোমার হাত দু'খানি নিয়ে তার সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ করে' দেব, আর সে তোমার ঐরূপ ব্যাকুলতা নিরীক্ষণ করে' তোমার অন্তর এতটা মাধুর্য্যে পূর্ণ করে' দেবে যে, তোমার হৃদয়ে সে সুখের স্থান কুলাবে না—আর, আগামী কল্য যখনই এই স্বপ্নের ব্যাপার স্মরণ করবে, অমনি ভালবাসায় তোমার হৃদয় উথলে উঠবে।

ট। বড়ই প্রীত হলুম, সত্যের পরিবর্ত্তে স্বপ্ন!

বে। সত্য পদার্থটি কি?

টা। পাইলেটের অপেক্ষাও এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কম।

বে। ভাল, আমিই তোমার হ'য়ে উত্তর দিচ্ছি। সত্য ও স্বপ্নে অন্য কোনও প্রভেদ নেই—এই ছাড়া যে, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য স্বপ্নে কখন কখন পাওয়া যায়, সত্যে কখনও না।

টা। তাহ'লে সুখের বিষয় স্বপ্ন দেখা ও সুখ ভোগ করা দুই সমান।

বে। আমার মতে তাই। আমি একটি লোককে জানি, যিনি যে রজনীতে কোনও সুস্বপ্নে তাঁর প্রণয়িনীর দেখা পেতেন, তার পর দিন যাতে উক্ত প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ না হয় সেইরূপ চেষ্টা কর্‌তেন, কারণ, তিনি বেশ জান্‌তেন যে, স্বপ্নে তাঁর কল্পনার উপর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করে' গেছে সেই নিকষে পরীক্ষা করে' নিলে, এঁর যথার্থ হীনতা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়্‌বে; লাভের মধ্যে সত্য তাঁর মন থেকে মায়ার রচিত চিত্র মুছে ফেলে তাঁকে এক অপূর্ব্ব আনন্দ থেকে বঞ্চিত ক'র্‌বে। এই সব কারণেই পুরাতন গ্রীকজাতি স্বপ্ন যাতে মধুর এবং প্রীতিকর হয় তার নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন ক'র্‌ত বলে', তারা তোমাদের উপহাসের পাত্র নয়। মানুষের পক্ষে যা' কিছু সুখভোগ করা সম্ভব, সে সমস্ত লাভ কর্‌বার জন্য তাদের তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক যত্ন পরিশ্রম ছিল, তারা সে বিষয়ে তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক সন্ধানজ্ঞ ছিল। পিথাগোরস্, সুস্বপ্নের ব্যাঘাত করে এবং দুঃস্বপ্ন আনয়ন করে বিশ্বাসে, শিম ভক্ষণ নিষেধ করে' গেছেন বলে' কোন মতেই নিন্দার্হ নন। এবং সেকালে শয্যা অবলম্বন কর্‌বার পূর্ব্বে সুস্বপ্ন কামনায় স্বপ্নদেবতা মার্কারীর উদ্দেশে যে সকল প্রার্থনা ও পূজাবিধি প্রচলিত ছিল, সে সকল কুসংস্কার উক্ত কারণেই মার্জ্জনীয়। জাগ্রত অবস্থায় সুখ নেই জেনেই তারা স্বপ্নে সুখের অনুসন্ধান ক'র্‌ত। এবং আমার বিশ্বাস যে, অনেকাংশে তারা সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হ'ত। অন্যান্য দেবতাদের চেয়ে মার্কারী [illegible] কাজে লেগেছিলেন।

টা। সুখ যদি কেবলমাত্র স্বপ্নেই নিহিত থাকে, অথবা পরম সুখই যদি শুধু স্বপ্নাবস্থাতেই মেলে, তাহ'লে যখন, কি শারীরিক, কি মানসিক, সুখলাভই হ'চ্ছে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন শুধু স্বপ্ন দেখবার জন্যই জীবনধারণে প্রবৃত্ত হ'তে হয়—আমি তা'তে রাজি নই।

বে। যখন তুমি ইহলোকে বেঁচে র'য়েছ এবং স্বেচ্ছায় জীবন গ্রাহ্য করে' নিয়েছ—তখনই তুমি উক্ত ব্যাপারে স্বীকৃত ও প্রবৃত্ত হ'য়েছ। তুমি সুখ বল কাকে ?

টা। আমার সঙ্গে ও জিনিষের এতটা সাক্ষাৎ পরিচয় নেই যে, ভাল করে' তার বর্ণনা করতে পারি।

বে। পৃথিবীতে সুখ কেউ অনুভবের প্রসাদে জানে না, সকলেই অনুমানের দ্বারা। কারণ, সুখ পদার্থ কাল্পনিক, যথার্থ নয়। ওটা একটা স্পৃহামাত্র, বস্তু নয়। একটি বাসনামাত্র, যা' চিন্তার দ্বারা ধারণা করা যায়, কিন্তু হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না। অথবা ঠিক বাসনাও নয়, একটি ভাবমাত্র। আচ্ছা, এটা কি কখন আবিষ্কার কর নি যে, তোমরা যে সুখের অবস্থা, সমস্ত হৃদয় মনের আরাধনা, নিয়ত চেষ্টা, বর্ণনাতীত ক্লেশ স্বীকারের ফলস্বরূপ লাভ কর, যখন তা' তোমাদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত তখন তাতেই সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ না করে' মনে মনে তার চেয়েও অধিক সুখের প্রতীক্ষা কর। আর এইরূপে যথার্থ সুখের মুহূর্ত্তগুলি চিরদিনই ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে মজুত রাখ। অবশেষে যে মুহূর্ত্তগুলিতে সুখী হ'তে পারতে, সেগুলি যে মুহূর্ত্তগুলিতে সুখী হবে আশা কর, তাদেরই শ্রেণীভুক্ত করে' দাও। তারা তোমাদের অন্তরে শুধু সময়ান্তরে সুখী হবার অন্ধ আশা সৃজন করে' রেখে যায়। নিজের মনকে সুখ ভোগ করেছি বলে' প্রবোধ

দেবারও সুবিধে হয় এবং অপর লোকের কাছে নিজের সৌভাগ্যের ইতিবৃত্ত প্রকাশ কর্‌বারও অবসর পাওয়া যায়—অন্যের অপেক্ষা নিজের অদৃষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কর্‌বার লোভে শুধু নয়, নিজের যা' বিশ্বাস কর্‌বার সাধ আছে অন্যের মনে সে বিশ্বাস উৎপাদন করে' দিতে পারায়ও একটা সন্তোষ আছে। সুতরাং ইহজীবন যেই কেন গ্রাহ্য করে' নিন না—আসলে স্বপ্ন দেখা ব্যতীত তার আর কোনও উৎকৃষ্টতর ব্যবহার কর্‌তে পারেন না। হয় সুখী ছিলুম, নয় সুখী হব, এরূপ বিশ্বাস শুধু মায়ার প্রবঞ্চনা।

টা। আমি বর্ত্তমানে সুখ ভোগ ক'চ্ছি, এরূপ বিশ্বাস কি কারও মনে জন্মান একেবারে অসম্ভব?

বে। যে ওরকম ভাবতে পারে সে বাস্তবিকই সুখী। কিন্তু এই প্রশ্নটির উত্তর কর দেখি। জীবনের কোনও মুহূর্ত্তে তুমি নিজেকে খুব সুখী ভেবেছ বলে' কি তোমার মনে পড়ে? চিরকালই অন্তরের সহিত বলে' আসছ এবং আজও ব'লছ "সুখী হব"। কখন কখন এ কথাও বলে' থাক যে, সুখী ছিলুম—কিন্তু সে বিষয় একটু সংশয় বরাবর থাকে। এর থেকেই প্রমাণ হ'চ্ছে যে, সুখের বসতি, হয় অতীতে, না হয় অনাগতে, বর্ত্তমানে নয়।

টা। তার অর্থ সুখ নামক পদার্থের অস্তিত্ব নেই।

বে। তাই বটে।

টা। স্বপ্নেও নয়?

বে। যথার্থ কথা ব'ল্‌তে গেলে স্বপ্নেও নয়।

টা। কিন্তু জীবনের শুধু মুখ্য নয়, কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য এবং অর্থ হ'চ্ছে সুখলাভ। যে উপায়েই উক্ত পদার্থ সংগ্রহ করা থাক্ না কেন।

বে। মানলুম।

টা। তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে, জীবনের লক্ষ্য মানবের আর-ত্তের বহির্ভূত বলে' মানবজীবন চিরদিনই অসম্পূর্ণ। জীবিত অবস্থার অর্থ,—একটা বিকৃত যন্ত্রণাময় অবস্থা।

বে। কাজেই।

টা। "কাজেই" যে কেন, তা' আমি ভাল বুঝতে পাচ্ছিনে। তাহ'লে আমরা বেঁচে থাকি কেন? জীবনের ভার বহন ক'রতে কেন স্বীকৃত হই?

বে। আমি তার কি জানি? তোমরা মানুষ, তোমরা এর কারণ আমার চেয়ে ভাল জান।

টা। আমার নিজের মত যদি জিজ্ঞাসা কর ত শপথ করে' ব'লতে পারি যে, আমি ত তার কোনও কারণ খুঁজে পাইনে।

বে। তোমাদের ভিতর যে সব মহা মহা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক আছেন তাঁদের প্রশ্ন ক'রলে তাঁরা হয় ত তোমার এ সমস্যার একটা মীমাংসা করে' দিতে পারেন।

টা। সে পরে করা যাবে। কিন্তু এটি নিঃসন্দেহ যে, আমার এ জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ। অন্যান্য দুঃখকষ্টের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু মনের অবসাদে আমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর করে' দিচ্ছে।

বে। মনের অবসাদ জিনিষটি কি?

টা। এ বিষয়ে আমার এতটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে, তোমার প্রশ্নের বেশ ভালরকম উত্তর দিতে পারব বলে' আমার বিশ্বাস।

আমার বিবেচনায় অবসাদের সহিত বায়ুর একটা প্রকৃতিগত ঐক্য আছে। যেমন বায়ু বাহ্যজগতের সমস্ত অবকাশে

এবং বস্তুর অভ্যন্তরীণ প্রতি ছিদ্র পূর্ণ করে' অবস্থিতি করে, এবং কোন স্থান হ'তে একটি বস্তু দূরীভূত হ'লে, সেই শূন্য স্থান অধিকার করে' নেয়—তেমনি অন্তর্জগতের যে সকল অংশে সুখ এবং দুঃখ দুই অনুপস্থিত, অবসাদ সে প্রদেশ অধিকার করে' নেয়। এবং গ্রীক দার্শনিকদের মতে জড়জগতে যেমন শূন্য অবিদ্যমান, তেমনি মনজগতেরও কচিৎ কদাচিৎ চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থা ছেড়ে দিলে শূন্যাবস্থা নেই। অন্য সর্ব্বদাই, আত্মা দেহবদ্ধই হ'ক্, কি দেহমুক্তই হ'ক্, একটা-না-একটা মনোবৃত্তি অবলম্বন করে' থাকে। তাই সুখদুঃখও যেমন এও ঠিক তদ্রূপ—একটা মানসিক রাগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বে। তোমার সুখসকল সূতাতন্তুর মত অতিসূক্ষ্ম, অতিক্ষীণ, স্বচ্ছ; তাই বায়ু যেমন উর্ণনাভজালের ভিতর সম্যক অনুপ্রবেশ করে, তেমনি তোমার অবসাদ তোমার সুখেরও স্তরে স্তরে প্রবেশ করে' তার প্রতি ক্ষুদ্র রন্ধ্রটুকু বুজিয়ে রাখে। সত্যি কথা ব'ল্‌তে গেলে আমি কিন্তু অবসাদ অর্থে বুঝি অমিশ্র সুখাকাঙ্ক্ষা—চরিতার্থতার দ্বারা অতৃপ্ত এবং কষ্টের পীড়নে অক্ষুণ্ণ। পূর্ব্বেই বলেছি যে, আকাঙ্ক্ষারও কোন কালে নিবৃত্তি নেই এবং এ বিশ্বে সুখও চিরদিনই দুর্লভ। সুতরাং মানবজীবন দুঃখ এবং অবসাদে মিশিয়ে গঠিত এবং নির্ম্মিত। এর একটির হস্ত হ'তে নিস্তার পেতে হ'লে অন্যটির শরণাগত হ'তে হয়। শুধু তোমার বলে' নয়, জগৎশুদ্ধ মানবের অদৃষ্টের এই একই লিখন।

টা। এ অবসাদরূপ রোগের ঔষধ কি?

বে। নিদ্রা, অহিফেন এবং ঐকান্তিক দুঃখ। শেষোক্তটিই সর্ব্বে[illegible] [illegible]কৃষ্ট, [illegible] [illegible] যখন [illegible] থাকে, তখন [illegible]

[illegible]রি অবসর পাওয়া যা[illegible]

টা। অমন ঔষধের পরিবর্ত্তে চিরদিন স্বেচ্ছায় এ ব্যাধি নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাক্‌ব। কিন্তু নানারূপ কর্ম্মের বিবিধ বৃত্তি অনুসরণে, নানা চিন্তায় ব্যাপৃত থাকলে, যদিচ লোকে অবসাদের হাত থেকে মুক্তি পায় না, তবুও তার অনেকটা উপশম ও লাঘব হয়। আর, আমি এই কারারুদ্ধ অবস্থায়, মানুষের সংসর্গ বিরহিত হ'য়ে, এমন কি, লেখ্‌বার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে অবহিত কর্ণে ঘড়ির টক্‌টক্‌ শুনে, ছাদের কড়ি বরগা, ছিদ্রসকল এবং তত্রস্থ কীটসকলের সংখ্যা নির্ণয় করে', গৃহতলের প্রস্তর পর্য্যবেক্ষণ করে', না হয় ঘরের ভিতর যে দু'টি একটি প্রজাপতি মক্ষিকা দেখা দেয়, একদৃষ্টে তাদেরই আনাগোনা নিরীক্ষণ করে' একই ভাবে দিন কাটাচ্ছি। আমার এমন কোনও অবলম্বন কিম্বা উপায় নেই যার সাহায্যে এই অবসাদের গুরুভার লঘু ক'র্‌তে পারি।

বে। কত দিন হ'তে এ ভাবে দিন কাটাচ্ছ?

টা। বহু সপ্তাহ ধরে'। তুমি ত সবই জান।

বে। সেই প্রথম দিন থেকে এই আজ পর্য্যন্ত তোমার এই একঘেয়ে জীবনে একটুও কি বিচিত্রতা আসে নি?

টা। না, প্রথম প্রথম এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী অসহ্য বোধ হ'ত। কারণ, ক্রমে ক্রমে আমার মনের অন্য অবলম্বন না থাকায় নিজের সঙ্গেই তার বাক্যালাপ করাটা অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছে—এখন তাতেই তার কতকটা আমোদ হয়। নিজের সঙ্গে কথোপকথন করা রূপ গুণটি একবার অভ্যস্ত হ'য়ে যাবার পর এখন এমনি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সময়ে সময়ে আমার মনে হয় যেন আমার মস্তিষ্কের ভিতর একটা সভা ব'সেছে, আর সকলে মিলে একত্রে তর্ক বিতর্ক ক'চ্ছে। যতই কেন তুচ্ছ হ'ক্‌ না, একটা

প্রসঙ্গ উপস্থিত হ'লেই তাই নিয়ে আমার মন আমার কাছে মহা বক্তৃতা যুড়ে দেয়।

বে। আশা করি,এইরূপ মনোভাব সময়ে তোমার প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হবে ও এমনি বৃদ্ধি পাবে যে, আবার যদি তুমি জনসমাজে ফিরে যাও, তাহ'লে পাঁচজনের সম্মুখে তুমি সঙ্গীহীন অবস্থার চেয়েও বেশি ফাঁকা-ফাঁকা অনুভব কর্‌বে। মনের এইরকম অবস্থাতেই উত্তীর্ণ হওয়াতেই জীবনের যথার্থ পরিণতি। ভেবো না যে এই রকম সফলতা তোমাদের মত দু'চার জনের,চিন্তা করা যাদের চিরাভ্যস্ত,তাদেরই সৌভাগ্যে ঘটে। শীঘ্র হ'ক্ বিলম্বে হ'ক্, একদিন সকলেই এই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হন। মানবসমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার, অর্থাৎ এক রকম জীবন থেকে দূরে থাকার, এই এক মহালাভ যে, সকলেরই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে চোখ ফোটে, মায়ার মোহ ভেঙ্গে যায়; তাই আবার দূর থেকে তারা জীবনকে কল্পনার চোখে দেখতে শেখে, পৃথিবী আবার তাদের কাছে সুন্দর ও মহৎ বলে প্রতীয়মান হয়, সেখানকার যথার্থ বেদনা ও অসারতার কথা বিস্মৃত হ'য়ে লোকে নিজের মনোমত করে' কাল্পনিক পৃথিবী নির্ম্মাণ করে; একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করে ব'ল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আবার তাদের পৃথিবীর প্রতি অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা, শ্রদ্ধা ফিরে আসে এবং সেই সঙ্গে আশা। যদি তখন আবার মানুষের সহিত মেলামেশা ক্ষমতার বহির্ভূত না হয়, তাহ'লে তারা প্রথমবয়সের অনুরূপ মানুষের সহবাসে আমোদ ও আনন্দ অনুভব করে। নির্জ্জনবাস আবার যেন যৌবন এনে দেয়, প্রাণে নূতন শক্তির সঞ্চার হয়—কল্পনা আবার নূতন কাজ পায় এবং প্রবীণ হৃদয় হতে সংসারের নিদারুণ নীরস শিক্ষার ফল খসে' পড়ে' আবার তার শ্যামল তরুণতা বিকাশ পায়। আমি

এখন তবে চল্লুম—তোমার দেখ্ছি ঘুম পেয়েছে। আর তা'ছাড়া তোমাকে যে স্বপ্ন পাঠাব প্রতিশ্রুত হয়েছি তার জন্যও আয়োজন ক'র্তে হবে। এইরূপে স্বপ্নে ও কল্পনায় জীবন অতিবাহিত করে' দাও। মানবলীলার চরম উদ্দেশ্য হ'চ্চে কোন প্রকারে তা' সমাধা করা। জীবনের এই হ'চ্চে একমাত্র লক্ষ্য যা' আমাদের হাতের বাইরে নয়—সুতরাং প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই একএক-বার এই উদ্দেশ্যটির কথা মনে কর। এই উপায়ে জীবনটাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে—যতক্ষণ না সেই চরম সুখের দিন আসে যখন জীবনকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌বে। তোমার এই কারাগারের ভিতর দিন যতটা দীর্ঘ বলে' মনে হয়—যিনি তো-মাকে এখানে বদ্ধ করে রেখেছেন তাঁর প্রাসাদ ও বিলাসকাননেও দিন এর চেয়ে কিছু বেশী শীঘ্র কাটে না। আজ তবে প্রণাম হই।

টা। প্রণাম। কিন্তু শোনো। তোমার কথাবার্ত্তায় যদিচ আমার বিষাদ ঘুচিয়ে না দিক্ ইহাতে তবুও মনে অনেকটা শান্তি আনয়ন করে। অধিকাংশ সময় আমার মন চন্দ্রহীন নক্ষত্রহীন চিররাত্রির অন্ধকারে আবৃত থাকে, কিন্তু যতক্ষণ তোমার সহবাসে থাকি ততক্ষণ সেই রাত্রির অন্ধকার গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে পরিণত হয়। তুমি কোথায় থাক আমাকে অনুগ্রহ করে' যদি বলে' যাও তাহ'লে আমি যখন মন চাবে তোমাকে ডেকে আন্‌ব।

বে। আমার বসতি কোথায় তা আজও জান না? তীব্র মদিরার অভ্যন্তরে।

সারসংগ্রহ।

আকবরের স্বপ্ন।

কাশ্মীরের কোনও মন্দিরের জন্য রচিত আবুল ফজলের একটি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে :—

হে ঈশ্বর, প্রত্যেক মন্দিরেই আমি সেই সাধুগণের দর্শন লাভ করি যাঁহারা তোমাকে দর্শন করেন, এবং যত ভাষা আমার শ্রুতিগোচর হয় সকল ভাষাতেই ভক্তগণ তোমারই যশোগান করিয়া থাকেন।

বহুদেববাদ এবং ইস্‌লাম তোমাকেই অনুভব করিতে ব্যাকুল।

সকল ধর্ম্মই বলে, তুমি এক এবং অদ্বিতীয়।

মস্‌জিদে ভক্তগণ তোমারই পুণ্য নমাজ উচ্চারণ করেন, এবং খৃষ্টান ভজনালয়ে তোমার প্রতি প্রেম হইতেই মধুর ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হয়।

আমি কখনও বা খৃষ্টানদিগের গির্জায় যাই, কখনও বা মস্‌জিদে বিচরণ করি।

কিন্তু মন্দির হইতে মন্দিরে আমি কেবল তোমার সন্ধান করিয়াই ফিরি।

তোমার অন্তরঙ্গেরা নব্য ধর্ম্ম বা পিতৃধর্ম্ম লইয়া কালক্ষয় করেন না; কারণ, তোমার সত্যের পশ্চাতে উভয়ের কোনটিই স্থান পায় না।

নব্যপন্থীর জন্য নব্য মত আছে এবং প্রাচীনপন্থীর জন্য পিতৃধর্ম্ম আছে; কিন্তু গোলাপপুষ্পের রেণু সে কেবল গন্ধব্যবসায়ীর হৃদয়ের ধন।

এই প্রস্তরলিপি অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন "আকবরের স্বপ্ন" নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্প্রতি উক্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

আবুল ফজল আকবরের প্রিয় সুহৃৎ ও প্রধান সভাসদ। অবসর পাইলেই দুই জনে বিজনে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। দুই জনের হৃদয় এক ছিল, ধর্ম্ম এক ছিল, লক্ষ্য এক ছিল এবং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনেই উভয়ে দেহপাত করিয়াছেন। সম্রাটের প্রিয় বলিয়া গোঁড়া মৌলবীরা আবুল ফজলের প্রতি অত্যন্ত

বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, এই হতভাগ্য সভাসদ্ মৌলবীদিগের সনাতন পদমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সম্রাট্‌কে নিরন্তর বিপথে লইয়া যাইতেছে। ফতেপুর-শিকরীর ইবাদতখানায় প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া বাদ্‌শাহের সম্মুখে ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন; পণ্ডিতে পণ্ডিতে তুমুল তর্কবিতর্ক হইত; পরাস্ত হইলে মৌলবীরা আবুল ফজলকে অভিশাপ দিতেন এবং সুবিধামত সেলিমের হৃদয়ে পিতৃদ্রোহ উদ্রেক করিয়া দিতে ত্রুটি করিতেন না।

এই সঙ্কীর্ণ স্বদেশীয় পাণ্ডিত্যের জ্বালায় আবুল ফজল অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। অজ্ঞ গোঁড়ামির দম্ভ তাঁহার যেমন অসহ্য বোধ হইত, এখানে তেমনি তাহারই মহাধিপত্য। তিনি নিজ-মুখেই বলিয়াছেন যে, মঙ্গোলিয়ার জ্ঞানীগণ কিম্বা লেবাননের সাধুদিগের দর্শনলাভের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তিব্বতের লামা কিম্বা পর্ত্তুগালের পাদ্রীর সাক্ষাৎ পাইলে তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিতেন,এবং জেন্দাবেস্তা পণ্ডিতগণের সহিত একত্র বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ বোধ হইত; কিন্তু এই স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রসঙ্গ শুনিলে তাঁহার গায়ে জ্বর আসিত।

আবুল ফজলকে বুঝিয়াছিলেন কেবল আকবর, এবং আক-বরকে যদি কেহ সম্পূর্ণ বুঝিয়া থাকেন ত পণ্ডিত আবুল ফজল। কবি টেনিসন দুই মহৎ হৃদয়ের এই নিভৃত সমবেদনাটুকু দিয়াই তাঁহার "আকবরের স্বপ্ন" রচনা করিয়াছেন।

দৃশ্য ফতেপুর-শিকরী। রাত্রিকাল। প্রাসাদসম্মুখে বিষণ্ণ-মুখ সম্রাট্ আকবর, পার্শ্বে বিশ্বস্ত মন্ত্রী আবুল ফজল। ফজল জিজ্ঞাসা করিলেন "হে পৃথিবীপতি, আজ আপনাকে এত বিষণ্ণ

দেখিতেছি কেন ?” আকবর একবার দূর নক্ষত্রালোকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আবুল ফজলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “ঠিক বুঝিয়াছ ফজল, যে দারুণ দুঃস্বপ্ন আমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে মুখে তাহারই কাল ছায়া। জানি স্বপ্ন শুধু বিম্বের মত ক্ষণিক বিড়ম্বনা, কিন্তু তবু প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর এ স্বপ্ন যেন সত্য না হয়। প্রার্থনা এবং সাধনা—জীবনে প্রার্থনার অবিচলিত অনুসরণ—ইহাই উপাসনা। যে প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম না থাকে, মৃতবৎসা প্রসূতির ন্যায় ঈশ্বরের চক্ষে তাহা নিষ্ফল। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্বপ্ন যাহাই বলুক্, আমি ন্যায়াচরণ করিতে বিরত থাকিব না—যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এই বাহু শাণিত অসি ধরিয়া বিপুল সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে, বিজয়লব্ধ বসুন্ধরায় অক্ষয় শান্তি স্থাপন করিয়া সে সেই উদ্দেশ্য সফল করিবে। ঈশ্বর সহায় হউন্!

“আর তুমি যতক্ষণ আমার সহিত একহৃদয়, আমি এখানেও একক নহি; এবং এমন ভরসা রাখি যে, কেবল রাজমুকুট রচনা না করিয়া তোমার সাহায্যে এমন একটি সুন্দর মুকুট রচনা করিতে পারিব যাহা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, পারসী, সকলেরই শিরোভূষণ হইবে।

“কিন্তু হায়, ঈশ্বরের প্রেমের অক্ষর কেহ বুঝে না। অজ্ঞ নর না তাঁহাকে বুঝে, না আপনাকে জানে। সকলেই সম্প্রদায় বাঁধিয়া চীৎকার করে, ‘আমিই একমাত্র সত্যের পথ পাইয়াছি, আর সকলেই জাহান্নমে চলিয়াছে।’

“গোলাপ তবে পদ্মকে ডাকিয়া বলুক, ‘তুমি ফুল নহ—ফুল একমাত্র আমি।’ মাধবী তরুলতাকে বলুক্, ‘আমিই সুন্দর—তুমি বিড়ম্বনা।’ আম্র অন্য ফলকে বলুক্, ‘পরমেশ্বর আমা-

কেই মানবের ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—তোমরা কে হে বাপু?' প্রত্যেক তারা বলিতে থাকুক্, 'স্বর্গে আমিই একা।'

"পিঞ্জর যতই সঙ্কীর্ণ হয় গোঁড়ামির গর্জ্জন ততই গুরুতর। আমাদের পণ্ডিতেরা তাই পালঙ্কে শয্যা রচনা করিয়া অহর্নিশি অন্যের নরক-যন্ত্রণাই দেখিতে পান। যত বলি ঈশ্বরের রাজ্যে অশুচি কেহ নাই, ভ্রূকুটিকুটিলমুখ ততই আমার প্রতি তীব্র অভিসম্পাত বর্ষণ করে। সিংহাসনতলে বসিয়া পাণ্ডিত্য আস্ফালন করিয়া মরে, আমি দেখি যেখানে জল অল্প সেইখানেই তোড় প্রবল। মহাসমুদ্রের গম্ভীর উচ্ছ্বাস এখানে শুনা যায় না।

"যখন মনে করি, এই দিল্লীর সিংহাসন পরধর্ম্মের উচ্ছেদমানসে বলপ্রয়োগ করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিতে লজ্জাবোধ করে নাই, তখন লজ্জায় আমার শির নত হইয়া পড়ে। কাফের শব্দই আমার কর্ণে বজ্রধ্বনি। যে যেরূপ বুঝে আপন আপন ধর্ম্ম পালন করুক্। আমি বিধর্ম্মকে রাজস্ববৃদ্ধির কারণ করিতে চাহি না। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—সেই প্রেমস্বরূপের মঙ্গল-ইচ্ছা সম্পাদনই আমার জীবনের কার্য্য। ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান লইয়া বিবাদ করা বালকেরই শোভা পায়। বাহ্যানুষ্ঠান ত বেশভূষার মত। কেহ বা ঢিলা কাপড় পরে, কেহ বা আঁটসাঁট ভালবাসে। প্রেমেই আমি মানবে মানবে একতা সম্পাদন করিতে চাহি।

"স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া আমি যেন সেই প্রেমের মিলন-মন্দির গঠন করিয়া তুলিয়াছি। সেখানে সত্য এবং প্রেম এবং ন্যায় এবং শান্তি বিরাজ করিতেছে।

"কিন্তু এ কি! আমারই প্রাণের পুত্র সেলিম একটির পর একটি করিয়া পিতৃমন্দিরের সমস্ত পাষাণ খসাইয়া ফেলিতেছে।

যেন শুনিতে পাইতেছি, সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে সহস্র কাতর ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইয়া মর্ম্মভেদী স্বরে বিলাপ করিতেছে।

"হায় মন্ত্রি, এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার চিত্ত বড় অধীর।—কিন্তু এই দুঃস্বপ্নের শেষে একটু যেন আশার আভাস ছিল। দেখিলাম, দূর হইতে কোন্ এক অপরিচিত জাতি আসিয়া আমার সেই জীর্ণ-মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিল এবং যে কার্য্য আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই ধীরে ধীরে তাহা সুসম্পন্ন করিল।

"পরমেশ্বর ধন্য—তিনি কাহার দ্বারা কি উদ্দেশ্যসাধন করেন কে জানে!"

দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া আসিল। আকবর ও আবুল ফজল পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব প্রাসাদে গমন করিলেন। টেনিসনের কাব্য সমাপ্ত হইল।

ঝুটা শিক্ষা।

"নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী"র বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম সংখ্যায় অধ্যাপক মাফি শিক্ষা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটী চিন্তাশীলতার পরিচায়ক ও সারগর্ভ। ইতরসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার অভিপ্রায়ে এক্ষণে যে প্রণালীর আশ্রয় লওয়া হইয়াছে এবং তাহার আনুষঙ্গিক প্রতিযোগী পরীক্ষা লেখকের মতে ঝুটা শিক্ষা। আর যে প্রণালীতে পুরাতন বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবর্গ শিক্ষিত হইত তাহা আসল শিক্ষা। লেখক বলিতেছেন যে, প্রতিযোগিতা বা পরীক্ষা, যথার্থতঃ বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত নহে। শিক্ষার প্রধান প্রধান বিষয় কয়েকটী বহুশিক্ষার্থীকে একত্রে নৈতিক বন্ধনে ও সমান আচারে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া এবং সমাচারী সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের চরিত্রের উপর যে সকল শক্তি স্বতঃসঞ্চারিত হইয়া অতর্কিত ভাবে উৎকর্ষ সাধন করে, সেই সকল শক্তিসঞ্চারের অবসর দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য।

এক্ষণে গ্রেটবৃটন্ ও আয়ার্লণ্ডে একটী সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভূত হইয়া দেশময় নিজের জাল বিস্তার করিতেছে। তাহার সংঘর্ষে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রণালী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। তথায় লেখকের মতে সেই বুনিয়াদা দমিততেজ প্রণালী এখনও আধুনিক প্রণালী হইতে উৎকৃষ্ট।

নূতন শিক্ষাপ্রণালী লেখকের মতে একরকম ত্রিশিরা রাক্ষস। জবরদস্তি শিক্ষা, শস্তা শিক্ষা ও প্রতিযোগী পরীক্ষা রাক্ষসের তিনটি মাথা। বিলাতে পিতামাতা ছেলেমেয়েকে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে না পাঠাইলে দণ্ডিত হয়েন। এই সকল বিদ্যালয়ে অতি সামান্যরূপে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য লেখা-পড়া শিখান হয়। তাহার পর ছাত্রগণ পুরস্কার, ছাত্রবৃত্তি প্রভৃ-তির প্রলোভনে মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হয়। পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়-নামধারী পরীক্ষাকারী ও উপাধিদাতা যন্ত্রে ছাত্রবর্গ নিষ্পিষ্ট হয়। উপাধি পাইবার জন্য ও সরকারী চাকরীর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে প্রবেশের জন্য পরিমিত সংখ্যক নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থে প্রতিযোগী পরীক্ষার শাসন মানিতে হয়।

পুরাণে ত্রিশিরা রাক্ষস এক মুখে বেদ গান করিত। কিন্তু এই অভিনব ত্রিশিরার তিনটি মস্তকই গ্রাসেচ্ছু। যদি পিতা-মাতাকে ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য জোরজবরদস্তি করিতে হয়

ভবে, সম্ভ্রান্ত, সঙ্গতিপন্ন পিতামাতার প্রতিই করা কর্ত্তব্য। যাহাদের পেটে ভাত নাই, গায়ে কাপড় নাই—যাহাদের নিকট ছোট ছোট দু'খানি হাতেরও দাম আছে, তাহাদিগকে সুদিন দুর্দ্দিনে পাঠশালায় ছেলেমেয়ে পাঠাইতে বাধ্য করা একটা ঘোর অত্যাচার। আর লেখক বলেন যে, আয়ার্লণ্ডে শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই আইনের দ্বারা শাসিত হয়, ভদ্রলোকেরা আইনের আমলে আসেন না।

শস্তা শিক্ষার দোষ এই যে, দু'চার জন প্রতিভাশালী লোক যাঁহারা সকলপ্রকার বাধাবিপত্তি ডিঙ্গাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাঁহারাই বর্ত্তমান নিয়মেও কৃতকার্য্য হ'ন। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ হইয়া অসন্তোষে কালযাপন করে। নিজের পৈতৃক অবস্থা ইহাঁদের ভাল লাগে না ও উন্নততর অবস্থালাভে ইহাঁরা কৃতকার্য্য হ'ন না। ঈশ্বর গুপ্তের কথাটা বিলাতেও অনেক অংশে সপ্রমাণ হইয়াছে :—

"যত গোপ গোয়ালা
সদরওয়ালা,
—কে বেচ্‌বে গো ঘোল ?"

প্রতিযোগী পরীক্ষার টক্করা-টক্করিতে প্রধানতঃ তিনটি দোষ দেখা যায়। প্রথম অপরিণত বয়সে গুরুভারের চাপনে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি। দ্বিতীয়, কেবল পরীক্ষায় সফল হইবার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে হয় বলিয়া শিক্ষকগণ ছাত্রের চরিত্রগঠনের প্রতি নিতান্ত উদাসীন হইয়া পড়েন। এবং তৃতীয়, এইরূপ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লইয়া ছাত্রগণ শ্রদ্ধা, বিনয় প্রভৃতি চরিত্রের উৎকৃষ্ট গুণসকল হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবন্ধটী পড়িলে আপনা হইতেই এদেশের সম্বন্ধে কথাগুলি কতদূর খাটে, বিচার করিবার ইচ্ছা হয়। এদেশে যে শিক্ষা ভিন্ন অন্য শিক্ষা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহা লেখকের বর্ণিত ঝুটা শিক্ষার প্রতিরূপ। আমরা যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "শিক্ষিত সমাজ" ও তাহার অনুযোগী শব্দ ব্যবহার করি, তাহারা এই ঝুটা শিক্ষার আধার। আমাদের দেশে এখনও জবরদস্তি শিক্ষা প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু শস্তা শিক্ষা ও প্রতিযোগী পরীক্ষাসম্ভূত শিক্ষাই এদেশের শিক্ষা। প্রস্তাবিত প্রবন্ধটি পড়িয়া হঠাৎ আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষিত লোকের প্রতি আস্থা ভঙ্গ হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগকে অন্যরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। প্রথমতঃ দেখিতে হয় যে, এই ঝুটা শিক্ষা প্রচার হইবার পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে কিরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল। এবিষয় বর্ণনা করিতে হইলে আয়ার্লণ্ডদেশ-বৃত্তান্তের সর্পবিষয়ক বিখ্যাত অধ্যায়টি মনে পড়ে। উক্ত অধ্যায়টি এই—

"আয়ারলণ্ডে সর্প নাই।"

টোল ও পাঠশালার শিক্ষার অন্ধকার রজনীর পর সেকেলে ইংরাজি শিক্ষার প্রাতঃসন্ধ্যা, তদনন্তর ঝুটা শিক্ষার সূর্য্যোদয়। টোলে যা' শিক্ষা হইত তাহার কতকটা নিদর্শন, প্রচলিত গল্প, যাহার নায়ক টোলভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ, তাহাতে উজ্জলবর্ণে চিত্রিত আছে। "তৈলের আধার পাত্র, কি, পাত্রের আধার তৈল," ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা। সাধনায় প্রকাশিত "গম্যমানগতাগত,"-এ সমস্যা পূরণও এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত হইতে পারে। "ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকি"ও সর্ব্বজনবিদিত। গম্ভীর ভাবে দেখিলে বলিতে হয় যে, স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বড়লোকের মনযোগানে অল্প-

প্রসর ব্যবস্থা উদ্ধার করা ও প্রয়োগাবসরশূন্য ন্যায়দর্শনের শুষ্ক বিধির চর্চ্চা করাই টোলের সর্ব্বস্ব ছিল; আর যাহা ছিল তাহা ব্যাকরণ। "অস্তি" এই ক্রিয়া রূপের "অস্" ধাতুর কতটা অর্থ ও "তি" বিভক্তির কতটা অর্থ, ইহার অনুসন্ধানে বৎসর দুই তিন ক্ষেপণ করা—এইরূপ শিক্ষাই টোলের শিক্ষা। * তাহার পর সেকেলে ইংরাজি শিক্ষা। সেকেলে ও একেলে ইংরাজি শিক্ষার মধ্যে তুলনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সচরাচর এই দুই প্রণালীর শিক্ষার মধ্যে তুলনার অর্থ, এই দুই প্রণালীতে শিক্ষিত লোকের মধ্যে তুলনা। এইরূপ তুলনা উদ্দেশ্যহীন। প্রথমতঃ সেকালে সাধারণ হইতে উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিমান ছাত্রগণই ইংরাজি শিক্ষায় নিয়োজিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করা হয়, তাহাদের বয়সের পার্থক্য এত অধিক যে, একদিক দিয়া দেখিলে তুলনা চলেই না। যাহা হউক, ওরূপ তুলনা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজনীয়। ইহা ঠিক যে, ইংরাজি শিক্ষা ভিন্ন অন্য শিক্ষা এদেশে নাই, হইতেও পারে না। তবে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে অনেক দোষও আছে, তাহা বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। শস্তায় বেসরকারী কালেজ ও জীবিত ভাষায় ব্যাকরণ শিক্ষাই ভাষাশিক্ষা, বহু বিষয়ে উপর-উপর শিক্ষা এ সকল প্রকৃত শিক্ষার বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই।

তবে আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, নৈতিক উন্নতি, ধর্ম্মগত উন্নতি, রাজনৈতিক উন্নতি, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি, সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার, ইংরাজি শিক্ষা হইতেই হইয়াছে।

---

* ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য রামমোহন রায় লাট আমহার্ষ্টকে যে আবেদন করেন তাহা হইতে এবিষয়ে অনেক কথা পাওয়া যাইবে।

ডায়ারী।

স্রোতস্বিনী প্রাতঃকালে আমার বৃহৎ খাতাটি হাতে করিয়া আনিয়া কহিল—এ সব তুমি কি লিখিয়াছ? আমি যে সকল কথা কাস্মিনকালে বলি নাই তুমি আমার মুখে কেন বসাইয়াছ?

আমি কহিলাম, তাহাতে দোষ কি হইয়াছে?

স্রোতস্বিনী কহিল—এমন করিয়া আমি কখনও কথা কহি না এবং কহিতে পারি না। যদি তুমি আমার মুখে এমন কথা দিতে, যাহা আমি বলি বা না বলি আমার পক্ষে বলা সম্ভব, তাহা হইলে আমি এমন লজ্জিত হইতাম না। কিন্তু এ যেন তুমি একখানা বই লিখিয়া আমার নামে চালাইতেছ।

আমি কহিলাম—তুমি আমাদের কাছে কতটা বলিয়াছ তাহা তুমি কি করিয়া বুঝিবে? তুমি যতটা বল, তাহার সহিত, তোমাকে যতটা জানি দুই মিশিয়া অনেকখানি হইয়া উঠে। তোমার সমস্ত জীবনের দ্বারা তোমার কথাগুলি ভরিয়া উঠে। তোমার সেই অব্যক্ত উহ্য কথাগুলি ত বাদ দিতে পারি না।

স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া রহিল। জানি না, বুঝিল কি না বুঝিল। বোধ হয় বুঝিল, কিন্তু তথাপি আবার কহিলাম—তোমার ঐ দৃষ্টিপাত, তোমার ঐ মূক প্রশ্ন, তোমার ঐ স্নিগ্ধ স্মিতহাস্য, তোমার প্রতিদিনের জীবনের সুন্দর স্বচ্ছ প্রবাহ আমি এই কাগজের খাতার কয়খানি পত্রপুটের মধ্যে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিব? তুমি জীবন্ত বর্ত্তমান, প্রতিক্ষণে নব নব ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছ—তুমি যে আছ, তুমি যে সত্য, তুমি যে সুন্দর, এ বিশ্বাস উদ্রেক করিবার জন্য তোমাকে কোন

চেষ্টাই করিতে হইতেছে না—কিন্তু লেখায় সেই প্রথম সত্যটুকু প্রমাণ করিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন এবং অনেক বাক্য ব্যয় করিতে হয়। তুমি আজ এই স্নিগ্ধ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুভ্রবস্ত্র পরিয়া আর্দ্র কেশজাল পিঠের উপর মেলিয়া দিয়া হাস্যপ্রসন্নমুখে যে দু'টি একটি সামান্য কথা বলিলে, তাহা যদি আমাকে লিখিতে হইত, তবে তোমার ঐ কথা কয়টির সহিত এই প্রাতঃকাল, এই স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ, ঐ কণ্ঠস্বর, ঐ সহজ স্নেহময় প্রফুল্ল মুখভাব, আমার কিয়দংশ তোমার কিয়দংশ, এই বহির্জগতের কিয়দংশ, সবই ত ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া দিতে হইত। নতুবা অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবে কেন? তুমি যে মনে করিতেছ আমি তোমাকে বেশি বলাইয়াছি তাহা ঠিক নহে—আমি তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি—তোমার অনেকগুলি কথা, অনেকগুলি কাজ, অনেকগুলি আকার-ইঙ্গিতের সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে। নহিলে তুমি যে কথাটি আমার কাছে বলিয়াছ ঠিক সেই কথাটি আমি আর কাহারো কর্ণগোচর করাইতে পারিতাম না, লোকে ঢের কম শুনিত এবং ভুল শুনিত।

স্রোতস্বিনী দক্ষিণ পার্শ্বে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া একটা বহি খুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল—তুমি আমাকে স্নেহ কর বলিয়া আমাকে যতখানি দেখ আমি ত বাস্তবিক ততখানি নই।

আমি কহিলাম—আমার কি এত স্নেহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক যতখানি আমি তোমাকে ততখানি দেখিতে পাই? অসীম দেশকালের মাঝখানে তোমার যে মুখখানি এবং হৃদয়খানি এমন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে ইহাতে কি তোমার প্রতি অনন্ত

দেবতার অল্প স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে? একটা প্রবাদ আছে, আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহাকে বাড়াইয়া তুলি—সে কথা ঠিক নহে—আসল কথা, যাহাকে ভাল বাসি না, তাহাকে কমাইয়া দিই। এক একটি মানুষের মধ্যে অনন্ত কালের অনন্ত সম্ভাবনা আছে, ভালবাসিলে তবে তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভব করা যায়। একটি মানুষের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে, ঈশ্বরের মত কাহার স্নেহ!

ক্ষিতি ত একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল—এ আবার তুমি কি কথা তুলিলে? স্রোতস্বিনী তোমাকে এক ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আর একভাবে তাহার উত্তর দিলে।

আমি কহিলাম, জানি। কিন্তু কথাবার্ত্তায় এমন অসংলগ্ন উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে। মন এমন একপ্রকার দাহ্য পদার্থ যে, ঠিক যেখানে প্রশ্নস্ফুলিঙ্গ পড়িল সেখানে কিছু না হইয়া হয় ত দশ হাত দূরে আর এক জায়গায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। নির্ব্বাচিত কমিটিতে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু বৃহৎ উৎসবের স্থলে যে আসে তাহাকেই ডাকিয়া বসানো যায়—আমাদের কথোপকথনসভা সেই উৎসবসভা; সেখানে যদি একটা অসংলগ্ন কথা অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আসুন মশায় বসুন বলিয়া আহ্বান করিয়া হাসামুখে তাহার পরিচয় না লইলে উৎসবের উদারতা দূর হয়।

ক্ষিতি কহিল, ঘাট হইয়াছে, তবে তাই কর, কি বলিতেছিলে বল। ক উচ্চারণমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদ কাঁদিয়া উঠে, তাহার আর বর্ণমালা শেখা হয় না; একটা প্রশ্ন শুনিবামাত্র যদি আর একটা উত্তর তোমার মনে ওঠে তবে ত কোন কথাই এক পা অগ্রসর হয় না। কিন্তু প্রহ্লাদ-জাতীয় লোককে

নিজের খেয়াল অনুসারে চলিতে দেওয়াই ভাল, যাহা মনে আসে বল।

আমি কহিলাম—আমি বলিতেছিলাম, যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য সম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল, সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।

ক্ষিতি মনে মনে ভাবিল—কি সর্ব্বনাশ! আবার তত্ত্বকথা কোথা হইতে আসিয়া পড়িল! স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তিও যে, তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য অতিশয় লালায়িত তাহা নহে—কিন্তু একটা কথা যখন মনের অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ লাফাইয়া ওঠে তখন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শেষ পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া ভাব-শিকারীর একটা চিরাভ্যস্ত কাজ। নিজের কথা নিজে আয়ত্ত করিবার জন্য বকিয়া যাই, লোকে মনে করে আমি অন্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে বসিয়াছি।

আমি কহিলাম—বৈষ্ণবধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার

জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন এই সমস্ত পরমপ্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।

ক্ষিতি কহিল, সীমার মধ্যে অসীম, প্রেমের মধ্যে অনন্ত এ সব কথা যতই বেশি শুনি ততই বেশি দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম মনে হইত যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, এখন দেখিতেছি অনন্ত অসীম প্রভৃতি শব্দগুলা স্তূপাকার হইয়া বুঝিবার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি কহিলাম, ভাষা ভূমির মত। তাহাতে একই শস্য ক্রমাগত বপন করিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। দিনকতক "ভারতমাতা" শব্দটাকে লইয়া সকলে মিলিয়া এত বারবার ব্যবহার করিত যে, অবশেষে তাহাতে আর ভাব উৎপন্নই হইত না। এখন তাহার পরিবর্ত্তে "আর্য্য" শব্দটা লইয়া সকলে পড়িয়াছে—কথাটার মধ্যে যতটুকু সার ছিল এক প্রকার নিঃশেষ হইয়াছে। যথার্থ ভাবুক যখন পুরাতন ভাষায় একটা নূতন ভাব বপন করেন তখন যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, সেই শস্য যেমন একদিকে ভাষা হইতে সমস্ত সার আকর্ষণ করিয়া লয়, তেমনি অন্যদিকে অজস্র পল্লব বর্ষণ করিয়া মাতৃভূমিকে সারাল করিয়া তোলে। কিন্তু তাহার সহস্র অনুকরণকারীরা তেমন প্রাণবান বীজবপন করিতে পারে না, কেবল ভূমিকে কর্ষণ করিয়া শ্রান্ত করে, ভাষাকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়; কতকগুলা শীর্ষহীন, মৃতপ্রায়, শীর্ণ শুষ্ক যষ্টি উদ্গত হয়, তাহারা দেশকে শস্য দেয় না, ভূমিকে সার প্রত্যর্পণ করে না—তাহারা সত্যকে মিথ্যার মত ক্ষীণকায় করিয়া তোলে। "অনন্ত" এবং "অসীম" শব্দটা আজকাল সর্ব্বদা ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য যথার্থ একটা কথা বলিবার না থাকিলে ও দুটা শব্দ ব্যবহার

করা উচিত হয় না। মাতৃভাষার প্রতি একটু দয়ামায়া করা কর্ত্তব্য।

ক্ষিতি কহিল—ভাষার প্রতি তোমার ত যথেষ্ট সদয় আচরণ দেখা যাইতেছে না।

সমীরণ এতক্ষণ আমার খাতাটি পড়িতেছিল, শেষ করিয়া কহিল, এ কি করিয়াছ? তোমার ডায়ারির এই লোকগুলা কি মানুষ না যথার্থই ভূত? ইহারা দেখিতেছি কেবল বড় বড় ভাল ভাল কথাই বলে কিন্তু ইহাদের আকার আয়তন কোথায় গেল?

আমি বিষণ্ণমুখে কহিলাম—কেন বল দেখি?

সমীরণ কহিল—তুমি মনে করিয়াছ, আম্রের অপেক্ষা আমসত্ব ভাল—তাহাতে সমস্ত আঁঠি আঁশ আবরণ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়—কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায়? তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল? আমার বেবাক্ বাজে কথাগুলো তুমি বাজেয়াপ্ত করিয়া যে একটি নিরেট মূর্ত্তি দাঁড় করাইয়াছ তাহাতে দন্তস্ফুট করা দুঃসাধ্য। আমি কেবল দুই চারিটি চিন্তাশীল লোকের কাছে বাহবা পাইতে চাহি না, আমি সাধারণ লোকের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাই।

আমি কহিলাম—সে জন্য কি করিতে হইবে?

সমীরণ কহিল—সে আমি কি জানি! আমি কেবল আপত্তি জানাইয়া রাখিলাম। আমার যেমন সার আছে তেমনি আমার স্বাদ আছে; সারাংশ মানুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে কিন্তু স্বাদ মানুষের নিকট প্রিয়। আমাকে উপলক্ষ করিয়া মানুষ কতকগুলো মত কিম্বা তর্ক আহরন করিবে এমন ইচ্ছা করি না, আমি চাই মানুষ আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে।

এই ভ্রমসঙ্কুল সাধের মানবজন্ম ত্যাগ করিয়া একটা মাসিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বহি নই, আমি তর্কের সুযুক্তি অথবা কুযুক্তি নই, আমার বন্ধুরা, আমার আত্মীয়েরা আমাকে সর্ব্বদা যাহা বলিয়া জানেন, আমি তাহাই।

ব্যোম এতক্ষণ একটা চৌকিতে ঠেসান দিয়া আর একটা চৌকির উপর পা দুটা তুলিয়া অটল প্রশান্তভাবে বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ বলিল—তর্ক বল, তত্ত্ব বল, সমস্যা বল, সিদ্ধান্ত এবং উপসংহারেই তাহাদের চরম গতি, সমাপ্তিতেই তাহাদের প্রধান গৌরব। কিন্তু মানুষ স্বতন্ত্রজাতীয় পদার্থ—অমরতা, অসমাপ্তিই তাহার সর্ব্বপ্রধান যাথার্থ্য। বিশ্রাম-হীন গতিই তাহার প্রধান লক্ষণ। অমরতাকে কে সংক্ষেপ করিবে, গতির সারাংশ কে দিতে পারে? ভাল ভাল পাকা কথাগুলি যদি অতি অনায়াসভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও তবে ভ্রম হয়, তাহার মনের যেন একটা গতিবৃদ্ধি নাই—তাহার যতদূর হইবার শেষ হইয়া গেছে। চেষ্টা ভ্রম অসম্পূর্ণতা পুনরুক্তি যদিও আপাততঃ দারিদ্র্যের মত দেখিতে হয় কিন্তু মানুষের প্রধান ঐশ্বর্য্য তাহার দ্বারাই প্রমাণ হয়। তাহার দ্বারা চিন্তার একটা গতি, একটা জীবন নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মানুষের কথাবার্ত্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রংটুকু, অসমাপ্তির কোমলতা, দুর্ব্বলতাটুকু না রাখিয়া দিলে তাহাকে একেবারে সাঙ্গ করিয়া ছোট করিয়া ফেলা হয়। তাহার অনন্ত পর্ব্বের পালা একেবারে সূচিপত্রেই সারিয়া দেওয়া হয়।

সমীরণ কহিল—মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প—এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গী, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়। কেবল রথ নহে

রথের মধ্যে তাহার গতি সঞ্চারিত করিয়া দিতে হয়; যদি একটা মানুষকে উপস্থিত কর তাহাকে খাড়া দাঁড় করাইয়া কতকগুলি কলে-ছাঁটা কথা কহাইয়া গেলেই হইবে না, তাহাকে চালাইতে হইবে, তাহাকে স্থান পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে, তাহার অত্যন্ত মহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তাহাকে অসমাপ্তভাবেই দেখাইতে হইবে।

আমি কহিলাম, সেইটাই ত কঠিন। কথা শেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে এখনো শেষ হয় নাই, কথার মধ্যে সেই উদ্যত ভঙ্গীটি দেওয়া বিষম ব্যাপার।

স্রোতস্বিনী কহিল—এই জন্যই সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশি, না, বলিবার ভঙ্গীটা বেশি। আমি ঐ কথাটা লইয়া অনেকবার ভাবিয়াছি, ভাল বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয় তর্কের খেয়াল অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তখন সেইটাই প্রধান হইয়া উঠে।

ব্যোম মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল—সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ, না, ভঙ্গীটা শ্রেষ্ঠ ইহা বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোন্‌টা অধিক রহস্যময়। দেহটা শ্রেষ্ঠ, না, জীবনটা শ্রেষ্ঠ ইহার বিচার কেমন করিয়া করিবে? দেহ না থাকিলে জীবন থাকে না, জীবন না থাকিলে দেহ থাকে না, কিন্তু তবু জীবনটাকে যেন শ্রেষ্ঠ মনে হয়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গীটা জীবন। দেহটা বর্ত্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রাখিয়াছে। যতটুকু বিষয়রূপে প্রকাশ করিবে

ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ, যতটুকু ভঙ্গীর দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, তাহাতেই তাহার বুদ্ধিশক্তি তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।

সমীরণ কহিল—সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতি পুরাতন, কেবল আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।

স্রোতস্বিনী কহিল—আমার মনে হয় মানুষের পক্ষেও ঐ একই কথা। এক একজন মানুষ এমন একটি মনের আকৃতি লইয়া প্রকাশ পায় যে, তাহার দিকে চাহিয়া আমরা পুরাতন মনুষ্যত্বের যেন একটা নূতন বিস্তার আবিষ্কার করি।

দীপ্তি কহিল—মনের এবং চরিত্রের সেই আকৃতিটাই আমাদের ষ্টাইল্। সেইটের দ্বারাই আমরা পরস্পরের নিকট প্রচলিত পরিচিত পরীক্ষিত হইতেছি। আমি একএকবার ভাবি আমার ষ্টাইলটা কি রকমের! সমালোচকেরা যাহাকে প্রাঞ্জল বলে তাহা নহে—

সমীরণ কহিল—কিন্তু ওজস্বী বটে। তুমি যে আকৃতির কথা কহিলে, যেটা বিশেষরূপে আমাদের আপনার, আমিও তাহারই কথা বলিতেছিলাম। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চেহারাখানা যাহাতে বজায় থাকে আমি সেই অনুরোধ করিতেছিলাম।

দীপ্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিল—কিন্তু চেহারা সকলের সমান নহে, অতএব অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। কোন চেহারায় বা প্রকাশ করে, কোন চেহারায় বা গোপন করে। হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে স্বতই প্রকাশমান, তাহার আলো বাহির করিবার জন্য তাহার চেহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় না, কিন্তু তৃণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে তবেই তাহার আলোকটুকু বাহির হয়। আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর মুখে এ

বিলাপ শোভা পায় না, যে, সাহিত্যে আমাদের চেহারা বজায় থাকিতেছে না। কেহ কেহ আছে কেবল যাহার অস্তিত্ব, যাহার প্রকৃতি, যাহার সমগ্র সমষ্টি আমাদের কাছে একটা নূতন শিক্ষা, নূতন আনন্দ। সে যেমনটি তাহাকে তেমনি অবিকল রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কেহ বা আছে যাহাকে ছাড়াইয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিতে হয়। শাঁসটুকু যদি বাহির হয় তবে সেইজন্যই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ, তাহাই বা কয়জন লোকের আছে এবং কয়জন বাহির করিয়া দিতে পারে।

সমীরণ হাস্যমুখে কহিল, মাপ করিবেন দীপ্তি, আমি যে তৃণ এমন দীনতা আমি কথনও স্বপ্নেও অনুভব করি না। বরঞ্চ অনেক সময় ভিতর দিকে চাহিলে আপনাকে খনির হীরক বলিয়া অনুমান হয়। এখন কেবল চিনিয়া লইতে পারে এমন একটা জহরীর প্রত্যাশায় বসিয়া আছি। ক্রমে যত দিন যাইতেছে তত আমার বিশ্বাস হইতেছে, পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরীর। তরুণ বয়সে সংসারে মানুষ চোখে পড়িত না—মনে হইত যথার্থ মানুষগুলা উপন্যাস নাটক এবং মহাকাব্যেই আশ্রয় লইয়াছে সংসারে কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন দেখিতে পাই লোকালয়ে মানুষ ঢের আছে কিন্তু "ভোলা মন, ও ভোলা মন, মানুষ কেন চিন্‌লি না!" ভোলা মন, এই সংসারের মাঝখানে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ্, এই মানবহৃদয়ের ভীড়ের মধ্যে! সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না, সেথানে তাহারা কথা কহিবে, লোকসমাজে যাহারা একপ্রান্তে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইবে, পৃথিবীতে যাহাদিগকে অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখিব তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা আত্মবিস্মৃত আত্মবিসর্জ্জ-

নের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন মহাকাব্যের নায়ক, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজাতি আছে, সেই আত্মীয়তা কোন্ নব দ্বৈপায়ন আবিষ্কার করিবে এবং প্রকাশ করিবে!

আমি কহিলাম—না করিলে কি এমন আসে যায়! মানুষ পরস্পরকে না যদি চিনিবে তবে পরস্পরকে এত ভালবাসে কি করিয়া! একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ হইতে বহুদূরে দু-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মুহুরীগিরি করিত। আমি তাহার প্রভু ছিলাম, কিন্তু প্রায় তাহার অস্তিত্বও অবগত ছিলাম না—সে এত সামান্য লোক ছিল! একদিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা হইল। আমার শয়নগৃহ হইতে শুনিতে পাইলাম সে "পিসিমা" "পিসিমা" করিয়া কাতরস্বরে কাঁদিতেছে। তখন সহসা তাহার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতখানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল! সেই যে একটা অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্ব্বোধ লোক বসিয়া বসিয়া ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া এক মনে নকল করিয়া যাইত, তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান বৈধব্যের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তদেহে শূন্য বাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যতক্ষণ অন্ন টগ্‌বগ্ করিয়া না ফুটিয়া উঠিত ততক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে কি সেই দূরকুটীরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা ভাবিত না? এক দিন যে তাহার নকলে ভুল হইল, ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতন কর্ম্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সে দিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পীড়ার সংবাদ পায় নাই? এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঙ্গল-

পার্ত্তার জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্রহৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল! এই দরিদ্র যুবকের প্রবাসবাসের সহিত কি কম করুণা কাতরতা উদ্বেগ জড়িত হইয়া ছিল! সহসা সেই রাত্রে এই নির্ব্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকটে দীপ্যমান হইয়া উঠিল। বুঝিতে পারিলাম, এই তুচ্ছ লোকটিকে যদি কোন মতে বাঁচাইতে পারি তবে এক বৃহৎ কাজ করা হয়। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলাম কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না—আমার সেই ঠিকা মুহুরির মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন খুব মহৎ তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোন কবি অনুমান করে নাই, কোন পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না—একটি উন্নত জীবন আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল—কিন্তু খোরাকপোষাকসমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারোমাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে আর আমাদের মত দীপ্তিহীন ছোট ছোট লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়;—পিসিমার ভালবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায় মানুষে পরিপূর্ণ।

স্রোতস্বিনী দয়াস্নিগ্ধ মুখে কহিল—তোমার ঐ বিদেশী মুহুরির কথা তোমার কাছে পূর্ব্বে শুনিয়াছি। জানি না, উহার কথা শুনিয়া কেন আমাদের হিন্দুস্থানী বেহারা নীহরকে মনে পড়ে। সম্প্রতি দুটি শিশুসন্তান রাখিয়া তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে।

এখন সে কাজ কর্ম্ম করে, দুপরবেলা বসিয়া বসিয়া পাখা টানে, কিন্তু এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মত হইয়া গেছে! তাহাকে যখনই দেখি কষ্ট হয়—কিন্তু সে কষ্ট যেন ইহার একলার জন্য নহে—আমি ঠিক বুঝাইতে পারি না, কিন্তু মনে হয় যেন সমস্ত মানবের জন্য একটা বেদনা অনুভূত হইতে থাকে।

আমি কহিলাম—তাহার কারণ, উহার যে ব্যথা সমস্ত মানবের সেই ব্যথা। সমস্ত মানুষই ভালবাসে এবং বিরহ বিচ্ছেদ মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত ও ভীত। তোমার ঐ পাখাওয়ালা ভৃত্যের আনন্দহারা বিষণ্নমুখে সমস্ত পৃথিবীবাসী মানুষের বিষাদ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

স্রোতস্বিনী কহিল—কেবল তাহাই নয়। মনে হয়, পৃথিবীতে যত দুঃখ তত দয়া কোথায় আছে? কত দুঃখ আছে যেখানে মানুষের সান্ত্বনা কোনকালে প্রবেশও করে না অথচ কত জায়গা আছে যেখানে ভালবাসার অনাবশ্যক অতিবৃষ্টি হইয়া যায়। যখন দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্য্যসহকারে মূকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে, ছেলে দুটো উঠানে গড়াইতেছে, পড়িয়া গিয়া চীৎকারপূর্ব্বক কাঁদিয়া উঠিতেছে, বাপ মুখ ফিরাইয়া কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছে, পাখা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে পারিতেছে না; জীবনে আনন্দ অল্প অথচ পেটের জ্বালা কম নহে, জীবনে যত বড় দুর্ঘটনাই ঘটুক দুই মুষ্টি অন্নের জন্য নিয়মিত কাজ চালাইতেই হইবে, কোন ত্রুটি হইলে কেহ মাপ করিবে না—যখন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আছে যাহাদের দুঃখ কষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত; যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই স্নেহ দিই না, সান্ত্বনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না, তখন বাস্তবিক

মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর। কিন্তু সেই অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালবাসে এবং ভালবাসার যোগ্য। আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি, নিজেকেও ভালরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধ ভাবে সুখদুঃখ বেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলোক নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্ত্তব্য।

ক্ষিতি কহিল—পূর্ব্বকালে এক সময়ে সকল বিষয়ে প্রবলতার আদর কিছু অধিক ছিল। তখন মনুষ্যসমাজ অনেকটা অসহায় অরক্ষিত ছিল; যে বীর্য্যশালী, যে প্রতিভাশালী, যে ক্ষমতাশালী সেই তখনকার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইত। এখন সভ্যতার সুশাসনে সুশৃঙ্খলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া প্রবলতার অত্যধিক মর্য্যাদা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন অকৃতি অক্ষমেরাও সংসারের খুব একটা বৃহৎ অংশের শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার কাব্য উপন্যাসও ভীষ্মদ্রোণকে ছাড়িয়া এই সমস্ত মূকজাতির ভাষা এই সমস্ত ভস্মাচ্ছন্ন অঙ্গারের আলোক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সমীরণ কহিল, নবোদিত সাহিত্যসূর্য্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্ত্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটীরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।

মেলা-দর্শন।

কথায় বলে বারমাসে তের পার্ব্বণ, বীরভূম জেলার মেলা সম্বন্ধে সেই কথা খাটে। প্রায় পক্ষে পক্ষে এখানে-না-ওখানে একটা-না-একটা মেলার খবর পাওয়া যায়। আমার ভাগ্যে কিন্তু গোটা দুইয়ের বেশী দর্শন লাভ হয় নাই। একদিন একটা মেলায় গিয়াছিলাম—নাম শুনিলাম ব্রহ্মদৈত্যের মেলা। প্রকাণ্ড মাঠ, বীরভূম-সুলভ অসমতল ক্ষেত্র চারিদিকে, দূরে, শালবনের গভীর নীল ছায়ায় দৃষ্টিরেখা মিশিয়া গিয়াছে। সদ্যপরিষ্কৃত প্রায় একশত বিঘা ধানের জমী ব্যাপিয়া দোকান পাট বসিয়াছে—বিশেষ কোন শৃঙ্খলায় তাহারা নিয়মিত নহে। তেলে-ভাজা খাবার, মুড়িমুড়কী, শাঁক আলু এবং এদেশের প্রসিদ্ধ রাজনগরের কুল—ইহাই খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে। মণিহারীর দোকানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্পণ, দেশী বিদেশী চিরুণি এবং ঘুন্সী ও বেলোয়াড়ি চুড়ির বিলক্ষণ সমাবেশ দেখিলাম। সকলের উপর পুঁতির সজ্জা কিছু বেশী এবং সাঁওতাল সিমন্তিনীগণ আগ্রহে তাহা ক্রয় করিতেছেন। কোথাও দরজীর দোকানে শস্তা ছিটের পীরহান কিনিবার জন্য টেরিকাটা পাড়াগেঁয়ে যুবকের দল ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথাও মাদল বাজাইয়া সাঁওতালী স্ত্রীপুরুষে চক্রাকারে নৃত্য করিতেছে। মোটের উপর বেশ একটা আনন্দ-ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

আসল ব্রহ্মদৈত্যস্থান একটা মাটীর উচ্চ ঢিবি, গোটাকতক বন্যগাছ তাহার উপর ছায়াদান করিতেছে। দুই তিনটা গাছের চারিধার বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা—সদ্যকর্ষিত জমীর আমদানি ছোট বড় লোষ্ট্ররাশিতে এইস্থান পূর্ণ। পাণ্ডাবাবাজীরা এইখানে

দাঁড়াইয়া দর্শনী আদায় করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঢিলগুলি দর্শনার্থীদের নিক্ষিপ্ত—ঢিল দিয়াই দেবতা ব্রহ্মদৈত্যের পূজা করিতে হয়। দেবতাটী শুনিলাম খুব জীবন্ত জাগ্রত—বছর বছর বিস্তর ঢিল হজম করিয়া থাকেন। আর কিছু না হোক্ আমাদের ছেলেবেলাকার সেই ঠাকুরমার গল্পের নায়ক ব্রহ্মদৈত্য ঠাকুরটীকে বেশ চেনা গেল। কালভেদে রূপভেদ হয়—দৈত্য সাহেব কিন্তু গোলাপের তোড়া দাওয়া করিতে শেখেন নাই, এটা বড় কম কথা নহে।

এই লোষ্ট্রোপকরণের পূজার কথায় আমার মনে কিঞ্চিৎ তত্ত্বরসের সঞ্চার হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন, সাঁওতাল রক্তমাংসে বঙ্গসমাজের নিম্নস্তর গঠিত—বাঙ্গলা ভাষার বিস্তর কথা, বিশেষ ব্যবসা বাণিজ্যের কেজো-কথাগুলোর অধিকাংশ সাঁওতালদের হাটবাজার হইতে আমদানী। খুব সম্ভব। আমার আগে মনে হইত আমাদের চড়কপূজাটার জন্ম সাঁওতাল-ভূম হইতে—কিন্তু বীরভূম অঞ্চলে তার কিছুই দেখিলাম না। ব্রহ্মদৈত্য-মেলা যে সাঁওতাল-সম্ভূত, তাতে বড় সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় মেলাটীর নাম বক্রেশ্বর। এইস্থান বীরভূমের পুরাতন রাজধানী রাজনগরের সন্নিকট এবং সিউড়ি হইতে ন্যূনাধিক তের মাইল। এখানে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে—স্থানটী তীব্র গন্ধক-গন্ধে পূর্ণ। প্রস্রবণগুলিকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং শিব বক্রেশ্বর ভক্তকে বাড়াইবার জন্য এখানে অবস্থান করিতেছেন। সংক্ষেপে সে পরিচয় দিতেছি।

বক্রেশ্বর শিব অনাদি। লক্ষ্মীর স্বয়ম্বরকালে দেবসভায় লোমশ ও সুব্রত মুনিদ্বয় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। লোমশের পাদ্য-অর্ঘ্য হইয়াছিল কিন্তু সুব্রতের হইল না। ইহাতে তিনি অপমানিত

হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু দেবগণকে শাপ দিতে না পারিয়া স্বশরীরে ক্রোধ ধারণ করিলেন। তার ফলে আট জায়গায় তাঁহার দেহযষ্টি বাঁকিয়া গেল। তিনি গুপ্তবেশে এখানে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ক্রমাগত ষষ্টিসহস্র বৎসর, কিছুই হইল না। তার পর আবার পঁচিশ হাজার বৎসর। ইহাতে ঠাকুর বর দিতে চাহিলেন, কিন্তু অষ্টাবক্র বলিলেন, অমর বর চাই—নহিলে লইব না। ঠাকুর সম্মত হইলেন না। অষ্টাবক্রের তপস্যা আবার অবিরাম পঁচিশ হাজার বৎসর চলিল, তার উপর গলিত পত্র ভক্ষণ। ঠাকুর কিন্তু কিছুতেই অমর বর দিলেন না। এবার অষ্টাবক্র পাঁচ দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া এবং ঊর্দ্ধরেতা হইয়া দশহাজার বৎসর কাল তপস্যা করিলেন—ফল ফলিল। অষ্টাবক্র দেবসভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, সকলের বড় ও অমর হইতে চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহার কঠোর তপস্যায় বড় খুসী হইয়াছিলেন, বলিলেন তথাস্তু। সেই অবধি বক্রেশ্বরের তীর্থ বলিয়া খ্যাতি। অষ্টাবক্র খোদ এখন উপরে অষ্টধাতুমূর্ত্তি, ভিতরে পুরোহিত বলেন—পাষাণ। মূর্ত্তি শিবলিঙ্গ। তাঁহার পশ্চিম দিকে স্বয়ং বক্রেশ্বর শিবের প্রস্তরময় ক্ষুদ্রমূর্ত্তি—ঠাকুর নিজে হেঁট হইয়া ভক্তকে বাড়াইয়াছেন।

এই মূর্ত্তিদর্শনের জন্য সপুরোহিত আমরা এক অন্ধকার মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। মন্দিরের নীচে গহ্বরের ভিতর দেবমূর্ত্তি—প্রদীপালোকে দেখিতে হইয়াছিল। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বাহিরে আসিতে হয়। সেখানেও নিস্তার নাই। পুরোহিত মহাশয়দের কবলে যিনি কখন পড়িয়াছেন, তিনি বুঝিবেন।

বৃদ্ধ পুরোহিতটী বেশ সাদাসিধে লোক। কুণ্ড এবং দেবমূর্ত্তিগুলির ইতিহাস তাঁহার মুখে যেমন শুনিয়াছি, তেমনই লিখিতেছি।

সূর্য্যকুণ্ড—সূর্য্য স্বয়ং এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যগিরি বাড়িয়া উঠিয়া সূর্য্যের গতিরোধ করেন: সেই আপদ হইতে উদ্ধারের জন্য তাঁহার তপস্যা। তাহার ফলে নারায়ণ অগস্ত্য মুনিকে পাঠান বিন্ধ্য মুনির শিষ্য, কাজেই তাঁহাকে দেখিয়া শির নত করিলেন; অগস্ত্য বলিলেন, বাপু, আমি ফিরিয়া না আসিলে তুমি আর মাথা তুলিও না। অগস্ত্য আর ফিরিলেন না, বিন্ধ্যের নত মস্তকও আর উঠিল না, সূর্য্য জিতিয়া গেলেন। সেই হইতে সূর্য্যকুণ্ডের উৎপত্তি।

নৃসিংহ বা অগ্নিকুণ্ড।—ঠাকুর হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন। তাহার ব্রহ্ম-ঔরসে জন্ম। ব্রাহ্মণবধহেতু ঠাকুরের পাপসঞ্চার হইল, কাজেই তপস্যার প্রয়োজন। এবং এই কুণ্ডে আসিয়া তিনি তপস্যাচরণ করিলেন। ইহার জল খুব উষ্ণ—স্থানে স্থানে, ফুটিয়া উঠিতেছে।

ক্ষারকুণ্ড। ইহাতে গন্ধকের গন্ধ বড় তীব্র, জলও খুব গরম। সীতাদেবী নাকি রামচন্দ্রকে পাইবার জন্য এখানে আসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।

ভৈরবকুণ্ড। ব্রহ্মার এবং মহাদেবে বিবাদ হইল। ব্রহ্মার পঞ্চমুখ, শিবের মোট চারিটি, সে জন্য ব্রহ্মার অহঙ্কার হইয়াছিল। মহাদেব রাগিয়া গিয়া জটা হইতে ভৈরব উৎপন্ন করেন এবং তাহাকে হুকুম দেন যে, তর্জ্জনী দ্বারা ব্রহ্মার ঊর্দ্ধ মুখটা ছেদন করে। ভৈরব শিব-আজ্ঞা পালন করিলেন বটে, কিন্তু ছিন্ন মুণ্ড তর্জ্জনী আর ছাড়ে না। ভৈরব বিব্রত হইয়া শেষে তপস্যায় মন দিলেন। বলা বাহুল্য, এই কুণ্ডে তপস্যা করিয়া তিনি উদ্ধার লাভ করিলেন।

আরও দুটি কুণ্ড দেখিলাম—তাহাদের জল শীতল। নাম

শুনিলাম পার্ব্বতীকুণ্ড এবং অমৃতকুণ্ড। প্রথমটীতে তপস্যা করেন স্বয়ং আদ্যাশক্তি ভগবতী—নহিলে দেহত্যাগের উপর শিবকে লাভের আর উপায় ছিল না। দ্বিতীয়টীতে চন্দ্রের অমৃত পড়িয়াছিল। পূর্ব্বকালে ইহার জলে মৃতসঞ্জীবনী শক্তি ছিল, এখন স্নান ও স্পর্শে বন্ধ্যার বন্ধ্যত্ব ঘুচিয়া যায়। এ কলি-কালে কিন্তু অমৃতও বিষ হইয়া দাঁড়ায়। জলটুকু এতই ময়লা যে, বিষ বলিলেও চলে।

কুণ্ডগুলি দেখিয়া এবং তাহাদের ইতিহাস শুনিয়া মনে হইল বক্রেশ্বর-তীর্থ রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ সকলের সংক্ষিপ্তসার। এ দারুণ ভবসংসারের পরীক্ষায় এক্জামিন বিস্তর, কাজেই অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ বড় বড় পুঁথির এইরূপ সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছেন। শুনিলাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একাদশ অধ্যায়ে বক্রেশ্বর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সমালোচনা।

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রশ্নোত্তর।

থিওসফিক্যাল্ সোসাইটির সংস্থাপক ও সভাপতি শ্রীযুক্ত কর্ণেল এইচ্ এস্ অল্কট্ প্রণীত ইংরাজি হইতে অনুবাদিত।

এই গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ ও তত্ত্বগুলি যথাযথরূপে রক্ষিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন কিন্তু ইহাতে যে অনেক দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপিত ও মীমাংসিত হয় নাই তাহার কোন সন্দেহ নাই।